সমকালীন বাংলা গানের ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের আধুনিক গান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

দেবাশীষ বেপারী

আগস্ট ২০২০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০।

সমকালীন বাংলা গানের ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের আধুনিক গান

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মহসিনা আক্তার খানম (লীনা তাপসী)

সহযোগী অধ্যাপক

সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

দেবাশীষ বেপারী

পিএইচ.ডি

রেজিস্ট্রেশন নম্বর:০৮

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-১৬

সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, **‘সমকালীন বাংলা গানের ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের আধুনিক গান’** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব রচনা। আমার জানামতে এ বিষয়ে ইতোপূর্বে কোনো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি। অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরর পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য রচিত। এ অভিসন্দর্ভটি বা এর কোনো অংশবিশেষ পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

আগস্ট ২০২০

দেবাশীষ বেপারী

পিএইচ.ডি (গবেষক)

রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ: ০৮/২০১৫-১৬

সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা ১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, **দেবাশীষ বেপারী,** (রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ০৮, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-১৬) সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উপস্থাপিত **'সমকালীন বাংলা গানের ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের আধুনিক গান'** শীর্ষক পিএইচ.ডি পর্যায়ের গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ কোথাও মুদ্রিত হয়নি এবং গবেষণাকর্মটি কোনো প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য ইতোপূর্বে কেউ উপস্থাপন করেননি।

আগস্ট ২০২০

ড. মহসিনা আক্তার খানম (লীনা তাপসী)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ও

সহযোগী অধ্যাপক

সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা ১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শৈশবে নজরুলের গানের প্রতি অন্তরের যে টান অনুভব করেছি তারই ধারাবাহিকতায় সঙ্গীত বিষয় নিয়ে আমার পড়াশোনা। নজরুলের বিচিত্র সমাহারী গানের পাশাপাশি আধুনিক গানও গেয়েছি। বহু গানের ভীড়েও সুরব্যঞ্জনা ও বাণীর গৌরবে নজরুলের আধুনিক গানেই মুগ্ধ হয়েছি নিয়ত। কাজী নজরুল ইসলামের আধুনিক গানের প্রতি সেই গৌরববোধ থেকেই এ গবেষণা। আমার গবেষণাকর্মের প্রধানতম অনুপ্রেরণাময়ী আমার পরম পূজনীয়া মাতা সবিতা রানী। গবেষণাকর্ম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ও সহযোগিতা করেছেন আমার শ্রদ্ধাষ্পদ শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ড. মহসিনা আক্তার খানম (লীনা তাপসী)। তাঁর প্রতি আমার চিরকৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা। আমার গবেষণার সার্বিক পরামর্শ ও নির্দেশনাদানের জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি উপমহাদেশের বিখ্যাত নজরুল বিশেষজ্ঞ জাতীয় অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ড. রফিকুল ইসলামের কাছে।

দেশবরেণ্য সঙ্গীতশিল্পী ও আমার পরম পূজনীয় শিক্ষক জনাব খায়রুল আনাম শাকিলের কাছে আমি অশেষ ঋণ স্বীকার করছি নানা সময়ে গবেষণার বিষয়ে অনুপ্রেরণা দানের জন্য। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের অধ্যাপক আমার জেষ্ঠ্য ভ্রাতাসম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. জাহিদুল কবীরের কাছে ঋণ স্বীকার করছি গবেষণাকর্মের নানা অজানা বিষয় শিখিয়ে দেয়ার জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের শ্রদ্ধেয় বিভাগীয় প্রধান টুম্পা সমাদ্দার, বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা শ্রদ্ধেয় স্বরাজ কুমার দেব সহ আমার শ্রদ্ধেয় সকল শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাকে নানাভাবে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য। গভীর আন্তরিকতার সাথে গবেষণার কাজে নিরলসভাবে সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন আমার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী উর্মিলা ভৌমিক, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা। যেসব প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি গবেষণাকর্মের তথ্য সংগ্রহের জন্য সেসব প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আগস্ট ২০২০

দেবাশীষ বেপারী

পিএইচ.ডি (গবেষক)

রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ: ০৮/২০১৫-১৬

সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে আমাদের সঙ্গীতে মার্গসঙ্গীত ও দেশী সঙ্গীত নামে দুটি ধারা বহমান। মার্গসঙ্গীতে সুরের ভূমিকাই প্রধান। অন্যদিকে দেশী সঙ্গীতে কথা ও সুর মিলেমিশে একাকার হয়ে রচিত ও বিকশিত হয়েছে বাংলা গান। বাংলা গানের বহু প্রাচীন ঐতিহ্য, রূপ ও রীতিকে স্মরণে রেখে, বাংলা গান নতুন সম্ভাবনার ঐশ্বর্যে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে বিভিন্ন সময়ে। 'আধুনিক গান' বাংলা গানের তেমনই চিত্তনন্দিত আর ঐশ্বর্যশীল গীতধারা, যার মাধ্যমে বাংলা গানের বহুল বিকাশ ঘটেছে বিশ্বময়। আধুনিক বাংলা গানে অচ্ছেদ্যভাবে মানবিক প্রেম ও মানুষের জীবনানুভূতি যুক্ত। সুরকে কথার অনুগামী করে বাণীবাহিত ভাবের সার্বভৌম রূপ প্রকাশিত হয়েছে বাংলা গানে। সুর দ্বারা বাণীর ভাবকে প্রকাশ করে তোলাই বাঙালি সঙ্গীত রচয়িতাদের মূল উদ্দেশ্য। আঠারো শতকের শেষভাগে রামনিধি গুপ্তের (নিধুবাবু) হাতে সূচনা হয়েছিল, মর্তবাসী নর-নারীর মিলন-বিরহের প্রেমানুষঙ্গ নিয়ে রচিত আধুনিক গান। নিধুবাবুর টপ্পা গান দিয়েই বাংলা গানের মানবিকতার দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। পরবর্তীতে বাংলা গানের সর্বাধিক বিস্তার ঘটেছিল কাব্যসংগীতের এই আধুনিক ধারায়ই। 'আধুনিক গান' বাংলা গানের তেমনই চিত্তনন্দিত আর ঐশ্বর্যশীল গীতধারা, যার মাধ্যমে বাংলা গানের বহুল বিকাশ ঘটেছে। আধুনিক গান বর্তমান সময়ে সবথেকে জনপ্রিয় এবং হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীতরূপে বিবেচিত। বাংলা গানের রূপায়নকল্পে রামনিধি গুপ্তের পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম নিয়ে আসেন প্রবল ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত আধুনিকতার ধরণ। তবে বাংলা গানের আধুনিকতার পথে বহু বাণীকার ও সুরকারের মৌলিক পদচিহ্ন অঙ্কিত হলেও নজরুলের সৃজন প্রতিভার পরশে মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে আধুনিক গান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ সেন, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সজনীকান্ত দাস, হীরেন বসু, শৈলেন রায়, অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ, পবিত্র মিত্রসহ সমকালীন বহু গীতিকার এই আধুনিক ধারায় গান লিখেছেন, কিন্তু সৃজন সফলতায় তুঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের আধুনিক গানের স্থান। বাংলা আধুনিক গানের সমৃদ্ধি সাধনে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান চিরস্মরণীয়। বাংলা সঙ্গীতের ধারায় কাজী নজরুল ইসলাম এক স্বর্ণোজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছেন। নজরুলের সামগ্রিক সাঙ্গীতিক অর্জনের মধ্যে আধুনিক গান অন্যতম। জনপ্রিয়তা ও সুখশ্রাব্যতার নিরিখে নজরুলের আধুনিক গান সমকালে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। নজরুলের গানে সর্বপ্রথম অত্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে শ্রোতা অভিমুখী সঙ্গীত রচনার ধারা। বাংলা গানের জননন্দিত আধুনিক গানের ধারা নজরুলের যথার্থ জীবনানুভূতি, মধুময় বাণী আর সুরম্য সুর যোজনায় এক গৌরবময় সঙ্গীতধারায় উপনীত হয়েছে ও বিকশিত হয়েছে। এক আশ্চর্য রূপায়ন ঘটে কথা ও সুর রচনার পেশাদারী ধারার। কাজী নজরুল ইসলামের আধুনিক গানে প্রথম অত্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠালাভ

করে শ্রোতাভিমুখী সঙ্গীত রচনার ধারা। জনচিত্তমনস্কতা নজরুল প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য। জনরুচিকে উপলক্ষ্য করে জননন্দিত সঙ্গীত রচনাই ছিল নজরুলের আধুনিক গীতধারার প্রধান প্রবণতা। সাধারণ মানুষের হৃদয়ের বাসনাকে অতি সাবলীলভাবে রূপায়িত করতে জানতেন বলেই নজরুলের গান এত বিপুলভাবে শ্রোতাচিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছে। সঙ্গীত সৃজনপদ্ধতির আধুনিকতাও নজরুলের প্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ফলে বাংলা প্রেমের গানের একটি অসামান্য ধারা পল্লবিত হয়ে উঠেছিল নজরুলের আধুনিক শ্রেণির গানকে কেন্দ্র করে। নজরুলের প্রেমের গান যথার্থই যৌবন বেদনার, প্রাণ প্রশান্তির অনুভূতিসর্বস্ব গান। সে গান বিশ্বচরাচরের ভিন্ন কোনো ভাবের কাছে সমর্পিত নয়, তাঁর গান অনুরাগে, উচ্ছ্বাসে, বিহ্বলতায়, সংকটে গৃহবাসী মানুষের স্বপ্ন ও অনুভবের ছবি আঁকে হৃদয়ের পটে। নজরুলের মাধ্যমে বাংলা আধুনিক গানের সীমানা প্রসারিত হয়েছে বিপুলসংখ্যক শ্রোতার হৃদয়ে। প্রেমের এক উচ্ছল প্রকাশ ঘটেছে নজরুলের আধুনিক গানে। বাংলা আধুনিক গান রচনা ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের অবিস্মরণীয় অবদান শ্রমবিভাজন। গীতিকার, সুরকার ও গায়ক তিন পৃথক সঙ্গীতগুণীর আবির্ভাব ঘটেছে এই সঙ্গীতধারায়। ফলে কালজয়ী গায়কের আবির্ভাব হয়েছে, অসাধারণ সব সুর যুক্ত হয়েছে বাংলা গানে, মানসম্মত বহু আধুনিক গান রচিত হয়েছে বাংলা ভাষায়।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সমকালীন অনেক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকারের রচিত ও সুরারোপিত সংগীতের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়েছেন সঙ্গীত রচনায়। সমকালীন অর্থে যা বোঝায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন ও অতুলপ্রসাদ সেনের সাথে সে দিক থেকে কাজী নজরুল ইসলামের বয়সের পার্থক্য কিছুটা বেশি হলেও মূলত কিশোর বয়সে তাঁদের গানেই নজরুলের হৃদয় মোহিত হয়েছে এবং এই মুগ্ধতার ধারা অব্যাহত ছিলো তাঁর গান রচনা ও সুরারোপ আরম্ভের আগ পর্যন্ত। গুনী সঙ্গীতকারদের সেসব গানের বাণী ও সুরের রূপরেখা মানদণ্ড হিসেবে, আদর্শ হিসেবে ভেবেছেন তিনি। এক্ষেত্রে নজরুলের সমকালীন ও পূর্ববর্তী সংগীতকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন– সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬), হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬০), দিলীপ কুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০), তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯) প্রমুখ। নজরুলের সমকালীন ও পরবর্তী গীতিকারদের মধ্যে ছিলেন– সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২), হীরেন বসু (১৯০৩-১৯৮৭), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), অজয় ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৪৩), শৈলেন রায় (১৯০৫-১৯৬৩), বাণীকুমার (১৯০৭- ১৯৭৪), অনিল ভট্টাচার্য (১৯০৮-১৯৪৪), সুবোধ পুরকায়স্থ (১৯০৭-১৯৮৪), নিশিকান্ত (১৯০৯-১৯৭৩), বিমলচন্দ্র ঘোষ (১৯১০-১৯৬৮), প্রণব রায় (১৯১১-১৯৭৫), পবিত্র মিত্র (১৯১৮-১৯৭৫), গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (১৯২৪-১৯৮৬), পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩১-১৯৯৯) প্রমুখ। নজরুলের সমকালীন সুরকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন– রাইচাঁদ বড়াল (১৯০৩-১৯৮১), হিমাংশু দত্ত (১৯০৮-১৯৪৪), জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ (১৯০৯-১৯৭৬),

Dhaka University Institutional Repository

অনুপম ঘটক (১৯১১-১৯৫৬), কমল দাশগুপ্ত (১৯১২- ১৯৭৪), নচিকেতা ঘোষ (১৯২৫-১৯৭৬), শৈলেশ দত্তগুপ্ত (১৯০৫-১৯৬০), সুধীরলাল চক্রবর্তী (১৯১৬-১৯৫২) প্রমুখ। পরবর্তীতে আপন বাণী ও সুরের সুষমায় সমকালীন বাংলা গানের ধারা সমৃদ্ধ করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুলের সমকালীন বিশিষ্ট গীতরচয়িতা ও সুরকারদের আধুনিক গানের প্রসঙ্গ, আধুনিক গান সৃজনে নজরুলের আলোকোজ্জ্বল স্থান, বাংলা গানের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলা গানের বিচিত্র ধারা, আধুনিক বাংলা গান, নজরুলের আধুনিক গানের গীতিকার ও সুরকার প্রসঙ্গ, আধুনিক গানের নামকরণ, রচনার পটভূমি, নজরুলের আধুনিক গানে কথা ও সুরে জীবনানুভূতি তুলে ধরা হয়েছে এ গবেষণাপত্রে। নজরুলের সুরারোপিত আধুনিক গান, নজরুলের রচিত অধুনিক গানে বিভিন্ন সুরকার, নজরুল ও সমকালীন সঙ্গীতকারদের আধুনিক গানের মধ্যে তুলনা, নজরুলের আধুনিক গানের বৈশিষ্ট্য, আধুনিক বাংলা গানের বিকাশে যাঁদের অবদান সেই সব অমর রূপকারগণ ও তাঁদের গান, নজরুলের জীবন ও গান প্রসঙ্গে সমকালীন সুধীজনদের স্মৃতিচারণ ও অভিমতের প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত এ অভিসন্দর্ভ। আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। বাংলা আধুনিক গানের সমৃদ্ধি সাধনে কাজী নজরুল ইসলামের যে অবদান, সে সম্পর্কে যথার্থ একটি মূল্যায়ন উপস্থাপন করার মধ্যেই এ অভিসন্দর্ভের সার্থকতা নিহিত।

আগস্ট ২০২০

দেবাশীষ বেপারী

পিএইচ.ডি (গবেষক)

রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ: ০৮/২০১৫-১৬

সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বাংলা গানের ইতিহাস ও ঐতিহ্য- ১১

বাংলা গান ও তার বিচিত্র ধারা- ১৫

আধুনিক বাংলা গান- ৪৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

নজরুলের আধুনিক গান: গীতিকার ও সুরকার প্রসঙ্গ- ৫১

নজরুলের আধুনিক গানের নামকরণ- ৫৩

নজরুলের আধুনিক গান রচনার পটভূমি- ৫৬

নজরুলের আধুনিক গানে কথা ও সুরে জীবনানুভূতি- ৬১

নজরুলের নিজস্ব সুরারোপিত আধুনিক গান- ৭৬

নজরুলের রচিত অধুনিক গানে বিভিন্ন সুরকার- ৮৫

তৃতীয় অধ্যায়

নজরুল ও অন্যান্য সঙ্গীতকারদের আধুনিক গানের মধ্যে তুলনা- ৯৪

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গান- ৯৬

দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুলের গান- ১০০

রজনীকান্ত ও নজরুলের গান- ১০১

অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের গান- ১০২

নজরুলের আধুনিক গানের বৈশিষ্ট্য- ১০৭

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক বাংলা গানের অমর রূপকারগণ ও তাঁদের গান- ১১৩

সুরকার কমল দাশগুপ্তের গান- ১১৫

গীতিকার প্রণব রায়ের গান- ১২৫

সুরকার শৈলেশ দত্তগুপ্তের গান- ১৩২

গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গান- ১৩৯

গীতিকার পবিত্র মিত্রের গান- ১৫৭

গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান- ১৬৬

পঞ্চম অধ্যায়

সমকালীন সুধীজনের স্মৃতিচারণে নজরুলের জীবন ও গানের মুল্যায়ন- ১৮৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার- ১৯৮

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি-২০৩

পরিশিষ্ট

নজরুল রচিত আধুনিক গানের তালিকা- ২০৭

প্রথম অধ্যায়

বাংলা গানের ইতিহাস ও ঐতিহ্য

বাংলা গানের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। যে সংগীতের সুর জগতে চিরশান্তির পরশ ছড়ায়, মনে অসীমের অনুভব জাগায়, জীবনের প্রতিক্ষণে চিরমধুর স্নিগ্ধতা আনে, অমিয় সুধায় পিপাসিত চিত্তের তৃষ্ণা মেটায়। রসলোকের অমৃত সুধাসম সুর জীবনের গহীনে প্রবেশ করে প্রেমের আলোয় দীপ্তিময় করে অন্তর, সেই সঙ্গীতেরই একটি জননন্দিত ধারা 'বাংলা গান'। তাই বাংলা গানের মতো সংগীতের উৎপত্তির প্রসঙ্গেও অলোচনা প্রাসঙ্গিক। সঙ্গীত এ উপমহাদেশের মানুষের সামাজিক জীবনে নতুন অর্থ দান করেছে এবং সংস্কৃতির ভিত্তি গড়েছে। উত্তরাধিকারের পথ বেয়ে সংস্কৃতির সে সুফল আমরা আজও ভোগ করছি। মানুষের সদাস্পন্দিত জীবনে সঙ্গীতের ব্যবহার সর্বব্যাপী। সঠিক তথ্য উপাত্তের অপ্রতুলতার কারণে আমাদের সংগীতসৃষ্টির ইতিহাস অদ্যাবধি রহস্যাবৃত। নির্ভরযোগ্য ও ঐতিহাসিক সূত্রের অভাবে উপমহাদেশের সংগীতসহ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীতের ইতিহাসও অনাবিষ্কৃত এবং কল্পকথা নির্ভর। কুয়াশার মতো ধূসর আবরণে আচ্ছাদিত আমাদের সংগীতের উৎপত্তির ইতিহাস।

হিন্দু ধারণা মতে প্রচলিত বিশ্বাস– সঙ্গীত স্বর্গীয় বিষয়। সংগীতের সাধনা বা চর্চা স্বর্গীয় কর্মধারারই অনুরূপ। সঙ্গীতে সুরের অর্ঘ্যে অসীম ও অবিনশ্বরতার সাথে একীভূত হয়ে যায় আপন হৃদয়। একমাত্র ঈশ্বরেরই সৃষ্টি সঙ্গীত। হিন্দুদের কাছে সংগীতের উৎস যে স্বর্গ সে বিষয়ে ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত 'দি ইউনিভার্সেল হিস্ট্রি অফ মিউজিক' গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় স্যার এস এম ঠাকুরও একই অভিমত রেখেছেন সংগীত সম্পর্কে। তিনি বলেন– "হিন্দুদের কাছে সঙ্গীতের উৎস স্বর্গে।"[১] হিন্দু পৌরাণিক মতে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা সংগীতের সৃষ্টি করেছেন। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে এবং বৈদিক মতে সরস্বতীকে ললিতকলার তথা সংগীতের দেবী হিসেবে মান্য করা হয়। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপরীতে বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা করে সংগীতের সত্য উদঘাটনের জন্য সেভাবে কেউ অগ্রসর হয়নি। তাই বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে সংগীতের ইতিহাস জানবার পথটিও মসৃণ হয়ে ওঠেনি। সামাজিকভাবে সংস্কারপন্থী, ধর্মবিচ্যুত বলে আখ্যায়িত হওয়ার ভীতি এর মূল কারণ। তাই সংগীত বিষয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা হয়েছে পাশ্চাত্যে। ললিতকলার বিকাশের ধারা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের অঞ্চলগুলোতে একই রকম প্রায়, ফলে সংগীতের উদ্ভব ও বিকাশের মতবাদ, তত্ত্ব-বিশ্লেষণ পাশ্চাত্যের মতো প্রাচ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সংগীতের উৎপত্তি বিষয়ক বিজ্ঞানী ও মনীষীদের সেসব মতবাদ সম্পূর্ণ রূপে শতভাগ সত্য বলে দাবিও করেনি কেউ এবং চূড়ান্ত বলে প্রমাণিত হয়নি কোথাও। বাংলা গান শোনার যতটা

আকাঙ্ক্ষা আছে বাঙালির, বোঝার আকাঙ্ক্ষা ততটাই কম। অর্ধ-স্বীকৃত ও অর্ধ-সিদ্ধ এ তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত সংগীতের উৎপত্তির ইতিহাস।

'জীবজন্তুর স্বর বা চিৎকার অবিকল নকল করার প্রবৃত্তি থেকেই মানুষ গান গাইতে শিখেছে' এটি ছিল বিজ্ঞানীদের প্রথম দিককার মতবাদ। চার্লস ডারউইনের মতে- 'বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীকে যৌনাসক্ত করার প্রচেষ্টা তথা যৌন মিলনের বাসনা থেকে সঙ্গীতের উৎপত্তি'। 'উচ্চকণ্ঠে কথা বলার প্রবণতা থেকেই সঙ্গীতের শুরু' বলে মত প্রকাশ করেছেন ফরাসি বিজ্ঞানী জ্যাঁ জাক রুশো, ইংল্যান্ডের হার্বার্ট স্পেনসার। সঙ্গীতের উৎপত্তি বিষয়ক একটি মত দিয়েছেন ওয়ালাস্চেক সেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে 'প্রাচীন মানুষের একান্ত প্রয়োজনের তাগিদে লয় দিয়েছে সঙ্গীতের জন্ম'। আবার 'সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে শব্দের মাধ্যমে সংকেত দানের প্রয়োজন থেকে' এমন মত ব্যক্ত করেছেন ফাদার ডাব্লিউ স্মিদ এবং কার্ল স্টাম্ফ। "সঙ্গীতের শুরু হয়েছে গান গাওয়ার মাধ্যমেই। এবং সম্ভবত সঙ্গীত ভাষার থেকেও প্রাচীন।"[২] সঙ্গীতের উৎপত্তি সম্পর্কে যে সকল মত প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত তত্ত্ব এটি।

প্রাচীন সঙ্গীত সম্পর্কে অনুসন্ধানে সূত্র হিসেবে যেসব পরিগণিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিন্ধু সভ্যতার সময়কার প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিপুলসংখ্যক বই ও পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন রাগের রূপ বর্ণিত চিত্রসমূহ প্রভৃতি। ভারতীয় উপমহাদেশীয় এই অঞ্চলের সঙ্গীত সম্পর্কে অনুসন্ধানের এবং বিকাশের সূত্রপাত হয়েছিল সিন্ধু সভ্যতা থেকে। উল্লেখ্য বর্তমানের তিন স্বাধীন ভূখণ্ড বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশ গঠিত ছিল। এ উপমহাদেশে মানবিক কার্যকলাপের আনাগোনা এবং মানুষ বসবাস শুরু করেছিল– খ্রিস্টপূর্ব চার লক্ষ থেকে দুই লক্ষ বছর আগে। বর্তমান ভারতের পশ্চিম দিকের রাজ্যগুলি, পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ, দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তান এবং ইরানের বেলুচিস্তান প্রদেশের পূর্ব অংশ সিন্ধু সভ্যতার অন্তর্গত ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত সিন্ধু নদ অববাহিকায় বিশেষ করে মহেঞ্জোদারো (পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় অবস্থিত) ও হরপ্পা অঞ্চল (পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের প্রত্নস্থল সাহিওয়াল থেকে ৩৫ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত) হতে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় এ অঞ্চলে সংগীতের উদ্ভবের সূত্র ও ইতিহাস। কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে এর আগে সংগীতের ইতিহাস সম্বলিত সূত্রের স্বাক্ষর আর পাওয়া যায়নি।

কোনো কোনো স্থানে গ্রিক ও পারসীয় সভ্যতার অংশবিশেষ সিন্ধু সভ্যতায় খুঁজে পাওয়া যায়। গুহাচিত্র, প্রাচীন শিলালিপি, মন্দিরগাত্রে খোদিত নৃত্যগীত সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্য, নৃত্যরত নর্তক-নর্তকীর চিত্র, বাদ্যযন্ত্রের চিত্র, মৃৎ

পাত্রের গায়ের নকশা, বিভিন্ন সিলমোহর প্রাচীন সঙ্গীত সম্পর্কে ধারণা দেয়। সিন্ধু সভ্যতায় সাত ছিদ্র বিশিষ্ট বাঁশি, বীণা, বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নৃত্যরত ভাস্কর্য পাওয়া যায়। সাত ছিদ্রের বাঁশি দ্বারা অনুমান করা হয় যে, সেঅঞ্চলের সঙ্গীতে সাত স্বরের প্রচলন ছিল। গলায় ঝুলন্ত ঢোলক বা মৃদঙ্গের পোড়ামাটির ফলকে অঙ্কিত চিত্র ও খোদাই চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গীত সম্পর্কে, সঙ্গীতের উৎস সম্পর্কে জানার অন্য একটি মাধ্যম সংস্কৃত ভাষায় রচিত বই। এসব বইয়ে বৈদিক সঙ্গীতের উৎপত্তি এবং রাগসঙ্গীতের শ্রেণিকরণ সম্পর্কিত নানা তথ্য পাওয়া যায়। সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র', মাতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী', নারদের- 'নারদ শিক্ষা', দ্বিতীয় নারদের 'সঙ্গীত মকরান্দ', সারঙ্গ দেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর' এবং লোচনের 'রাগ তরঙ্গিনী'। এছাড়া রামায়ন, মহাভারত, ঋকবেদে প্রাচীন সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

মূলত আর্যদের হাত ধরেই ভারতীয় উপমহাদেশে সঙ্গীতের আদি ভিত রচিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। আমাদের সঙ্গীতের সূচনা হয়েছে আর্যদের ধর্মীয় ভজন গীতি এবং স্তুতি গানের মাধ্যমে। কালক্রমে আর্যদের ধর্মীয় আচারের উপাসনা সঙ্গীত ধর্মীয় বেড়াজাল ছিন্ন করে বাইরে চলে এসেছে। আমাদের এই অঞ্চলে সঙ্গীতের সাধনা ও বিকাশের ধারা সৃজনে আর্যদের ভূমিকা সবথেকে বেশি। এই উপমহাদেশে আর্যরা আফগানিস্তান ও ইরান অতিক্রম করে হিন্দুকুশ পর্বতের গিরিপথ ধরে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ শতকে এ উপমহাদেশে প্রথম প্রবেশ করে। ঋকবেদের স্তোত্রগুলো এই সময়ে সংগৃহীত এবং কণ্ঠস্থ করা হয়। ঋকবেদের মন্ত্রগুলো একটানা সুরে গাইতো আর্যরা। সামবেদের সকল স্তোত্রগুলি সুর করে গাওয়া হতো এবং পরবর্তীতে এই সামবেদের সামগান থেকেই রাগসংগীতের উৎপত্তি ও বিকাশ বলে অনুমান করা হয়। আর্যদের দেবদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত এবং নিবেদিত এ স্তোত্র। মন্ত্রের সাথে সঙ্গীত ও নৃত্যকলার সংযোগ ঘটানোর নেপথ্যের কারণ হিসেবে ধরা হয়- মন্দিরের পুরোহিতদের দ্বারা জনগণের মনে সত্যিকারের ধর্মভাব তৈরীর অক্ষমতা, বিশেষ ধরনের ভক্তিভাব তৈরি ও বৈদিক প্রার্থনারীতির পূর্বে প্রচলিত রীতির নিরসতা প্রভৃতি। বৈদিক মন্ত্রের সাথে এমন সুমধুর সঙ্গীতের মধুর সুরের মিশ্রন– প্রার্থনায় পূর্ণতা এনে দিত। নিয়ম ও আচারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে সঙ্গীত একদা তার স্বতন্ত্র সাধনপথ তৈরিতে সক্ষম হলো। নিয়মিত চর্চার ফলে খ্রিস্টপূর্ব দশ শতাব্দী নাগাদ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত সুরের ব্যবহার মানুষের আয়ত্ত্বে চলে আসে। সবচেয়ে উঁচু স্বর, নিচু স্বর এবং দুই স্বরের মধ্যবর্তী স্থান বোঝাতে এ শব্দ ব্যবহার করা হতো। কালের প্রবাহে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দে মানুষ সঙ্গীতের সাতটি স্বর বা স্বরগ্রাম সম্পর্কে ধারণালাভ করতে সক্ষম হয়। স্তরগুলি ছিল– ক্রুষ্ট, মন্দ্র, অতিস্বরা, চতুর্থ, তৃতীয়, দ্বিতীয় এবং প্রথম। খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতাব্দীর মধ্যে বিকাশের ধারায় সামগান ব্যাপক সাফল্যলাভ করে এবং একটি জনপ্রিয় ধারা হিসেবে পরিচিত পায়

ও পরিগণিত হয়। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে চিরপরিবর্তনশীল জনচিত্তের তথা শ্রোতাদের দাবি মেটাতে ব্যর্থ হয় সামগান।

খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ১৫০০ অব্দের মধ্যে সিন্ধু সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল ব্যাপকভাবে এবং নৃত্যগীত এর সর্বপ্রথম স্বাক্ষর পাওয়া যায় এই সময়ে। সিন্ধু নদীর অববাহিকায় বসবাসরত জনগণ তখন সম্ভবত ধর্মীয় আচরণের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি হিসেবে এবং দৈনন্দিন বিনোদনের অন্যান্য মাধ্যমের সঙ্গে সঙ্গীত পরিবেশন করত। ঐতিহাসিকদের মত অনুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ বছরের পর থেকে ঐতিহ্যবাহী ও সমৃদ্ধশীল সিন্ধু সভ্যতা ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। সিন্ধু সভ্যতার পতনের পরবর্তী সময়ে সুসংবদ্ধ সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে সাময়িক শূন্যতা নেমে আসে। পরবর্তীতে সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গীতে পরিত্যক্ত যা ছিল তা নিয়েই নববিজয়ী আর্যদের আগমন ঘটলো এবং সঙ্গীত সম্পর্কে তারা নতুন উপলব্ধিতে মগ্ন হলেন এবং এই সময় থেকেই উপমহাদেশীয় সঙ্গীতে নতুন এক যুগের শুভ সূচনা ঘটেছে। ক্রমান্বয়ে শ্রোতাদের সঙ্গীত রুচির ক্রমোন্নতি ও পরিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে ভজন সঙ্গীত জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করে এবং আর্যদের বৈদিক সঙ্গীতের পতন ঘটে। সঙ্গীতের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস রোধ করার নিমিত্তে তখন লোকগীতি এবং অন্যান্য সূত্র থেকে নিত্যনতুন সঙ্গীতের ধারণা যুক্ত হতে থাকে। তবে এক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ সঙ্গীত জনপ্রিয়তা পায় এবং এই সময় থেকে স্তোত্র এবং ভজন সঙ্গীতের বিকল্প হিসেবে শুদ্ধসঙ্গীতের যাত্রা শুরু। ধর্মীয় সঙ্গীতের প্রভাব কিছুটা কমে আসে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দের দিকে এবং এ সময়ে লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন ধারাগুলো প্রভাব বিস্তার শুরু করে। ধর্ম বহির্ভূত গীতি হতে উপকরণ সংগ্রহ করতে শুরু করে ধর্মীয় সঙ্গীতগুলো এবং শুধুমাত্র গতিধারাগুলোকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই তা লোকমুখী হতে শুরু করে। প্রকৃতভাবে সঙ্গীত সাধনার পদ্ধতির যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল এখান থেকেই। পরবর্তীতে সঙ্গীতরীতিগুলি তাদের নিজস্ব রূপে গঠন পদ্ধতি অনুসারে লোকসংগীত ও রাগসংগীত নামে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ধারায় পরিচিতিলাভ করে। বাংলা সঙ্গীতকে প্রায় ১০০০ বছরের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস অতিক্রম করতে হয়েছে আধ্যাত্মিকতা বিমূর্ত ভাবাবেগ থেকে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠতে। এখনো পর্যন্ত অনেক লোকধারার গানে আধ্যাত্মিকতার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ সম্প্রদায় 'বজ্র' নামে এক ধরনের গান গাইতো যা পরবর্তীতে চর্যাগীতি নামে ইতিহাস বিখ্যাত হয় এবং এই চর্যাগীতিকেই বাংলা গানের আদি নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বহু বিকাশের পথ বেয়ে রামনিধি গুপ্তের বাংলা টপ্পার মাধ্যমেই বাংলা গানে আধুনিক গানের প্রচলন আরম্ভ হয়।

বাংলা গান ও তার বিচিত্র ধারা

সঙ্গীতের একটি সমৃদ্ধ ধারা বাংলা গান। পরম করুণাময়ের আরাধনা ও কৃপালাভের মাধ্যম হিসেবে সঙ্গীত সর্বোত্তম। একাগ্রতাভাবে সাধনায়, একান্ত নিবিষ্টতায় সঙ্গীত দেবালয়ের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ বহু প্রাচীনকাল থেকেই। বিশ্ববীণায় ঝংকৃত চিরমধুর সুরের সাথে, চিরআপনের সাথে একীভূত হওয়ার বাসনায় সঙ্গীতের সাধনা অরম্ভ হয়েছিল প্রাচীনকালে। চিত্তক্ষেত্রে অনুরণন তোলা, অনুভূতি, ভাব– কথা ও সুরে গান হয়ে ধরণীতে তার যাত্রা আরম্ভ করেছে। হৃদয়পটের সুদীর্ঘকাল জমে থাকা দুঃখবোধ, জন্ম-জন্মান্তরের মন-মলিনতা, সুখ-স্মৃতি সবই গানে প্রাণ পেয়েছে কালের প্রবাহে। মনের অভ্যন্তরের ভাব প্রকাশের বাহন যদি হয় ভাষা, তাহলে সেই ভাবের বিস্তার ও উন্মুক্তিই হলো গান। সীমা থেকে অসীমে, অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতায়, বন্ধন থেকে মুক্তিতে, জীবনের প্রতিটি যাপনে থাকে শুধু গান। আমাদের সমস্ত আবেগ, অনুভূতি, সমস্ত চেতনা, প্রসারিত হয়- মিলিত হয় ও সত্য বলে প্রতিভাত হয় গানের মধ্য দিয়েই। "গানই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। লাগে না ফুল চন্দন, মন্ত্র তন্ত্র লাগে না।"[৩] সর্বোচ্চ সাধনার বিষয় সেই সঙ্গীতের একটি ধারা বাংলা গান। বাংলা গানের একটি সমৃদ্ধ ধারার নাম 'আধুনিক গান'। নিধুবাবু থেকে আরম্ভ হয়ে এ গান কাজী নজরুলের হাতেই সবচেয়ে আধুনিক ভঙ্গিমায় রূপায়িত ও বিকশিত হয়েছে। সেই বাংলা গৌরবদীপ্ত আধুনিক গানের মূল উদ্দেশ্য ছিল সুরে শ্রোতার মনোরঞ্জন করা এবং হৃদয়ানুগ প্রেমময় বাণীর প্রকাশ করা। ফলে নজরুলের সমকালীন সকল গীতরচয়িতা ও সুরকারের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন অনুকরণীয়। তাই কাজী নজরুল ইসলামের আধুনিক গান উপমায়, ভাবে, রসে, রূপে শ্রোতাপ্রিয় হয়ে উঠেছে এমন করে, যা আগে আর হয়নি কখনো।

দিগ্বিজয়ী সঙ্গীতকার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা ৫ নং ম্যাঙ্গো লেনে 'দৈনিক কৃষক' পত্রিকার অফিসগৃহে, জনসাহিত্য সংসদের শুভ-উদ্বোধনে, সভাপতির ভাষণে সঙ্গীত প্রসঙ্গে বলেন- "কাব্যে ও সাহিত্যে আমি কি দিয়েছি, জানি না। আমার আবেগে যা এসেছিল, তাই আমি সহজভাবে বলেছি, আমি যা অনুভব করেছি, তাই আমি বলেছি। ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু সঙ্গীতে যা দিয়েছি, সে সম্বন্ধে আজ কোনো আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে, তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই। তবে এইটুকু মনে আছে সঙ্গীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি।"[৪] নজরুলের অন্তর অনুভবের সঙ্গীতজ্ঞানে সমৃদ্ধ বাংলা গান তথা আধুনিক গান। এই আধুনিককালে নজরুলের রচিত সেই আধুনিক গান, কেন আজও আধুনিক, সমকালীন সঙ্গীতকারদের সাথে সেই গানের বৈচিত্র্যগত, বিষয়গত ও ভাবগত সাদৃশ্যতা, বাংলা গানের সমৃদ্ধি সাধনে তথা

আধুনিক গানের বিকাশে, কাজী নজরুল ইসলামের যে অবদান, সে সম্পর্কে একটি যথার্থ চিত্র উপস্থাপন করতে পারার মধ্যেই এ অভিসন্দর্ভের সার্থকতা নিহিত।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর নিজের গান রচনার পূর্ব পর্যন্ত গায়করূপে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান গাইতেন। সঙ্গীত সম্পর্কে কবির মন্তব্য এমন– "আমাদের দুই রকমের খাদ্য আছে–একটি প্রয়োজনের, আর-একটি অপ্রয়োজনের; একটি অন্ন, আর- একটি অমৃত। অন্নের ক্ষুধায় আমরা মর্ত্যলোকের সকল জীবজন্তুর সমান, অমৃতের ক্ষুধায় আমরা সুরলোকের দেবতাদের দলে। সংগীত হচ্ছে অমৃতের নানা ধারার মধ্যে একটি। ...এ কথা মনে রাখতে হবে, যা অমৃত, যা প্রয়োজনকে অতিক্রম ক'রে আপনাকে প্রকাশ করে, মনুষ্যত্বের চরম মহিমা তাতেই। ...প্রত্যেক জাতির উপরে ভার আছে সে মর্ত্যলোকে আপন অমরলোকের সৃষ্টি করবে। ...সংগীত মানবের সেই আনন্দরূপ– সে মানবের নিজের অভাব মোচনের অতীত ব'লেই সর্বমানবের এবং সর্বকালের– রাজ্য সম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু এই আনন্দরূপ চিরন্তন। ...যে শক্তি আপনাকে শক্তিরূপেই প্রকাশ করে সে হল পালোয়ানি, কিন্তু শক্তির সত্যরূপ হচ্ছে সৌন্দর্য। গাছের পূর্ণ শক্তি তার ফুলে; তার মোটা গুঁড়িটার মধ্যে সে কেবল আপনিই থাকে, কিন্তু তার ফুলের মধ্যে সে যে ফল ফলায় তারই বীজের ভিতর ভাবীকালের অরণ্য, অর্থাৎ তার অমরতা। সাহিত্যে, সংগীতে, সর্বপ্রকার কলাবিদ্যায় প্রাণশক্তি আপন অমরতাকে ফলিয়ে তোলে–আপিস-আদালতে কলে-কারখানায় নয়। ...অভাবের উপলব্ধিতে কাপড়ের কল, পাটের বস্তার কারখানা– অসীমের উপলব্ধিতেই সংগীত, অসীমের উপলব্ধিতেই আমরা সৃষ্টিকর্তা। যে সৃষ্টিকর্তা চন্দ্রসূর্যের সিংহাসনে বসে দরবার করছেন তিনি যে গুণী জাতিকে শিরোপা দিয়ে বলেন, 'সাবাস! আমার সুরের সঙ্গে তোমার সুর মিলেছে'– সেই ধন্য, সেই বেঁচে যায়, তাঁর অমৃতসভার পাশে তার চিরকালের আসন পাকা হয়ে থাকে।"[৫]

দেশ- কাল-জাতিসত্ত্বা ধ্বনিত হয়, অনুরণিত হয় সুরে, বাণীতে–গানে। গান বাঙালির প্রাণ। বাঙালির প্রাণ আছে তাই গানও আছে। পৃথিবীর আর কোনো জাতিই তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এভাবে গানকে আত্মীকৃত করে নিতে পারেনি। সুখে-দুঃখে, কর্মে-অবসরে, সঙ্গে-নিঃসঙ্গে, সংকটে-উৎসবে, আধ্যাত্মিকতায়-নাস্তিকতায়, শান্তিতে-অশান্তিতে প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতি মুহূর্তেই তার চাই– গান। সঙ্গীতের বর্তমান রূপলাভ করতে সময় লেগেছে প্রায় পাঁচ হাজার বছর। বাংলা গানের উৎস এবং কখন কীভাবে বিকাশলাভ করলো এ বিষয়ে কৌতুহল ও আগ্রহ রয়েছে সঙ্গীতবোদ্ধাদের মাঝে। বিভিন্ন মতপার্থক্য থাকলেও এ কথা নিশ্চিন্তে বলা যায় বাংলা গানের ঐতিহ্য ও ইতিহাস অনেক প্রাচীন। হাজার বছর ধরে বাংলা গানের উদ্ভব ও বিকাশ কীভাবে ঘটেছে তার রূপরেখা ও ক্রমবিকাশের চিত্র ফুটে উঠেছে এ অধ্যায়ে। বাংলা গান সম্মিলন মাধুর্যে নানা সময়ে বিকাশলাভ করেছে। কথা ও সুরের যুগল

মিলনের মধ্য দিয়ে একরৈখিক পথে, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও বিষয় বৈভবে ঋদ্ধ হয়েছে বাংলা গান। রাগসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সমন্বয়ে বাংলা গান যেমন সমৃদ্ধিলাভ করেছে তেমনি স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে হাজার বছরের বাংলা গান। বাংলা গানে বাণী ও সুরের সমগুরুত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, যার পরিচয় পাওয়া যায় কীর্তন ও বাউল গানে। তেমনি রাগপ্রধান গানেও বাণীর মর্যাদা অক্ষুণ্ন থেকেছে। আমাদের বাংলা গানে পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও, মূলত বাংলা গানের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ব্যাহত হয়নি কখনো। বিশেষত বাংলা গানের ইতিহাসে পঞ্চভাস্বর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি.এল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন এবং কাজী নজরুল ইসলামের গানের সার্থক রূপায়ন লক্ষ করা যায়। বাঙালির অন্য বৈশিষ্ট্য বা পরিচয় আর যাই থাকুক তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় হলো, বাঙালি গানপ্রেমী। সেই সঙ্গে রয়েছে তার অতুল ঐশ্বর্য–বাংলা গানের অফুরন্ত ভাণ্ডার। গবেষণাপত্রের আলোচ্য বিষয় বাংলা গানের আধুনিক কাল, যা রবীন্দ্রনাথের হাতে রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং নজরুলের হাতে পূর্ণতালাভ করেছে, পরিণত হয়েছে এবং শিখরস্পর্শী হয়েছে। মূলতঃ আধুনিক বাংলা গানে– আধুনিক কথা ও সুর ব্যবহারের যে রীতি সূচিত হয়েছিল বহু যুগ আগে, সেই আধুনিক বাংলা গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠায়, আধুনিকায়নে কাজী নজরুল ইসলাম আজও অতুলনীয়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি প্রকাশিত ‘সংগীতি শব্দকোষ’ দ্বিতীয় খণ্ডে ডা বিমল রায় বাংলা গান প্রসঙ্গে বলেন “বাংলা গান– বাংলা ভাষায় রচিত ও বাংলা দেশে প্রচলিত গান। পল্লীগান বা লোকসংগীত বাংলা ভাষায় রচিত হইলেও আধুনিক সংগীতজ্ঞদের মতে তাহা স্বতন্ত্র রীতির গান রূপে বিবেচিত হয়। ‘বাংলা গান’ এ নাগরিক বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয়। অবুল ফজল রচিত ‘আইন-ই-অকবরী’ গ্রন্থে ‘বঙ্গলা’ নামক একপ্রকার প্রণয়মূলক গীতের উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবত ইহাই ‘বাংলা -গান’এর আদি অবস্থা। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ ১৬শ শতাব্দীর পরে, নাগরিক বাংলা ভাষায় রচিত শাস্ত্রীয় রাগ-তাল আশ্রিত অভিজাত সমাজে প্রচলিত যাবতীয় গানকেই ‘বাংলা গান’ নামে আখ্যায়িত করা হইত। ১৮শ-১৯শ শতকে নাগরিক সমাজে প্রচলিত আখড়াই, হাফ- অখড়াই, কবিগান, পক্ষীর গান, সঙের গান,অগমনী গান, বিজয়ার গান, উমা সংগীত, মালসীর গান, নাটগীত, যাত্রাগান, টপ্পাগান প্রভৃতি গানগুলিকে ‘বাংলা-গান’ এর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে। ১৮শ- ১৯শ শতকে উপরোক্ত প্রকৃতির গানগুলিকে একত্রে ‘বাংলা গান’ বলা হইলেও গীতস্রষ্টাদের নামানুসারেও স্বতন্ত্রভাবে প্রচার করিবার রীতি প্রচলিত আছে, যেমন-‘নিধুবাবুর গান’ ‘কালী মির্জার গান’, শ্রীধর কথকের গান’, ‘দ্বিজেন্দ্রলালের গান’ প্রভৃতি। বিংশ শতাব্দীতে বাংলা গানের নানা শ্রেণিকরণ লক্ষ্য করা যায়, যথা- বাংলা টপ্পা, যাত্রা গান, থিয়েটারী গান, কবিগান, রামপ্রসাদী গান, শ্যামাসংগীত, ছায়াচিত্রের গান, রবীন্দ্রসংগীত, ব্রহ্মসংগীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদী গান, রজনীকান্তের গান, নজরুলগীতি, আধুনিক বাংলা গান, রাগপ্রধান বাংলা গান, রাগাশ্রয়ী বাংলা গান, বাংলা

গণসংগীত প্রভৃতি। সাম্প্রতিক কালে 'জীবনমুখী বাংলা গান' নামক এক নূতন প্রকার-ভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমানে কোনও কোনও সংগীত প্রতিষ্ঠান 'রবীন্দ্রসংগীত', 'গণসংগীত' ইত্যাদিকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের গানগুলিকে (ক) 'বাংলা গান' এবং ইহার পূর্বে রচিত গানগুলিকে (খ) 'পুরাতনী বাংলা গান' এইভাবে পৃথকীকরণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু ইহা সর্বজন স্বীকৃত হয় নাই।"[৬]

বাঙালির সাহিত্য, সঙ্গীত, ও সংস্কৃতির উন্নতি ঘটে প্রধানত পাল ও সেন রাজাদের রাজত্বকালেই। বঙ্গভূমির সঙ্গে অন্যান্য দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় পাল রাজাদের আমলেই। অষ্টম শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ছিল পাল রাজত্বকাল। এই সময় সঙ্গীত ও সাহিত্য রচিত হয়েছে সংস্কৃতে অথবা প্রাকৃতে। প্রবন্ধসঙ্গীত নামে এক ধরনের উত্তর ভারতীয় গীতধারা তখন বঙ্গভূমিতে প্রবেশ করে। সেন রাজাদের আমলে, দরবারী সঙ্গীতের যাত্রা শুরু হয়। এরপর কেটেছে কয়েক শত বছর এবং আমরা পেলাম চর্যাগীতি। বাংলা ভাষা ও সঙ্গীতের আদি নিদর্শন চর্যাগীতি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি সংগ্রাহকরূপে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিবৃত্ত ও পুঁথি সন্ধানের নিমিত্তে নেপালের রাজ-গ্রন্থাগার থেকে এটি আবিস্কার করেন ১৯০৭ সালে।

বাংলা গানের উৎপত্তির ইতিহাস তথা পরবর্তী গীতধারা রচনার ইতিহাস নিয়ে নানা মতভেদ প্রচলিত। ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, চর্যাগীতির রচনাকাল ৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমাণ করেছেন, আনুমানিক ৬৫০ খ্রিস্টাব্দের ভাষা চর্যাপদে লিপিবদ্ধ। সে আলোকে বলা যায় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই এ পদগুলি রচিত। তবে আনুমানিক অষ্টম থেকে দশম ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে চর্যাগীতি, নাথগীতি, চাচর ও হোলী নামক কতগুলি গীতিরীতির ধারা এ দেশে ছিল, বর্তমানে যার প্রচলন নাই। চর্যাগীতিকেই বাংলা ভাষায় রচিত আদি বা প্রাচীনতম বাংলা গান বলা যায়- যা ক্রমবিকাশের পথ বেয়ে বর্তমান যুগে পৌঁছেছে সমৃদ্ধতর রূপে। বাংলাগান আরও বিশেষভাবে পরিপুষ্ট ও অধিকতর সৌন্দর্যমণ্ডিত হয় জয়দেবের গীতগোবিন্দ (জয়দেবের পদাবলী সংস্কতে রচিত হলেও ভাষা, ভাব ও ছন্দের দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, সে অনুযায়ী পরবর্তীকালের বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী গানের জনকরূপে খ্যাত) ও বিদ্যাপতির পদাবলী, বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত হবার পর। "বাংলা গানের ক্রমবিবর্তনের ধারাকে তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করতে পারি, যথাক্রমে প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান (আধুনিক) যুগ রূপে। খ্রিস্টীয় ৮ম থেকে প্রায় ১৫ শতক পর্যন্ত চর্যাগীতি, গীতগোবিন্দ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মঙ্গলগীতির কাল। এই কাল বা যুগকে বাংলা গান সৃষ্টির আদিপর্ব বলা যায়। চৈতন্যদেব, নানক, কবীর, তুলসীদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতির আবির্বাভকালই বাংলা গানের মধ্যযুগ বা বাংলা গানের মধ্যপর্ব এবং রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নিধুবাবু, দাশরথি,

লালন, রাধারমন, হাসন রাজা, প্রমুখজন থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুল প্রসাদ ও কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত যুগকে আধুনিককাল বা বাংলাগানের আধুনিক পর্ব বলে ধরে নিতে পারি।"[৭] বাংলা গান ক্রমবিবর্তন বা বিকাশের যে সুদীর্ঘকাল প্রবাহ তা মোটামুটি এরকম– আদিপর্ব বা প্রাচীন যুগ: ৮ম–১২ শতক: চর্যাগীতি, নাথগীতি। মধ্যপর্ব বা মধ্যযুগ ১২–১৮ শতকের মধ্যভাগ: জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিদ্যাপতির পদাবলী, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলগান, পাঁচালী, শাক্তগীতি। বর্তমান বা আধুনিক যুগ: ১৮ শতকের শেষভাগ-২০ শতক, কবিগান, যাত্রাগান, বাউলগান, নিধুবাবুর টপ্পা, ব্রহ্মসঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান, পঞ্চকবির গান।

বাংলা গানের উন্মেষ ঘটেছে সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সাংকেতিক সাধনপদ্ধতি, চর্যাপদ বা চর্যাগীতির মাধ্যমে। এর ঠিক পরেই রচিত হয় সঙ্গীত জগতের এক নবতরঙ্গ জয়দেবের গীতগোবিন্দ। বাংলা গানের ধারায় এরপরে এলো বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। চারশো আঠারো (৪১৮) পদ সম্বলিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১৪৫০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত হয়েছে বলে অনুমান করেছেন রাধাগোবিন্দ বসাক এবং সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। তারপরে এলো এক ধরনের নতুন সঙ্গীতরীতি মঙ্গলকাব্য। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মঙ্গলকাব্যের যুগ। যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা থাকে এবং মঙ্গলসুরে গাওয়া হয় তাই মঙ্গলগান বা মঙ্গলকাব্য। কীর্তন হচ্ছে তৎপরবর্তী উল্লেখযোগ্য বাংলা সঙ্গীত যা শ্রী চৈতন্যদেবের হাতে এক অভিনব রূপলাভ করে। তাঁর আবির্ভাবের পর পঞ্চদশ শতাব্দীতে কীর্তনে প্রবর্তন ঘটে ভক্তি বা বিশ্বাস বিষয়ক ভাবধারার। চৈতন্যের প্রধান তিনজন ভাব শিষ্য বৃন্দাবন দাস, মুরারী দাস এবং গোবিন্দ দাস পর্যাপ্তসংখ্যক কীর্তন রচনা করেন। প্রকৃত অর্থে গান হিসেবে কীর্তন কোনদিনও বিলুপ্ত হয়নি। কীর্তনের সমসাময়িককালেই শাক্তসঙ্গীতের সৃষ্টি। শাক্তপদাবলী শ্যামা বা কালীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়। শাক্তপদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বপ্রথম রচয়িতা রামপ্রসাদ সেন (আ. ১৭২০-১৭৮১ খ্রিঃ)। এর পরে কবিগান। লর্ড ক্লাইভের আমল থেকে কবিগানের উৎপত্তি ও প্রসার। ১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৮৫৯ খ্রিঃ কবিগানের সফল সময় ছিল। রাসু, নৃসিংহ, নালু, নন্দলাল এবং রঘুনাথ দাস কবিগান নামক নতুন রীতির প্রবর্তনের অগ্রনায়ক। পরবর্তীতে রামবসু কবিগানে নতুন কিছু অনুসঙ্গ যুক্ত করেন। রামবসুর সেই ধারাই আজ অবধি প্রচলিত। কবিগান গণ মানুষের কাছে তেমন সহজবোধ্য না হয়ে ওঠার জন্য, তেমন জনপ্রিয়তাও অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে প্রচলন ঘটল সহজ ভাষার, প্রাঞ্জল ও বোধগম্য গীতরীতি পাঁচালী। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এর উৎপত্তি। গীত ও আবৃত্তি দুইভাবেই পাঁচালী পরিবেশিত হতো। জনৈক দশরথ রায় পাঁচালী পরিবেশনে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন সে সময়। পরবর্তীতে আসল যাত্রাগান। যদিও এর উদ্ভব হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে কিন্তু আধুনিককালে অভিনয় সহযোগে

আমরা যে যাত্রা দেখি তার সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীতে। প্রাচীন ভারতে কোনো দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে, উৎসব দিনে, নৃত্য-গীত সহযোগে যে শোভাযাত্রা বের হতো– তাকেই যাত্রা বলা হতো।

যাত্রার পরে আমরা পেলাম বাউলগান। বাউলদের নিকট মানবদেহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতীক। বাউল দর্শন হলো- 'যা আছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তা আছে দেহভাণ্ডে'। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম– পঞ্চভূতে দেহসহ পৃথিবীর সবকিছু তৈরি। মাটি, জল, আগুন, বায়ু, শুন্য এ পঞ্চতত্ত্ব একে অপরের মধ্যে লীন হয়ে যায়। পঞ্চতত্ত্ব হতেই সব সৃষ্টি আবার এই পঞ্চতত্ত্বেই সকল তত্ত্বপ্রাপ্ত হয়। এই পঞ্চতত্ত্বের পরে যে তত্ত্ব, তাকে বলে তত্ত্বাতীত বা নিরঞ্জন। পঞ্চভূতে ব্রহ্মান্ডের সকল সৃষ্টি ও বিনাশ। দেহকে বাউলরা পবিত্র মনে করেন। দেহের মাঝে যে আত্মা বিরাজমান সেই আত্মার সন্ধানই হচ্ছে বাউল মতবাদের মূল লক্ষ্য। আত্মাকে ভজন করলে জানলে পরমাত্মা বা নিরঞ্জনকে জানা হয়, ভজনা করা হয়। বাউল সাধনায় সীমা- অসীমের সম্পর্ক ঘুরে ফিরে আসে। প্রেম সাধনার ভিতর দিয়েই বউলরা অসীমকে সীমার বোধগম্য করে তুলতে চায়। যদিও সতের শতকের দ্বিতীয় ভাগ (১৬৫০ খ্রি) হতেই বাউল মতের উন্মেষ কিন্তু উনিশ শতকের পূর্বে বাউল সঙ্গীতের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। সুধীজনের ধারণা মাধববিবি ও আউলচাঁদ এই মতের প্রবর্তক। তবে মাধববিবির শিষ্য নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রই বাউলমত জনপ্রিয় করে তোলে। উনিশ শতকে লালন ফকিরের সাধনা ও সৃষ্টির মধ্য দিয়েই এর পরিপূর্ণ প্রকাশ।

বাউলগানের পরেই বাংলা গানে যুক্ত হয় এক অভিনব অনুষঙ্গ যা আগে কখনো ছিল না বাংলা গানের ভুবনে। এ ধারার নাম বাংলা টপ্পা। বাংলা গানের ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা হয় টপ্পা গানের ভিতর দিয়ে। বাংলা গানের ধারায় আধুনিকতার উন্মেষের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন রামনিধিগুপ্ত (১৭৪১–১৮৩৯), যিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন নিধুবাবু নামে, এবং তাঁর গানের নাম হলো পরবর্তীতে নিধুবাবুর টপ্পা। নিধুবাবুর টপ্পা গান দিয়েই বাংলা গানের মানবিকতার দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। সকল প্রকার দৈবিকতা ও আধ্যাত্মিকতামুক্ত গীত রচনার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন রামনিধি গুপ্ত। বাংলা গানকে তিনি সাধন সঙ্গীতের পর্যায় থেকে নরনারীর ভালোবাসার গানে পর্যবসিত করেছিলেন। এরপর এলো ব্রহ্মসঙ্গীত। ব্রহ্মসঙ্গীত ধ্রুপদের আঙ্গিকেই- প্রধানত রচিত। উনিশ শতকে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্রাহ্মধর্মের উপাসনার অঙ্গ হিসেবে ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়া হয়। ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গ হিসেবে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২–১৮৩৩) প্রথম সঙ্গীতের ব্যবহার করেন এবং উপাসনার উদ্দেশ্যে প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীতটি তিনিই রচনা করেন। রামমোহন থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছেন।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম (বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশ্রমিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীতকে যুক্ত করে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার আসনে এর পরিপূর্ণ মর্যাদা দান করলেন। তাই বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সঙ্গীত যে শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম সেকথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত ভবনে, সঙ্গীত বিভাগ প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে পরবর্তীতে তার বাস্তব রূপায়ণ ঘটে এবং এ থেকেই সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বিদ্যাচর্চার আরম্ভ এ উপমহাদেশে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় চেতনার পুনরুন্মেষ তথা স্বাজাত্যপ্রীতির তাগিদ প্রবণতা দেখা যায়। যে কোনো পরাধীন দেশের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা বিদ্যমান থাকে সে দেশের শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত প্রভৃতির আধারে। এ দিক দিয়ে সিপাহী বিপ্লবই সেই জাতীয় প্রথম আন্দোলন এ দেশে। এর পরে স্বদেশী আন্দোলন। যার ফলে প্রবল আন্দোলনের আলোড়ন জেগেছিল বৃটিশদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে। জনচিত্তে সূচনা হলো নবজাগরণের। দেশবাসীর অন্তরে সঞ্চার হলো নবচেতনার। দেশের মধ্যে একটা উদ্দীপনার জোয়ার বইতে লাগল কাব্যে ও গানে, শুরু হলো দেশাত্মবোধক গানের পর্ব। ক্রমে পরাধীনতার গ্লানি মোচনে উদীপ্ত হয়ে উঠল জনচিত্ত। এ যুগের পটভূমিকায় ও জীবন বাস্তবতায় আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১)। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গরোধ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এ যুগকে বলা হয় 'স্বদেশী যুগ' এবং এ সময় সারাবাংলায় রাখিবন্ধন উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রাণচাঞ্চল্যের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। এ থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত। এই উৎসবকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকসুরে– বাংলার মাটি, বাংলার জল বাংলার বায়ু, বাংলার ফল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯৩১) লিখলেন– বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ, রজনীকান্ত সেন (১৮৬৪-১৯১০) লিখলেন– মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই। অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) স্বদেশ চেতনায় মত্ত হয়ে লিখলেন– বল বল বল সবে শত বীণাবেনু রবে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লভে।' এদিকে শুরু হলো আর এক মহাত্মা কাজী নজরুলের অগ্নিময়ী বীণাঝংকৃত কবিতা ও গান। দেশময় উদ্দীপনায়, নবচেতনার রক্তকমল ফুটিয়ে, মহাপ্লাবন বইয়ে দিলেন শিকল ভাঙার গান গেয়ে নজরুল। কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী, এই শিকল পরা ছল, মোদের এই শিকল পরা ছল, দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে সহ অসংখ্য স্বদেশী গান সে সময় সৃষ্টি করলেন নজরুল। নবউদ্দীপনায় আরও যুক্ত হলেন চারণকবি মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪)– ভয় কি মরনে রাখিতে সন্তানে, মাতঙ্গি মেতেছে আজ সমররঙ্গে গান নিয়ে। এভাবেই বাংলা সঙ্গীতে উন্মোচিত হলো নতুন দ্বার, নতুন গতিবেগে সঞ্চারিত হলো দেশাত্মবোধক গান বা দেশের গান। উল্লেখ্য বাংলা দেশাত্মবোধক গানের প্রথম সূচনা নিধুবাবুর হাত ধরে এবং এরপর ১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতার বেলগাছিয়ার ডনকিন সাহেবের বাগানে রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্রের যৌথ উদ্যোগে

এবং ঠাকুর পরিবারের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় 'হিন্দুমেলা' নামে শুধুমাত্র স্বদেশ চেতনায় পরিপূর্ণ একটি জাতীয় মেলা বা স্বদেশী মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। হিন্দুমেলার প্রথম অনুষ্ঠান উপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখলেন–'মিলে সব ভারত সন্তান একতান মনপ্রাণ/ গাও ভারতের যশোগান' গানটি। এ মেলাকে উদ্দেশ্য করে সেসময় অসংখ্য দেশের গান রচিত হয়েছিল। ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার মাধ্যমে প্রথম দেশাত্মবোধের উন্মেষ ঘটে বাঙালির মনে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমেও দেশাত্মবোধ জেগেছিল সে সময়। মূলত ১৯১১ সালে এসে বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ধারা স্তিমিত হয়ে আসলে এক্ষেত্রে গভীর শূন্যতা দেখা দেয় এবং তখনই দেশবন্দনার গভীর ধ্যান নিয়ে স্বদেশ সঙ্গীত রচনাব্রতী হয়ে সে শূন্যতা পূরণ করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর আবার একবার বঙ্গভঙ্গ হয়েছে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের কারণে এবং সাতচল্লিশ অবধি নানাজনের হাত ধরে দেশাত্মবোধক গান সমৃদ্ধ হয়েছে। পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পুনর্জাগরণ এবং যার পরিণতি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় অর্জন। ৫২ ও ৭১– কে উপলক্ষ করে বাঙালি পেয়েছে ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু আর ভাইহারা বোনের বেদনামথিত মহান একুশের গান, পেয়েছে সুনীল আকাশে ভোরের পাখির কাকলী সমেত মুক্তির গান। বাংলা সঙ্গীত দেশীসঙ্গীতের আদর্শে পরিচালিত, যেখানে মুখ্য কথা ও সুরের সমন্বয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে এবং রাগসঙ্গীতচর্চার মধ্য দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সঙ্গীতে নব নব সুরসমাবেশ লক্ষ্য করা গেল। কাব্যমাধুর্যে ও সুরবৈচিত্র্যে বাংলা গান শ্রোতাপ্রিয়তাসহ বিশিষ্টতা লাভ করলো রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল প্রমুখ সঙ্গীতকারদের সৃষ্টিশৈলীতে। বাংলা গানের আধুনিক ধারার নবসূত্রপাত এই পঞ্চপ্রধান কবির সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান

(ক) আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান,

তুমি জান নাই তুমি জান নাই, তার মূল্যের পরিমাণ।

(খ) তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম,

নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী সম।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান

(ক) আজি গাও মহাগীত মহাআনন্দে, বাজো মৃদঙ্গ গভীর ছন্দে

(খ) ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ভেসে আসে

রজনীকান্ত সেনের গান

(ক) আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু, কম করে মোরে দাওনি

(খ) আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছো

অতুলপ্রসাদ সেনের গান

(ক) বঁধু ক্ষণিকের দেখা তবু তোমারে, ভুলিতে পারে না আঁখি

(খ) একা মোর গানের তরী ভাসিয়ে ছিলাম নয়ন জলে, সহসা কে এলে গো

কাজী নজরুল ইসলামের গান

(ক) গভীর নিশিথে ঘুম ভেঙে যায়, কে যেন আমারে ডাকে সে কি তুমি

(ক) এখনো ওঠেনি চাঁদ, এখনো ফোটেনি তারা

বাংলা গানের বিচিত্র ধারা

চর্যাগীতি

বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রাচীন নিদর্শন। "বৌদ্ধদের ব্রজায়নী সম্প্রদায় 'বজ্র' নামীয় এক ধরনের গীতিকবিতা গাইতো। বৌদ্ধদের আরেক সম্প্রদায় শাহজাহানী বৌদ্ধরা উচ্চাঙ্গ সুর এবং তালে 'চর্য্যা' গান গেয়ে থাকতো।... বৌদ্ধ ধর্মীয় সঙ্গীত 'চর্য্যা গীতিকা' বাংলা গানের আদি নিদর্শন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উৎসকাল ৮ম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী সময়ের মধ্যেই এসব গীতিকা রচিত হয়েছিল। এসব গানে তদানীন্তন বৌদ্ধ যাজকরা ইহলৌকিক জ্বরা এবং দুঃখ অতিক্রমণের নানাবিধ পথ ও উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।... এসব গানের মূল লক্ষ্যই

ছিল প্রকৃত সত্যের প্রত্যাশায় আধ্যাত্মিকতার সন্ধান করা।... এর মূল অভীষ্ট লক্ষ্যই হচ্ছে গান গাওয়ার মাধ্যমে ধর্মীয় উদ্দেশ্য লাভে সাফল্য অর্জন। অতএব এই গানগুলোর বক্তব্যে উপাসনাবাক্য বা স্তোত্রেরই প্রাধান্য ছিল।"[৮] দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে চর্যাপদ রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। ১৮৮২ সালে বাঙালি গবেষক রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রথম নেপালের সংস্কৃত ভাষায় পুঁথির তালিকা প্রকাশ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সরকার কর্তৃক দায়িত্ব-প্রাপ্ত হয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯৭, ১৮৯৮ ও ১৯০৭ সালে তিনবার নেপালে গিয়ে পুঁথি সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত পুঁথিগুলির মধ্যে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতের আদি নিদর্শন বলে অনুমান করা হয়। শাস্ত্রী মহাশয় চর্যাপদের যে পুঁথিটি আবিস্কার করেন, সেটি মূলত মুনি দত্ত নামে একজন পণ্ডিতের সংস্কৃত টীকা সম্বলিত গীতিসংকলন। এই পুঁথিটিতে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ ও তেইশজন পদকারের নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন লুইপাদ, কুক্কুরীপাদ, বিরুবাপাদ, গুণ্ডরীপাদ, চাটিল্লপাদ, ভুসুকুপাদ, কৃষ্ণাচার্যপাদ (কাহনূপাদ) প্রমুখ। কবিদের মধ্যে কৃষ্ণাচার্যপাদের নাম গীতসংখ্যার বিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা ১৩ টি। চর্যায় সকল সুধী পণ্ডিতরা সংস্কৃত 'পজ্ঝটিকা' ছন্দের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। চর্যাগীতি এক প্রকার সাংকেতিক ভাষায় রচিত। মুনি দত্ত এই ভাষাকে বলেছেন সান্ধ্যভাষা। সান্ধ্যভাষা মানে আলো–আঁধারি ভাষা। কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না। চর্যা গানের মোট সংখ্যা একান্ন। এর মধ্যে একটি গান বাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মোট গানের সংখ্যা পঞ্চাশ। চর্যাগীতির ২৩ সংখ্যক গানের শেষ অংশ এবং ২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক গান তিনটি পাওয়া যায়নি, কারণ তাতে কতগুলি পাতা ছিল না। প্রতিটি চর্যাপদের শীর্ষে রাগের উল্লেখ থাকলেও তালের উল্লেখ ছিল না। তবে যে তিনটি চর্যা পাওয়া যায়নি তার একটির অনুবাদে 'ইন্দ্রতাল' নামটি পাওয়া যায়। তাই স্পষ্টই বলা যেতে পারে পুঁথিগুলি প্রধানত গাইবার জন্যই রচিত হয়েছিল। চর্যাগীতিতে মোট ১৫ টি রাগ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– পটমঞ্জরী, গবড়া, অরু, গুর্জরী, গুঞ্জুরী দেবক্রী, মালসী, কামোদ, ভৈরবী, দেশাখ, ,শবরী, মল্লারী, বঙ্গাল প্রভৃতি। উল্লেখিত রাগগুলির মধ্যে পটমঞ্জরীতে সবচেয়ে বেশি গীতি (১২ টি) এবং মল্লারীতে ৫ টি গীতি রচিত। চর্যাগীতির রাগ সম্পর্কিত আলোচনায় ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের বক্তব্য এখানে স্মরণযোগ্য:

"সংগীতে ইতিহাসের দিক হইতে চর্যাগীতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাগ শবরী ও বঙ্গাল রাগ। শবরী রাগতো নিঃসন্দেহে সবরদের মধ্যে প্রচলিত রাগ। এই লোকায়ত রাগটির মার্গীকরণ কবে হইয়াছিল বলা কঠিন, তবে ইহার উল্লেখ শুধু চর্যাগীতিতেই পাইতেছি, আগে বা পরে সে উল্লেখ আর কোথাও দেখিতেছি না। বঙ্গাল রাগও যে কি ধরনের আজ তাহা বুঝিবার উপায় নাই, তবে এই রাগটিও যে এক সময় গুর্জরী, মালবশ্রী বা মালসী প্রভৃতি রাগের মত স্থানীয় লোকায়ত রাগই ছিল, সন্দেহ নাই। অথচ ভারতীয় মার্গ–সংগীতে বঙ্গাল-রাগ এক সময় সুপরিচিত রাগ ছিল, এবং অষ্টাদশ শতকের রাজস্থানীয় চিত্রনিদর্শনে বঙ্গাল রাগের চিত্রও দুর্লভ নয়। পরে কখন কীভাবে যে এই

রাগটি লুপ্ত হইয়া গেল তাহা জানা যাইতেছে না। বস্তুত, চর্যাগীতির দেবক্রী, গউড়া বা গবড়া মালসী গবুড়া, শবরী, বঙ্গাল, কান্থ–গুর্জরী প্রভৃতি অনেক রাগই আজ বিলুপ্ত। দেশাখ রাগ তো বোধ হয় আজিকার দেশ রাগে বিবর্তিত বা রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। অরু রাগ যে কি তাহাও আজ আর বুঝিবার উপায় নাই।"[৯]

বর্তমানকালে বাংলা গানে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ এই চার তুক বা পর্যায়ের পরিবর্তে সেকালে ছিল উদগ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ। এদের বলা হতো ধাতু। বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের নাম চর্যাগীতিতে পাওয়া গেছে যেমন– পটহ বা ঢোল, মাদল, করন্ড, কসাল, দুন্দুভি, ডমরু, ডমরুলি, বীণা প্রভৃতি।

একটি চর্যাগীতির উদাহরন:

(রচয়িতা: চাটিল্ল পাদানাম/ রাগ– গুঞ্জুরী)

"ভবনই গহণ গম্ভীর বেগে বাহী।

দুআন্তে চিখিল মাঝেন থাহী। ধ্রু ॥

অর্থাৎ ভবনদী গভীর গম্ভীর বেগে বহমান, তার দুই তীরে কাঁদা, মধ্যিখানে ঠাঁই নেই।"[১০] এরপর প্রায় পাঁচশো বছর ধরে বাংলা গান পরিণত হতে লাগল। ১২শ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭শ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচশো বছরে চর্যাগীতির সঙ্গে সংযোজিত হলো শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলগীতি, এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কীর্তন। অবশ্য এই সময়কালের মধ্যে উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতিও সৃষ্টি হয়েছে। পরিণত হয়েছে রাগসঙ্গীতও। "যে সঙ্গীত পদ্ধতিকে আমরা হিন্দুস্তাণী সঙ্গীত বলছি, বাংলা গানের বিকাশে এর প্রভাব প্রচুর। এর আগেকার যুগের প্রবন্ধসঙ্গীতের প্রভাবও বাংলা গানে পড়েছে।"[১১] সেই সময় ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা সঙ্গীত প্রভৃতি উত্তরভারতে বহুল প্রচলিত ছিল। অথচ বাংলা গান, কয়েকটি ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল। পরবর্তী দু'শো বছরে, বাংলা গান সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে হিন্দুস্থানী তথা উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের সমৃদ্ধতম শাখায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বেশ কয়েক প্রকার, ব্যক্তিসৃষ্ট বাংলা গান কীর্তন, কবিগান ইত্যাদি তৈরী হলো।

গীতগোবিন্দ

কবি জয়দেব রচিত সঙ্গীত পদগ্রন্থ গীতগোবিন্দ চর্যাগীতির পর সঙ্গীতশৈলীর অন্যতম নিদর্শন। বাংলা গান এমনকি ভারতবর্ষের সঙ্গীত ও নৃত্যকলার ইতিহাসে এক অমূল্য গুরুত্ববাহী গ্রন্থ গীতগোবিন্দ। সংস্কৃত ভাষায় রচিত দ্বাদশ শতকের 'গীত-গোবিন্দ' কাব্যগ্রন্থ হিসেবে যেমন বন্দিত, তেমনি সঙ্গীতশৈলীরও একটি নন্দিত নিদর্শন বলে বিবেচিত। সংস্কৃত সাহিত্যেও শেষ শিল্পী কবি জয়দেব এবং সাহিত্য তথা সংগীতের প্রধানতম প্রাণপুরুষ। বাংলার প্রাণের সুরটি জয়দেবই সর্বপ্রথম ধরিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বাঙালির অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত ও নাট্যপ্রয়াস প্রভাবিত হয়েছে এই গীতগোবিন্দের দ্বারা। বাঙালির বিশিষ্ট অবদানরূপে বিবেচিত হয় সংগীতের যে পদাবলীকীর্তন, তা গীতগোবিন্দের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় রচিত।

জয়দেব দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার অজয় নদী তীরবর্তী কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বলে কথিত। তাঁর পিতার নাম ভোজদেব, মাতা বামা দেবী। জয়দেবের পত্নীর নাম পদ্মাবতী। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী তাঁর বাংলা গানের ধারায় উল্লেখ করেছেন– "জয়দেবের জীবনকাহিনী নিয়ে মতভেদ আছে বিস্তর। মোটামুটিভাবে বলা যায়, তিনি ছিলেন রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবি, অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। জয়দেব কি বাঙ্গালি? জন্মস্থান কি কেন্দুবিল্ব ? এ সংশয়ের ঘোর এখনও কাটেনি। তবে, বীরভূমের অজয় নদীর তীরে কেঁদুলি গ্রামে এখনও প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমায় জয়দেব-স্মৃতিবাহী মেলা বসে থাকে। অসংখ্য বাউল, বৈষ্ণব, ফকিরদের সমাবেশ ঘটে সেই সময়ে, নৃত্যগীতে মুখরিত হয়ে ওঠে কেঁদুলি প্রাঙ্গণ। বাউলদের ধারণা, জয়দেব সহজ পথের সাধক অর্থাৎ সহজিয়া। প্রসঙ্গক্রমে এখানে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বক্তব্য স্মরণ করতে পারি। তাঁর মতে, জয়দেবের উপর বৌদ্ধ সহজিয়াদের পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল। সহজিয়ারা প্রকৃতি–পুরুষের মিলন সুখকে একমাত্র কাম্য মনে করে, সম্ভোগের পরম তৃপ্তির জন্যেই তাঁদের দেহতত্ত্বের সাধনা। জয়দেবের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব– ইন্দ্রিয় আর অতীন্দ্রিয়ের সমন্বয় ঘটালেন কাব্যের লাবণ্যপথে, বাস্তব আর কল্পনার জগৎ এখানে কল্পনাবদ্ধ। দেখা গেছে মর্ত্য ও অমর্ত্য ভাবধারার নিগূঢ় তপ্ত মিলন। রাধা স্বকীয়া নন, তিনি পরকীয়া নারী, তাইতো তাঁর প্রেমে জোয়ারের তীব্রতম স্রোত। আকর্ষণ বড়ো দুর্বার। তাই, নিয়মরীতি, বাধাবন্ধন, সংসার সমাজধর্ম, দেহ-মন, সব কিছু দূরে ঠেলে, সবকিছু বিসর্জন দিয়ে শ্রীমতি রাধা এগিয়ে চলেছেন দিব্য অভিসারে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পানে। কবি জয়দেবের পূর্বে কুঞ্জে মিলিত শ্রীরাধা-কৃষ্ণের এমন উচ্চ মধুর জয়ধ্বনি আর কাহারো কান্ত কোমল কণ্ঠে উচ্চারিত হয় নাই। বাংলায় প্রচলিত প্রবাদ কানু ছাড়া

গীত নাই, রাধা ছাড়া সাধা নাই। এর মূল প্রেরণা এসেছে জয়দেবের থেকেই, এমন ধারণা অমূলক নয়।"[১২] রাধা-কৃষ্ণের মিলনলীলা অবলম্বনে এই গীতগ্রন্থ রচিত। দ্বাদশ শতকের শেষভাগে জয়দেব বর্তমান ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী থেকে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন কবি, গায়ক, নৃত্যবিদ, ও সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ।

গীতগোবিন্দ রচনা জয়দেবের অমর কীর্তি। পদ্মাবতী সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে, তিনি দাক্ষিনাত্যের কন্যা, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে দেবদাসী নিযুক্ত করার জন্য তাঁকে পারিবারিকভাবে নৃত্যগীতে সুশিক্ষিত করা হয়। কিন্তু দৈবাদেশে তাঁর বিয়ে হয় জয়দেবের সাথে। কথিত হয়েছে যে জয়দেব স্বয়ং রাজা লক্ষণ সেনের সভায় গীতগোবিন্দের গান করতেন এবং নেচে তাঁর নৃত্যরূপ পরিস্ফুট করতেন পদ্মাবতী। গীতগোবিন্দে ১২টি সর্গ, ২৪ টি গান আর ৮০ টি শ্লোক। এই চব্বিশটি গানই এর মূল আধার। প্রতি সর্গেই প্রতি গানের শিরোদেশেই রাগ তালের উল্লেখ পাওয়া যায়। সবকটি গানই মাত্রাবৃত্ত অপভ্রংশ ছন্দের আশ্রয়ে রচিত। সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দ সেখানে অনুপস্থিত। প্রথম সর্গ গেয় বসন্ত রাগে ও যতি তালে, দ্বিতীয় সর্গ গেয় মালব গৌড় রাগে এবং একতালে, তৃতীয় সর্গ গুর্জরী রাগে ও একতালে এছাড়াও রামকিড়ি, কর্নাট, দেশাখ, দেশ-বরাড়ী, মালব ভৈরবী, বিভাস। যেসব তালের উল্লেখ আছে: রূপক, নিঃসার, যতি, একতাল, এবং অষ্টতাল। সর্গ আরম্ভেও প্রস্তাবনার পরই মূল গীত প্রবন্ধ আরম্ভ হতো। গীতগোবিন্ধ মূলত প্রবন্ধগীতি। প্রাচীন ধ্রুব প্রবন্ধের রীতিতে এর গান রচিত বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দে ব্যবহৃত রাগ ভৈরবী, বিভাস, বসন্ত, দেশ বর্তমানে রাগসংগীতে প্রচলিত এবং যেসব তালের উল্লেখ আছে , বাংলা কীর্তনে এখনও তার পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ:

"(বসন্ত- রাগেন যতি-তালেন চ গীয়তে)

ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে

মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কুজিত কুঞ্জ কুটীরে।

বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে

নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং

সখি বিরহি জনস্য দূরন্তে।"[১৩]

বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বসন্ত রঞ্জন রায় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। বসন্ত রঞ্জনই এর নাম দেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ সংগ্রহ থেকে একটি পুঁথি সংগ্রহ করে আনেন বসন্ত বাবু। এ গ্রন্থের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস নামে বিদিত। বসন্ত রঞ্জনই এর নাম দেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। পুঁথির ভিতরে পাওয়া ছেঁড়া পাতা থেকে কেউ কেউ এর নাম নির্দেশ করেন 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ'। গ্রন্থে প্রাপ্ত চিরকুটে যে সালের উল্লেখ আছে, সে অনুযায়ী রচনাকাল ১৬৮২ সাল। তবে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও রাধাগোবিন্দ বসাক যৌথভাবে মত প্রকাশ করেন যে ১৪৫০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত এবং এখন পর্যন্ত এই মতই সর্বাধিক প্রচলিত মত। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মোট পদসংখ্য চারশো আঠারো (৪১৮) টি। প্রতিটি পদের সুর তালের গায়ন রীতি পরিবর্তনের সঙ্গে ছন্দের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা হয়েছে । শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। যেমন: জন্ম খণ্ড, তাম্বুল খণ্ড, দান খণ্ড, নৌকা খণ্ড, ভার খণ্ড, ছত্র খণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, কালীয় দমন খণ্ড, যমুনা খণ্ড, বান খণ্ড, বংশী খণ্ড, রাধা বিরহ খণ্ড প্রভৃতি। প্রতি খণ্ডে রাধা কৃষ্ণের মিলন লীলার বিভিন্ন পর্যায় বিধৃত আছে। প্রতিটি খণ্ড একটি পালার মতো। প্রতি খণ্ড কয়েকটি গীতপ্রবন্ধের সমষ্টি। প্রথম খণ্ডের নাম জন্ম খণ্ড। জন্ম খণ্ডে রাধাকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ খণ্ড হচ্ছে দান খণ্ড, যার প্রবন্ধ সংখ্যা ছাব্বিশ। প্রতি প্রবন্ধের শিরোদেশে রাগ ও তাল নাম নির্দেশ করা ছিল। এই গ্রন্থে মোট ৩২ টি রাগের ব্যবহার করা হয়েছে। বিভাস, বিভাস কহু, সিন্ধোড়া, কানাড়া, আহের, কোড়া দেশাগ, বেলাবলী, ভাটিয়ালী, ললিত, মালব, শ্রী, রামগিরি, পটমঞ্জরী, কোড়া, বরাড়ী, পাহাড়ী, মল্লার ও আঠতলা, লঘুশেখর, লগনী, ক্রীঢ়া, দণ্ডক, কুডুক্ক, যতি, একতালী, রূপক প্রভৃতি তালের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাঙ্গীতিক পরিভাষায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিপ্রকীর্ণ জাতীয়। এ গ্রন্থে পাহাড়ী রাগযুক্ত সংখ্যাই বেশি। জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাব শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তিনটি মুখ্য চরিত্র হল রাধা, কৃষ্ণ আর বড়াই। উদাহরণ স্বরূপ:

'ঘাটের' ঘাটিয়াল মোরে। ঝাট কর পার।

তোর মায় যশোদায়। নন্দন আহ্মার

– নৌকা খণ্ড, পা ৭৭/২

মঙ্গলগান

যে গান দেবতাদের অবলম্বন করে এবং মঙ্গল আখ্যা যুক্ত হয়ে রচিত হয় তাকে মঙ্গলগান বলে। মঙ্গলগান মঙ্গলসূচক পদযুক্ত এক ধরনের গীত। মঙ্গলগানে বহু রাগ রাগিণীর উলেখ পাওয়া যায় যেগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দে ব্যবহৃত হয়েছিল। মঙ্গলগানের যুগ বলে ইতিহাসে বিবেচিত চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-১৭৬০) অবধি সুদীর্ঘকাল ধরে ধর্মীয় চিন্তাভাবনায় অনুপ্রাণিত এবং দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক নানা বিষয় নিয়ে একপ্রকার আখ্যান গীতি, যাকে মঙ্গলগান অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে। "সাধারণভাবে দেব বিষয়ক সঙ্গীত মাত্রই প্রাচীনকালে মঙ্গল সুরে গাওয়া হতো। এই মঙ্গল সুর থেকেই 'মঙ্গল' নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন। ড. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী' গ্রন্থে বলেছেন: 'যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়, যে গান মঙ্গল সুরে গাওয়া হয়–যে গান মেলায় গাওয়া হয় তাকে মঙ্গলকাব্য বলে।' মঙ্গল নামের ছন্দের মতো মঙ্গল সুর নামে কোন গীতরূপ ছিল এমন অনুমান করা গেলেও তার সুস্পষ্ট পরিচয় আজ আর জানা সম্ভব নয়।"[১৪] কথিত আছে মঙ্গলগান মঙ্গল নামক ছন্দে গাওয়া হতো। কিন্তু এই মঙ্গল নামক ছন্দের পরিচয় পাওয়া না গেলেও লৌকিক ছন্দরীতি নামক এক ধরনের বাংলা প্রাকৃত ছন্দরীতি মঙ্গলগানে লক্ষ্য করা যায়।

বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে কোনো কোনো জায়গায় সর্বপ্রথম স্থান পায় এই বাংলা মৌলিক ছন্দরীতি। মঙ্গলগান বিষয়ক কাব্যবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গলগান বিষয়ে উল্লেখ করেছেন এভাবে- "বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগে শক্তি দেবদেবীর মাহাত্ম্য সূচক একশ্রেণীর আখ্যায়িকা কাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাদিগকে মঙ্গল গান বলিত। বর্তমানে ইহা মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। মঙ্গল শব্দটি ক্রমে মাহাত্ম্য প্রচারমূলক যে কোনও রচনা বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত, তাহার ফলে চৈতন্যদেবের জীবন-চরিতকে যেমন চৈতন্যমঙ্গল বলিত, তেমনি পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক সংস্কৃত পুরানের অনুবাদকেও মঙ্গল নামে অভিহিত করা হইত, যেমন ভবানী মঙ্গল, দূর্গামঙ্গল ইত্যাদি। ক্রমে যেকোনো বিষয়ের মাহাত্ম্য সূচক পাঁচালী রচনাকেই মঙ্গল বলিত, তীর্থ মাহাত্ম্য সূচক একটি রচনা তীর্থমঙ্গল নামে পরিচিত।... খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী হইতেই মঙ্গল গানগুলি যে সুসংবদ্ধ কাহিনীর আকারে রচিত হইয়া সমাজে প্রচার লাভ করিতেছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে ব্যাপক প্রচারের ফলে ইহাদের ভাষার প্রাচীনত্ব অনেক ক্ষেত্রেই লুপ্ত হয়ে গিয়াছে, কোন রচনার মধ্যেই এখন আর চতুর্দশ শতাব্দীর ভাষার সন্ধান পাওয়া যায় না।"[১৫] চিত্তাকর্ষক এবং অলৌকিক ছিল প্রত্যেকটি মঙ্গলকাব্যের কাহিনী।

মঙ্গলকাব্যগুলি দৈবাদেশ ব্যতীত কোনভাবেই রচিত হতো না এবং মঙ্গলগানের ভিতর এই দৈবাদেশ কী ভাবে কে কখন লাভ করেছিল কবিদের সে বর্ণনাই উল্লেখ থাকতো। প্রতিটি মঙ্গলগানই সূচিত হতো দেব বন্দনা দিয়ে। কেউ কেউ সূচনা করেছেন গণেশাদি পঞ্চদেবতা দিয়ে কেউ কেউ সূচনা করতেন সূর্য দেবতার বন্দনা দিয়ে। দেবদেবীর নিকট প্রার্থনা জানিয়ে মঙ্গলকাব্যে ভনিতা করা হতো। এই ভনিতার মধ্যে কোথাও কোথাও কবিদের আত্মনিবেদন ও আত্মমগ্নতার রূপটি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তেমনি এক কবির রচনায় মঙ্গল গান-

"অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।

শ্রী কবিকঙ্কন গায় মধুর সংগীত। (মুকুন্দরাম)"[১৬]

মঙ্গলগানের সে যুগে এক সপ্তাহ বা এক মাস ধরে, মঙ্গলগান শুনবার অবসর ছিল তখনকার মানুষের। কারণ জনসাধারণের আনন্দলাভের মাধ্যম বা উপকরণ ছিল মঙ্গলগীত সে সময়। এ গানে সংগীতের বিভিন্ন রাগের পাশাপাশি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- করতাল, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, বাঁশি, সানাই, দোতারা, সেতার, মন্দিরা, রবাব, খমক প্রভৃতি। মঙ্গলকাব্য আবৃত্তি করা হতো না। নূপুর, চামর, মন্দিরা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্র সহযোগে একা বা সমবেতভাবে গাওয়া হতো। বহু আগে পুতুল নাচের সাথে অর্থাৎ 'পাঞ্চালিকা সহযোগে এই ধরনের গান গাওয়া হতো। এক ধরনের অগঠিত ছন্দে অসম্পূর্ণ ভাষাবিন্যাসে দেবদেবীর মহিমা সূচক এ পাঁচালী রচিত হয়েছিল। পরবর্তীতে এই পাঁচালীকাব্য পুরোপুরি মঙ্গলগানে রূপলাভ করে। মঙ্গল গান রচিত হয়েছিল নানা বিষয় নিয়ে তবে এর মধ্যে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল এই তিন শ্রেণির মঙ্গলগানের গৌরব সর্বাপেক্ষা। তবে রচনার দিক থেকে মনসামঙ্গল সবথেকে প্রাচীন বলে ধারণা করা হয়। বেহুলা লক্ষিন্দর, মনসা, চাঁদ সওদাগর প্রমুখকে নিয়ে গঠিত হয়েছে মনসামঙ্গলের কাহিনী। চণ্ডীমঙ্গল দুটি কাহিনী নিয়ে রচিত। একটি কালকেতু ও ফুল্লরাকে কেন্দ্র করে এবং অন্যটি উজানী নগরের ধনপতি সওদাগর এবং লহনা খুল্লনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। আর সূর্য দেবতার নাম ও মহিমা বর্ণনামূলক কাহিনী নিয়েই ধর্মমঙ্গল গান রচিত। বাংলা গানের ধারায় মঙ্গলগানের রচয়িতা রূপে বেশ কয়েকজন কবি প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি মুকুন্দরাম, কবি দ্বিজ রামদেব, কবি হরিরাম, মুক্তারাম সেন এবং সবশেষ কবি হিসেবে মনে করা হয় ভারতচন্দ্রকে। বাংলা গানের ইতিহাসের ধারায় মঙ্গলগানের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও সংগীতকাররূপে বিবেচিত হয়েছেন এই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। যদিও ভারতচন্দ্রের পরেও ছোট ছোট কিছু কাজ হয়েছে মঙ্গলগান নিয়ে কিন্তু ভারতচন্দ্রকে সব থেকে সফল বলে বিবেচনা করা হয়।

পাঁচালী

পাঁচালীও মঙ্গলগানের আওতাভুক্ত। মনসা ও চণ্ডী দেবীর পাঁচালীরূপে লিখিত হতো এ গান। দেবতাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা এই পাঁচালীর মূল বিষয়বস্তু ছিল। সে দিক থেকে মঙ্গলগান ও পাঁচালী একই ধারার। দাশরথি রায় পাঁচালী গানের সফল, শক্তিমান এবং সবথেকে প্রতিভাবান রচয়িতাদের মধ্যে একজন। দাশরথি রায়ের রচিত পাঁচালীতে সুরমাধুর্য এবং শ্রুতি সুখকর ঝংকার বৃদ্ধি পেয়েছে। পাঁচালীতে রাগের মাধুর্য নিয়ে এসেছিলেন দাশরথি রায়। বর্তমান যুগে এখনো আমাদের দেশের গ্রাম অঞ্চলের বিশেষ করে নারী সম্প্রদায় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিসহ সপ্তাহের কোনো কোনো দিন নিয়ম করে উপাসনালয়ে বা নিজ বাড়িতে শনির পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী, সত্যনারায়ণের পাঁচালী সুর সহযোগে পাঠ করে থাকেন। পাঁচালী সম্পর্কে বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে পুতুল নাচের সাথে সংশ্লিষ্টতা থেকেই পাঁচালীএসেছে। কেউ আবার বলছেন যে পাঁচজন গায়ক চামর হাতে নিয়ে পাঁচালী ছন্দে যা গাইতেন, তাই পাঁচালী গান বলে বিবেচিত। দাশরথি রায় ছাড়াও যাঁরা পাঁচালী রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ঈশ্বর গুপ্ত, ব্রজমোহন রায়, সন্ন্যাসী চক্রবর্তী, রশিক চন্দ্র রায়, ঠাকুরদাস, দ্বারকানাথ প্রমুখ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' থেকেই আধুনিক পাঁচালী রচনার সূত্রপাত। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত এমন একটি পাঁচালী লিখেছিলেন বৃন্দাবন দাস-

ধর্ম-কর্ম লোকসবে এইমাত্র জানে

মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে

দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন

পুত্তলি কর এ দিয়া বহু ধন।

শাক্তগীতি

এই গীতধারার সূত্রপাত অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে। বৈষ্ণব সাধনার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতিক রূপ কীর্তন এবং শক্তি সাধনার শ্রেষ্ঠ সুরের অভিব্যক্তি হচ্ছে শাক্তসঙ্গীত । বৈষ্ণব পদাবলী রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনলীলা অনুসরণে রচিত। শাক্ত পদাবলী শ্যামা মা বা কালীমাকে কেন্দ্র করে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে রচিত। এছাড়াও উমাকে কেন্দ্র করে আছে আগমনী বা বিজয়ার গান নামক এক ধরনের সঙ্গীত। সতের শতাব্দীতে

চলচ্চিত্রে বৈষ্ণব প্লাবন কিছুটা ক্ষীণ হয়ে গেল এবং কবিকূল প্রেমসাধনার বিষয় রেখে, মাতৃশক্তি আরাধনায় কিছুটা নিমগ্ন হলেন। ভক্ত সাধকদের মনে কালী মূর্তির ভক্তিভাব ক্রমে বাড়তে লাগল কারণ তন্ত্রসাধনা ততদিনে বাংলায় ব্যাপকতা লাভ করেছিল। শাক্তগীতির কয়েকটি ধারার মধ্যে মালসী গান, চণ্ডীগীতি, আগমনী, বিজয়া, কালীসঙ্গীত, মাতৃসঙ্গীত প্রভৃতি পরিচিত ধারা। 'শাক্তসঙ্গীত' নামের মধ্যেই শাব্দিকভাবেই শক্তিভাবের প্রকাশ। শাক্তসঙ্গীতের মূল বৈশিষ্ট্য ছেলের সাথে তাঁর মায়ের স্নেহসুলভ আলাপচারিতার মতো। শাক্তসাধক কবির কাছে তাঁর পরমারাধ্য দেবী কখনো কখনো মায়ের মতো আবার কোথাও কন্যার মতো। মনের নিদারুণ সরল সহজ ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ শাক্তপদাবলী।

শাক্তসঙ্গীতের এ যাবৎকাল পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা বলে যাঁর নাম আজও বাংলা গানের ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল তিনি রামপ্রসাদ সেন (আ.১৭২০-১৭৮১)। কথিত আছে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক রামপ্রসাদ সেন। পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার হালিশহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে আনুমানিক ১৭২০ থেকে ১৭২৩ সালের কোনো একসময়ে জন্মগ্রহণ করেন রামপ্রসাদ সেন। রামপ্রসাদের পিতার নাম ছিল রামরাম সেন। জগৎ জননীর ধ্যানে মগ্ন থেকেও মায়ার সংসারকে উপেক্ষা করেননি বা ভুলে যায় নি রামপ্রসাদ সেন একটিবারের জন্যও। সংসারের সকল কর্মের মাঝেই রামপ্রসাদ তাঁর আরাধনা অব্যাহত রেখেছেন গানে গানে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন সম্পর্কে করুণাময় গোস্বামী তাঁর বাংলা গানের বিবর্তনে উল্লেখ করেছেন- "সেসময় নদীয়ার রাজা ছিলেন সংগীতবিদ ও বিদ্যোৎসাহী কৃষ্ণচন্দ্র রায়। রামপ্রসাদের কবিত্ব ও সংগীতগুণের পরিচয় পেয়ে তিনি তাঁকে তাঁর রাজসভায় আমন্ত্রণ জানান। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তখন তাঁর সভাকবি। রামপ্রসাদ সেন তখন বৈষয়িক আকর্ষণশূন্য এবং শ্যামাসঙ্গীত সাধনায় নিমজ্জিত। তিনি রাজআমন্ত্রণে সাড় দেননি। তথাপি কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে শতবিঘা নিস্কর ভূমি দান করেন। 'কবিরঞ্জন' উপাধিও তিনি দান করেন বলে জানা যায়। রামপ্রসাদের জীবন মুখ্যত শ্যামাসঙ্গীত রচনায় ও শ্যামা সাধনায় অতিবাহিত হয়। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে কিংবদন্তি এই যে কালীমূর্তি বিসর্জনের সময় গান গাইতে গাইতে এসে মূর্তির সঙ্গে গঙ্গায় ডুবে তিনি প্রাণ বিসর্জন দেন।"[১৭] বাংলা গানের ভুবনে বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা যখন ক্ষীয়মান হয়ে আসছিল, ঠিক সে সময় শাক্তগীতিকে অবলম্বন করে, বাংলা গান বিপুল উদ্দীপনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। বলা যায় বাংলা গানের ধারায় এক ধরনের শূন্যতা চলে এসেছিল, সে সময়ে এই গীতধারা সেই শূন্যতা পূরণ করেছিল। যদিও সার্থক শাক্তগীতি রচনার মূল অনুপ্রেরণা এসেছিল বৈষ্ণব পদাবলী থেকেই। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর অস্তবেলায় শাক্তপদাবলী নতুন এক প্রবাহ এনেছিল বাংলা গানের ধারায়। শাক্ত ধারার শ্রেষ্ঠ রূপকার রামপ্রসাদ সেন। কাজী নজরুল ইসলাম এই ধারার সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ও সফল সঙ্গীতকার রূপে বিবেচিত বাংলা গানের ইতিহাসে। শাক্তগীতি দুই ধারায় বিভক্ত।

ভক্তিরসাত্মক এবং আগমনী গান। একটি হচ্ছে শ্যামাসঙ্গীত অপরটি উমা বা দুর্গা বিষয়ক গান। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন রচিত শ্যামাসঙ্গীত–

(ক) কাজ কী মা সামান্য ধনে
ওকে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে।

(খ) মন রে কৃষিকাজ জানো না
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।

(গ) ওমা কারে করেছ রাজেশ্বর মা
অতুল ধনের অধিকারী
কারে করেছ পথের কাঙাল
মুষ্টিমেয় অন্নের ভিখারী।
(ঘ) আমায় দাও মা তবিলদারি
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী

রামপ্রসাদ সেনের পরবর্তী সময়ে যাঁরা শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম কমলাকান্ত, দাশরথি রায়, রসিক চন্দ্র রায়, অতুল কৃষ্ণ মিত্র, শিব চন্দ্র, শম্ভু চন্দ্র, নর চন্দ্র, নন্দকুমার রায়, রাজা রামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র নারায়ণ, শ্রীশচন্দ্র, মহাতাব চাঁদ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বিজয়চাঁদ মহাতাব, রঘুনাথ রায়। রামপ্রসাদ সেনকে অনুসরণ করেই, অনুকরণ করে আরো যাঁরা শ্যামাসঙ্গীত রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭)। দাশরথি রায়ের লেখা বিখ্যাত শ্যামা সঙ্গীত:

দোষ কারো নয় গো মা

আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।

রামপ্রসাদ সেনের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৭৭২-১৮২১) অসংখ্য শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন যা আজও ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। উদাহরণ স্বরূপ:

(ক) শ্যামা মা কি আমার কালো রে

লোকে বলে কালো কালী, আমার মনতো বলে না কালো রে

কালোরূপে দিগম্বরী হৃদিপদ্ম করে মোর আলো রে।

রামপ্রসাদ সেন রচিত একটি আগমনী গান:

গিরি! এবার উমা এলে আর উমা পাঠাব না,

বলে বলুক লোকে মন্দ কারো কথা শুনবো না।

কবিগান

বাংলা গানের প্রাচীন আরেকটি উল্লেখযোগ্য ধারার নাম হচ্ছে কবিগান। কবিগান সে কাল থেকে আজও পর্যন্ত মানুষ খুব আগ্রহ নিয়ে শ্রবণ করে। সঙ্গীতের এ ধারার উৎপত্তি হয়েছিল শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া অঞ্চল থেকে, কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত এই এলাকাকে কেন্দ্র করে আঠারো উনিশ শতকের দিকে। উৎপত্তি সম্পর্কে কবিগানের বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। শান্তিপুরকে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিগানের জন্মভূমি বলে উল্লেখ করেছেন। 'হাফ আখড়াই সংগীত সংগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থে গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য মহাশয় কবিগানের প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে- "১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে স্বর্ণ নদীর তীরে অবস্থিত ভাটকলাগাছি গ্রামে, রথযাত্রার দিন দুই দল গায়ক প্রথম গানের লড়াই শুরু করেন। প্রথম দলে ছিলেন হরিদাস ঠাকুর, স্বরূপ দাস ও সনাতন দাস। এর মধ্যে হরিদাস ঠাকুর ছিলেন মূল গায়ক এবং বাকি দুজন দোহার। দ্বিতীয় দলে ছিলেন নিত্যানন্দ কোঠী (মূল গায়ক), গোবিন্দ কোঠী ও মাধব কোঠী (দোহার)। হরিদাস ঠাকুর ফুলিয়া গ্রামে এসে, স্থানীয় ব্যক্তি গদাধর মুখুটির সাহায্যে মুখুটি বংশের প্রায় সকল যুবক ও বৃদ্ধদের দলবদ্ধ করে সঙ্গীতজ্ঞ বিষ্ণুরাম বাগচীকে শান্তিপুরে আনেন। তাঁর নির্দেশ মতো শান্তিপুর ও ফুলিয়ায় একটি করে সঙ্গীত শিক্ষার আখড়া তৈরী হয়। হরিদাস ঠাকুর ও বিষ্ণুরাম বাগচী হলেন দুটি আখড়ার দুইজন আচার্য। এইভাবে ফুলিয়া ও শান্তিপুরের পাড়ায়-পাড়ায় মহাসমারোহে আখড়াই সঙ্গীত শুরু হলো। কালক্রমে এই আখড়াই সঙ্গীত স্বভাবকবিগণের জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে

লাগল এবং ক্রমশ আখড়াই গান কবির লড়াইয়ে পরিণত হল।"[১৮] একাধিক শতাব্দী জুড়ে কবিগানের এবং কবিয়ালদের বিস্তার ঘটেছিল বটে, কিন্তু বিশেষকরে পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পর থেকে ঈশ্বরগুপ্তের (১৮৫৯) মৃত্যুর বৎসর পর্যন্ত কবিয়ালদের প্রচার- প্রসার, সর্বোপরি প্রতিষ্ঠা ব্যাপকভাবে বেড়ে উঠেছিল। "কবিগানের উৎপত্তি সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস বলেন: বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত তরজা, পাঁচালী, খেউর, আখড়াই, হাফ আখড়াই, দাঁড়া কবিগান, বসা-কবিগান, ঢপ্ কীর্তন, টপ্পা, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি বিচিত্র নানা বস্তুর সংমিশ্রণে কবিগান জন্মলাভ করে।"[১৯] কবিয়ালরা নিজেরা অশিক্ষিত থাকলেও বেদ পুরাণ থেকে শুরু করে ধর্মীয় গ্রন্থ, সমাজ, দেশকাল সম্পর্কে স্বশিক্ষিত। সাধারণ জনমানুষের মনোরঞ্জনের জন্য কবিগান তৈরি হতো সে সময়। কবিগানের কোনো লিখিতরূপ পাওয়া যায়নি কারণ সভাস্থলে উপস্থিত চাপান ও উত্তর রচনা করতে হতো কবিয়ালদের।

কবিয়ালদেরও খুব তীক্ষ্ণ হতে হয়েছিল কয়েকটি বিষয়ের উপর সেগুলি হচ্ছে, যুক্তিজাল রচনা করা, সরস রাগবিস্তার, প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হওয়া, নিজের বক্তব্যের প্রতিষ্ঠার ওপরে লক্ষ্য রাখা ইত্যাদি। কবির আসরে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কবির সুরে ও তালের মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত মতে পদ্যরচনা করে সুরে সুরে বাক-বিতণ্ডা করতে হয়। আসরে বাদ্যযন্ত্রগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় কবিদের বাকবিতণ্ডার ওঠানামার উপরে। বিতর্কের উত্তেজনা যদি বাড়ে, কাশি, মন্দিরা, ঢোল, হারমোনিয়াম প্রভৃতির আওয়াজেও লয়ের তারতম্য ঘটতে থাকে। কবিগান প্রসঙ্গে মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী বাংলা গানের ধারা গ্রন্থে ঈশ্বরগুপ্তের একটি লেখা উল্লেখ করেছেন– "মোটামুটি অষ্টাদশ শতকের আরম্ভে গোঁজলা গুঁই নামক এক কবিয়ালা পেশাদারী দল গঠন করে স্বচ্ছল ধনাঢ্য গৃহে গান করতেন। তাঁরই শিষ্য পরম্পরায় হলেন রঘুনাথ, লালু ,নন্দলাল, নিতাই বৈরাগী, রাসু, নৃসিসংহ, হরু ঠাকুর, ভোলাময়রা, রাম বসু প্রভৃতি। এছাড়া কেষ্টামুচি ও এ্যন্থোনি ফিরিঙ্গী ছিলেন বিখ্যাত কবিয়াল। এর মধ্যে রাম বসু ছিলেন যথার্থ রসিক প্রকৃতির কবি। কবিয়াল রাম বসুকে তো ঈশ্বরগুপ্ত বলেছেন 'কবিয়ালদের কালিদাস'। রাম বসুর গান শিক্ষিত বাঙালি সমাজে সমাদৃত হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রাম বসুর গান গাইতেন । প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'মনে রইল সই মনের কথা'– রাম বসুর রচিত এই গানটি ভেঙে রবীন্দ্রনাাথ রচনা করেন 'মনে রয়ে গেল মনের কথা'।"[২০]

কবিয়ালদের মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরাসহ বাংলা ভাষাভাষী বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন প্রয়াত কবিয়াল বিজয় সরকার। বর্তমানকালে কবিগানে বিখ্যাত রয়েছেন কবি অসীম সরকার। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত একটি কবিগান নিম্নরূপ–

"চিতান। বঞ্চিতা করে আমায় কালাচাঁদ জুড়ায় চন্দ্রাবলীর মন
পরচিতান। প্রভাতে আমায় ছলিতে এলেন কুঞ্জে মদনমোহন
ফুকাা। দেখে রঙ্গ ত্রিভঙ্গেরি অঙ্গ দহিছে দুখে করেছি এই পণ
আর কালবরণ নাহি হেরিব চক্ষে।"[২১]

যাত্রাগান ও বাউলগান

কবিগান পরবর্তী বাংলা গানের ধারায় যাত্রাগান ও বাউলগান অন্যতম গীতরীতি। এক বিশেষ রূপে সমবেত হয়ে দেবতাদের মাহাত্ম্যমূলক নৃত্য, গীত ও নাট্য একসাথে পরিবেশন করাকে যাত্রা বলা হয়। যাত্রার আরও অর্থ রয়েছে সেটি হচ্ছে পূজা-পার্বন ও বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এক ধরনের শোভাযাত্রা। আমাদের দেশে ষোড়শ শতাব্দীতে যাত্রা উদ্ভাবন হয়েছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যাত্রাগানের সঙ্গে রচয়িতা হিসেবে যাঁদের নাম আজও উল্লেখযোগ্য গোবিন্দ অধিকারী, মদন মাস্টার, মদন মোহন বসু, মোহিতলাল রায়, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, লোচন অধিকারী, ব্রজমোহন রায়, মধুসূদন কিন্নর, ভারতচন্দ্র, কৃষ্ণ কমল গোস্বামী, গোপাল উড়ে, মধুসূদন কিন্নর প্রমুখ। বাউল শব্দটি নিস্পন্ন হয়েছে 'বায়ু' শব্দের সাথে 'ল' প্রত্যয় যোগে। ইষ্টের জন্য ব্যাকুল এই অর্থে অনেকে মনে করেন যে, ব্যাকুল থেকে বাউল নাম এসেছে। সংস্কৃতে আবার 'বাতুল' শব্দের অর্থ-উন্মাদ।

একটি বিশিষ্ট ভাবকে আশ্রয় করে সামাজিক রীতিনীতিমুক্ত, ভাবোন্মাদ বা ধর্মোন্মাদ সাধকগণ বাউল নামে পরিচিত। বাউল মতের প্রবর্তক আউল চাঁদ ও মাধব বিবি। এ গানকে জনপ্রিয় করে তোলেন মাধব বিবির শিষ্য নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র। ধারণা করা হয় ১৭ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই বাউল মতের উন্মেষ ঘটেছে এবং বাউলগানের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়েছে ১৯ শতকে লালন ফকিরের (১৭৭৪-১৮৯০) সাধনা ও সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে। বাউলগানের ধারায় লালন ফকির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক। এর আগে সবথেকে জনপ্রিয় হয়েছিল কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের (১৮৩৩-১৮৯৬) গান। যিনি ফিকিরচাঁদ নামে মানুষের কাছে সমধিক পরিচিত পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে বাউলগানকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন যেসব সঙ্গীতকার তাঁদের মধ্যে রাধারমন দত্ত, পাগলাকানাই, হাসনরাজা, শাহনুর, দুদ্দুশা প্রমুখ সাধকদের নাম উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক পর্বের বাংলা টপ্পা

আধুনিক বাংলা কাব্যসঙ্গীতের প্রথম প্রেরণাদায়ী গান বাংলা টপ্পা। বাংলা গানের ইতিহাসে যে গানের নাম স্বর্ণখচিত হয়ে থাকবে সে বাংলা টপ্পা গান। বাংলা ভাষায় টপ্পা গানের প্রাণপুরুষ বা প্রথম রচয়িতা রামনিধি গুপ্ত। নিধুবাবু নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন শ্রোতা মহলে। আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে বাংলা টপ্পার উদ্ভব। টপ্পা হিন্দি শব্দ, যার আদি অর্থ লম্ফ। টপ্পার প্রবর্তক গোলাম নবী বা শোরি মিয়া (১৭৪২-১৭৯২) এবং বাংলা টপ্পার প্রবর্তক রামনিধি গুপ্ত বা নিধু বাবু (১৭৪১-১৮২৫)। টপ্পার সূচনাকারী হিসেবে ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছেন গোলাম নবী। পাঞ্জাবের ঝাঙ্গ জেলায় গায়ক গোলাম নবীর জন্ম। যাঁর ডাক নাম ছিল শোরি মিয়া। শোরি মিয়া ছিলেন বিখ্যাত খেয়াল গায়ক গোলাম রসুলের পুত্র। রাগসঙ্গীতের প্রধান চারটি ধারা ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরি। ধ্রুপদ, খেয়াল থেকে টপ্পা অপেক্ষাকৃত একটু বেশি সংক্ষেপতর। ঠুমরির মতো টপ্পার প্রচলন শুরু হয় হিন্দুস্তানি সঙ্গীতের বিখ্যাত পূণ্যভূমি লখনৌয়ে। টপ্পার উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে নানা ইতিহাস প্রচলিত থাকলেও পাঞ্জাবের উট চালকদের মধ্যে প্রচলিত গান থেকেই টপ্পা গানের উদ্ভব ধারণা করা হয়। সে সময় উট চালকরা জীবিকার প্রয়োজনে পাঞ্জাব থেকে লখনৌয়ে আসতেন। উটের পিঠে করে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আসার সময় চালকেরা গলায় কম্পন দিয়ে এক ধরনের বিশেষ ভঙ্গিতে গান গাইতেন। পরবর্তীতে এ বিশেষ ধরনের কারুকাজ সম্বলিত গান টপ্পা নামে বিকাশলাভ করে। বাংলা গানে আধুনিক সুর ও বাণী যাঁর হাতে প্রচলন হয়েছে, সেই রামনিধি গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায় ত্রিবেণীর কাছে চাঁপতা গ্রামে মাতুলালয়ে ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে। পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। মামার নাম রমজান কবিরাজ। ইংরেজি ফারসিসহ বেশকয়েকটি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন রামনিধি গুপ্ত। কলকাতায় যেসব শিক্ষিত বাঙালি ভালো ইংরেজি জানতেন প্রথমদিকে, তাঁর মধ্যে রামনিধি গুপ্ত অন্যতম। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে কালেক্টরেটে কেরানির চাকরি নিয়ে নিধুবাবু কলকাতা থেকে বিহারের ছাপরা অঞ্চলে চলে যান এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন। প্রায় ১৮ বছর বসবাস করেন সেখানে। বিহারের ছাপরা তখন বেশকয়েকজন হিন্দুস্তানি কলাবত বসবাস শুরু করেন এবং নিধুবাবু তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করেন। ছাপরা জেলার রতনপুরা গ্রামের ভিখন রামস্বামীর মন্ত্রশিষ্যত্ব গ্রহন করেন নিধুবাবু। নিধুবাবু কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে রাগ সঙ্গীতের তালিম গ্রহণ করতে শুরু করেন। "ছাপরায় নিধুবাবু এক মুসলমান ওস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গসংগীত শিখেছিলেন। তিনি হিন্দুস্তানি সংগীতে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। একসময় তিনি দেখলেন যে, ওস্তাদ তাঁকে ঘরানার রহস্য জানাচ্ছেন না। তখন তিনি মিঞা সাহেবকে সেলাম করিয়া কহিলেন, আমি তোমার দিগের জাতীয় যাবনিক গীত আর গান করিব

না, আপনিই বঙ্গভাষায় হিন্দি গীতের অনুবাদ পূর্বক রাগ রাগিনী সংযুক্ত করিয়া গান করিব। তিনি মুসলমান গায়ক থেকে বিদায় দিয়ে, নিজেই বাংলা গান রচনা করতে লাগলেন।"[২২]

বিহারে নিধুবাবু টপ্পার তালিম গ্রহণ করেন। টপ্পা বিষয়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণের সৃষ্টি হয় এবং নিজের মাতৃভাষা বাংলায় এই টপ্পা রচনার বাসনা তৈরী হয় রামনিধি গুপ্তের মনে। বিহারে বসে সঙ্গীতচর্চাকলীন রামনিধি গুপ্তের মনে বাংলা গীত রচনা করার বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে এবং সেই সময় থেকেই লেখালেখির প্রস্তুতি নিতে থাকেন নিধুবাবু। তারই প্রমাণস্বরূপ তিনি একটি গান লিখেছিলেন বাংলায়। এ গানটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মাতৃভাষা প্রীতিগীতি।

কামোদ- খাম্বাজ

জলদ তেতলা

নানান দেশের নানান ভাষা

বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা।

কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর

ধরাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা।

৫৩ বছর বয়সে ১৭৯৪ সালে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন নিধুবাবু। তখন তিনি বেশ সুপরিচিত টপ্পার গায়ক রূপে। সঙ্গীত মহলে তখনও রামপ্রসাদ সেনের শাক্তগীতির প্রবল জোয়ার। কলকাতায় ফিরে এসে নিধুবাবু শোভাবাজারে একটি আটচালা ঘরে প্রতিদিন রাতে গানের আসর বসাতেন। এই ঘরে প্রতিরাতে নিধুবাবুর গানের আসর বসত এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ নিধুবাবুর টপ্পা শুনতে আসত। এ আসরেই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা টপ্পার প্রচলন শুরু করলেন। বাগবাজারের রশিকচাঁদ গোস্বামী মহাশয়ের বাড়িতে পরবর্তীতে এই ঘরোয়া গানের আসরের আয়োজন হতো। এমন অসংখ্য গানের আসরের মধ্য থেকে একদিন সঙ্গীতকার, গায়ক রামনিধি গুপ্তের গান হয়ে যায় নিধুবাবুর গান বা নিধুবাবুর টপ্পা। "গোলাম নবীর প্রেমের গান তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করল। স্থায়ী, অন্তরায় দুই তুকে নিবন্ধ ছোট ছোট গানে তিনি নর-নারীর ভালোবাসাকে অজস্রভাবে বর্ণনা করে চললেন। প্রায় ৬০০ টপ্পা রচনা করেছিলেন নিধুবাবু তার মধ্যে একটি রয়েছে ব্রহ্মসঙ্গীত।... নিধুবাবুর টপ্পার বিষয়বস্তুর ব্যাপারটি সে গানের সুরগৌরবের মতোই অতি উজ্জ্বল, তাকে উজ্জ্বলতর বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাসে সে এক মহাঘটনা যে, নিধুবাবুর টপ্পা গানের বিষয়বস্তু ছিল নর নারীর ভালোবাসা। নিধুবাবুর টপ্পা গান দিয়েই বাংলা গানের মানবিকতার দিগন্ত উন্মোচিত হলো। সেই সঙ্গে আধুনিকতারও। রামনিধি গুপ্তই প্রথম সকলপ্রকার দৈবিকতা ও আধ্যাত্মিকতামুক্ত গীতরচনার

আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। সাধনসংগীতের পর্যায় থেকে তিনি বাংলা গানকে নর-নারীর ভালোবাসার গানে পর্যবসিত করেছিলেন।... রামনিধি গুপ্তের টপ্পায়ই প্রথম মানুষের স্বাবলম্বী প্রেমানুভূতি উচ্ছলিত হয়ে উঠেছিল। তিনিই প্রথম নর-নারীর ভালোবাসাকে রূপকের অবলম্বনমুক্ত করে যথার্থ জাগতিক ভালোবাসা রূপে প্রতিফলিত করেন।... এই মানবকেন্দ্রী মানসিকতার সংক্রমণ দ্বারাই নিধুবাবু বাংলা কাব্য সংগীতের ইতিহাসে আধুনিক যুগের প্রবর্তন ঘটিয়েছিলেন। দৈবিকতা থেকে মানবিকতায় উত্তরণই আধুনিক যুগ সূচনার প্রধান স্তম্ভ। এই যুগবৈশিষ্ট্যে দুটি লক্ষণ ধরা পড়ে এর একটি হচ্ছে সম্প্রদায় নিরপেক্ষ সার্বজনীন হৃদয়াবেগের প্রতিষ্ঠা ও অপরটি হচ্ছে রোমান্টিক চেতনার উদ্ভাসন। দুটি লক্ষণই প্রকটিত হয়েছে নিধুবাবুর ক্ষুদ্রবন্ধ টপ্পা গানে। বাংলা কাব্যসংগীতের ধারায় তিনি প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ সার্বজনীন হৃদয় সংগীতের প্রতিষ্ঠা করেন এবং রোমান্টিকতার আভাসও তাঁর রচনায়ই প্রথম মূর্ত হয়ে ওঠে। টপ্পায় ধর্মনিরপেক্ষ আত্মভাবনা প্রকাশে নিধুবাবুর দান সম্পর্কে অরুণ কুমার বসু বলেছেন: "টপ্পাকেই আধুনিক কাব্যসঙ্গীতের যথার্থ সূচনার গৌরব দান করা যায়।' উনিশ শতক অতিক্রম করে আধুনিককাল পর্যন্ত এই টপ্পা সঙ্গীত বাংলা কাব্যগীতিকে অধিকার করে আছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বযুগে যাঁরা গান রচনা করতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিধুবাবু ব্যক্তিচেতনাকে সর্বাধিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। বাংলা গীতিকবিতায় রোমান্টিক চিন্তার প্রধান প্রেরণা এসেছিল তাঁরই কাছ থেকে।... ক্ষুদ্রায়তন বাক্যবন্ধে হৃদয়ের গভীর বেদনা ও প্রেমানুরাগ প্রকাশের এই ভঙ্গিটি অচিরকালের মধ্যেই আশাতিত জনপ্রিয়তা লাভ করল। নিধুবাবুর অনুপ্রেরণা এবং অনুসরণে বাংলা ভাষায় প্রেমভাবনা হৃদয়বেদনা, মর্মোৎসারিত ভালোবাসার উপলব্ধি, সৌন্দর্যবোধ, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আত্মস্বাতন্ত্র ঘোষণা প্রভৃতি ব্যাপারগুলি এত অনায়াস হয়ে উঠেছে যে উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে শুধু প্রেমের গানের সংখ্যা কয়েক সহস্রে পরিণত হয়েছে। কেবল সংগীত সংকলনের সংখ্যাও প্রায় পঁচিশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।"[২৩]

শোরি মিয়ার কয়েকটি টপ্পা নিম্নরূপ

(ক) বেদরদী যার বেশির প্যারা ব্যাঁ নবী আঁধার দাদা শুধু বলা।

(খ) ও মিয়া বে জানেওয়ালে (তানু) আল্লা কি কসম কিরিয়া নয়নুওয়ালে।

রামনিধি গুপ্ত রচিত কয়েকটি টপ্পা গান

(ক) কী আছে তোমার মনে জানিব তাহা কেমনে
ভালবাসো তাই আসি, দেখা নয়নে নয়নে।

(খ) লুকিয়ে ভালোবাসব তারে জানতে দিব না
জানলে পরে প্রাণ নিবে সে প্রাণ তো দিবে না।

(গ) পলকের তরে আঁখি তোমারে দেখিতে চায়
সব সাধ মিটিয়াছে, প্রণয়ের হতাশায়।
(ঘ) আমি কি কখনো
তোমারে না দেখে থাকিতে পারি
বিনা দরশনে প্রাণ শূন্য দেহ, শূন্য প্রাণ
(ঙ) তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহি মণ্ডলে
আকাশের পূর্ণশশী, সেও কাঁদে কলঙ্ক ছলে।
(চ) অনুগতজনে কেন কর এত প্রবঞ্চনা
তুমি মারিলে মারিতে পারো
তবে রাখিতে কে করে মানা।

রামনিধি গুপ্ত ছাড়াও বাংলা গানের ধারায় টপ্পা রচনায় যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কালী মির্জা (১৭৫০-১৮২০), শ্রীধর কথক (১৮২৮- অজানা), মহেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫০-১৯০০), রামকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২১-২০০৯) প্রমুখ। এ পর্বে ধ্রুপদের ছায়া অবলম্বনে রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত ব্রাহ্ম ধর্মের উপাসনার অঙ্গ হিসেবে গীত হতে থাকে। ব্রহ্মসঙ্গীত ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গানের একটি উল্লেখযোগ্য এবং বিশিষ্ট ধারার নাম। নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনা করা হয় এ সংগীতের মাধ্যমে। ব্রিটিশ শাসনামল ও বঙ্গভঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে জনচিত্ত প্রণয় নির্ভর নিধুবাবুর টপ্পাগান থেকে সরে এসে অনেকটা উপাসনা সঙ্গীতকে আশ্রয় করল। এ ধারার অন্যতম সঙ্গীত রচয়িতা রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।

আধুনিক পর্বের এই ব্রহ্মসঙ্গীতকে উপলক্ষ করেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে সর্বপ্রথম সঙ্গীতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেন। ফলশ্রুতিতে সঙ্গীত বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পঠন পাঠন আরম্ভ হয়। "যখনই বাংলার সমাজব্যবস্থায় পুরনো শাস্ত্র নির্দিষ্ট ধর্মের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে একটি নতুন মানবতান্ত্রিক ধর্মান্দোলন দেখা দেয়, ধর্মের মধ্যে উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতা আত্মপ্রকাশ করে, প্রথাগত অনুদার সংকীর্ণ ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক প্রথাচারদ্রোহী জনজাগরণ ঘটে, তখনই তার সঙ্গে গড়ে ওঠে একটি সংগীতের ঐতিহ্য। চৈতন্যদেবের মানবতান্ত্রিক ধর্মান্দোলনের পরিণামেই কীর্তনের সৃষ্টি। ঠিক এমনিভাবেই মধ্যযুগের

অবসান পর্বে সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে শাস্ত্রবিরোধী লোকধর্মের হাত থেকে আমরা গ্রহণ করেছি বাউলগান। আঠারো শতকে নতুন করে মাধুর্যপ্রধান পৌরুষ অপমানকর বৈষ্ণব ধর্মের বিরুদ্ধে শক্তি ও ধর্মসাধনার আন্দোলন রূপায়িত হয়েছে শ্যামা সংগীতে। আর উনিশ শতকের হিন্দু ধর্মের সংস্কারসাধনকল্পে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তন করলেন তার সাধনার অঙ্গ হিসেবে ব্রহ্মসংগীত হলো সংযুক্ত। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম (বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠার পর আশ্রমিক উৎসব-অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ সংগীতকে যুক্ত করে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার আসনে এর পরিপূর্ণ রূপদান করলেন। সংগীত যে অন্যতম শিক্ষার বিষয় সে কথা রবীন্দ্রনাথই প্রথম উপলব্ধি করলেন। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী সংগীত ভবনে এই সংগীত বিভাগ প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে তার বাস্তব রূপায়ন ঘটে।"[২৪] ক্রমেই ব্রহ্মসঙ্গীত ম্লান হয়ে স্বদেশসঙ্গীতের ব্যাপকতা বাড়তে থাকল। পরাধীনতাবোধ বাংলা স্বদেশী গানের প্রধান উৎস বাঙালির। চর্যাপদ থেকে রামপ্রসাদের শাক্তগীতি পর্যন্ত প্রায় ৭০০ বছর এই স্বদেশ সঙ্গীত অনুপস্থিত ছিল বাংলা গানে। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় দেশব্রতী নবগোপাল মিত্রের, হিন্দুমেলা নামক একটি স্বদেশী মেলাকে কেন্দ্র করে প্রথম দেশাত্মবোধক গান রচনা শুরু হয়েছিল। স্বদেশ (তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশকে) মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করে স্বদেশেরই তরে গান রচনা সেই প্রথম। হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৬৮খ্রি.) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রথম দেশের গান–'মিলে সব ভারত সন্তান একতান মন প্রাণ গাও ভারতের যশ গান'। এ গানটি প্রথম জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গাওয়া হয় হিন্দুমেলার ২য় অধিবেশনে। দেশাত্মবোধক গান রচনাকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

প্রথম পর্যায়–

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের চৈত্র সংক্রান্তির দিনে বেলগাছিয়ার হিন্দুমেলা নামক স্বাদেশিক মেলাকে ঘিরে একটি পর্যায়,

দ্বিতীয় পর্যায়–

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালীন এবং

তৃতীয় পর্যায়–

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পরবর্তী সময়। বঙ্গভঙ্গ চলাকালীন 'রাখি বন্ধন' উৎসবকে কেন্দ্র করে স্বদেশী যুগে বিপুল প্রাণচাঞ্চল্যের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আমাদের কবিগুরু **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** লিখলেন–

বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল

পূণ্য হউক পূণ্য হউক পূর্ণ হউক হে ভগবান

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখলেন

বঙ্গ আমার জননী আমার

ধাত্রী আমার আমার দেশ,

রজনীকান্ত সেন লিখলেন

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই,

দ্বীন দুখিনী মা যে মোদের এর বেশি আর সাধ্য নাই।

অতুলপ্রসাদ সেন লিখলেন

বল বল বল সবে

শত বীণা বেনু রবে

ভারত আবার জগত সভায়

শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় ২৩টি দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছিলেন এবং এ গানগুলোতে সুর যোজনা করেছেন বাউল ঢঙের। দেশাত্মবোধক গান রচনার ইতিহাস বিশ্লেষণে জানা যায়, সমকালীন সকল গীতরচয়িতারা দেশাত্মবোধক গান রচনা থেকে ক্রমে দূরে চলে যেতে বসলেন এবং সে কারণেই স্বদেশ সঙ্গীতে দেখা দিল এক গভীর শূন্যতা। এই ধারার গীতবৃক্ষে পুষ্প-পল্লবে পরিপূর্ণ রূপ দিতে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার নিমিত্তে, গানের বান এনেছিলেন নজরুল তাঁর সুর দরিয়ায়। অগ্নিবীণার ঝংকারে ফোটা, অবিনাশী গান নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম এলেন বাংলা গানের ভুবনে। পরাধীনতার দ্বার খুলতে তিনি লিখেছিলেন শিকল ভাঙ্গার গান–

(ক) কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট, রক্ত-জমাট শিকল পূজার পাষাণ-বেদী

(খ) এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল

(গ) দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার

দেশাত্মবোধক গান রচনার তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী সময়। বংলা গানের এ পর্যায়ে স্বদেশী সঙ্গীত রচয়িতাগনের বিভিন্ন কারণে গান রচনা থেকে বিরত থাকায় শূন্যতার সৃষ্টি হয় দেশাত্মবোধক গানে। "স্বদেশি সঙ্গীতের মুখ্য রচয়িতাদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ১৯০৭ সালে, রজনীকান্ত সেন ১৯১০ সালে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯১৩ সালে পরলোক গমন করেন। অতুলপ্রসাদ সেন স্বদেশী সংগীত রচনার ধারা ত্যাগ করে

ভিন্নতর সংগীত সৃজনে নিয়োজিত, স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান সঙ্গীত রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশাত্মবোধক গান রচনার ধারা ত্যাগ করেছেন। দেশাত্মবোধক গীতরচনায় তিনি আর প্রেরণা বোধ করছেন না তেমন।... এই পটভূমিতে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শেষ দিক থেকে বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ধারা যখন ক্ষীয়মান হয়ে আসছিল, বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছিল, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু তাঁদের অসীম সাহসী আত্মদানের মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক রক্তাপ্লুত অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন, গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল, তখনই বাংলা স্বদেশী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। স্বদেশসংগীত রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রস্থান, অতুল প্রসাদের ভিন্নতর সংগীতধারা অবলম্বন, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মৃত্যু প্রভৃতি কারণে বাংলা দেশাত্মবোধক সংগীত রচনার ক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল ও পূর্বরচিত গানের অনুবৃত্তি চলছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল ইসলামের আবির্ভাব এক ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে। তিনি বহু সংখ্যক ও বহুমুখী সংগীত রচনা দ্বারা সেই শূন্যস্থান শুধু পূরণই করেননি, বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ধারায় তিনি এক নবযুগের সূচনা করেছিলেন। সুরের উন্মাদনায় ও ছন্দের ঝংকারে বীররসের এমন গভীর শক্তিকে তিনি বাংলা গানে সঞ্চারিত করলেন যে, তাঁর গান বিপুলভাবে অভিনন্দিত হল।... অগ্নিযুগের যুগবিদ্রোহ বিচ্ছুরিত হয়েছিল তাঁর সঙ্গীত রচনায়। সুরে ও বাণীতে বাংলা উদ্দীপনাগীতি বীররসকে কী পরিমাণ ধারণ করতে পারে তা নজরুলের গান না শুনলে বোঝা যায় না।... কিন্তু নজরুল ইসলামের অত্যুজ্জ্বল অবির্ভাবে তাদের সকলের প্রভা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। গানের ভিতর দিয়ে বীররসের প্রবল বিচ্ছুরণই ছিল নজরুলের দেশাত্মবোধক সংগীত রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের অনুকূল বাণীবদ্ধ সংগঠন ও সুর রচনায় তাঁর অপার ক্ষমতা ছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, যুব জাগরণ, নারী জাগরণ, হিন্দু–মুসলিম ঐক্য প্রভৃতি প্রচলিত বিষয়ও তাঁর গানে নতুনভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। মুসলিম জাগরণ, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার অকুলতার মতো নতুন বিষয়কেও তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে সকল স্বদেশ সংগীত প্রয়াসে নজরুলের দেশাত্মবোধক গীতরচনার ধারা প্রেরণার উৎস হিসেবে গৃহীত হয়েছে।"[২৫] এরপরে আবার ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জনজাগরণ তৈরি হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে পরিপূর্ণ বিজয় অর্জন করল বাঙালি জাতি। সূচনা হলো স্বাধীন সার্বভৌম এক ভূখণ্ডের, সোনার বাংলাদেশের।

অগণিত আত্মত্যাগ, ছেলেহারা মায়ের কান্না, ভাইহারা বোনের অশ্রুজল, সব মিলে মিশে ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতার লাল সূর্যোদয় ঘটেছিল যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত। ১৯৫২ সালের ভাষা শহীদদের স্মৃতি নিয়ে তৈরি হলো, মহান একুশের গান। অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী সাড়ে সাত কোটি

বাঙালিকে উজ্জীবিত করার জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি.এল রায়, কাজী নজরুল ইসলামসহ নতুন গীতিকার ও সুরকারদের গান গাইতেন বেতার কেন্দ্র থেকে। গানে প্রাণ ফিরে পেত, উজ্জীবিত হতো পরাধীন জাতি। যেমন–

(ক) ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি

(খ) একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী জননী

(গ) ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা

(ঘ) ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা

বাংলা গান চলতে লাগল আপন গতিতে। দেশী সঙ্গীতের আদর্শে পরিচালিত হতে থাকল। অর্থাৎ কথা ও সুরের সমন্বয়ে সৃষ্ট গীতরূপভঙ্গি যা দেশী সংগীতের আদর্শ। পাশ্চাত্য সংগীতের প্রসার এবং রাগসঙ্গীতচর্চার মধ্য দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গানে নতুন সুরের সমাবেশ আরম্ভ হলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ সঙ্গীতকারের নব নব সৃষ্টিশৈলীর মাধ্যমে কাব্যমাধুর্য এবং সুনিপুণ সুরবৈচিত্র্যে বাংলা গান পরিপূর্ণতা লাভ করল এবং এই পঞ্চগীতিকবিদের রচিত অগণিত শ্রুতি সুখকর ও কালজয়ী গানের মধ্য দিয়েই বাংলা গানের আধুনিক ধারার সূত্রপাত শুরু হয়েছে। এ পর্যায়ে পঞ্চকবিদের রচিত কয়েকটি আধুনিক গান উল্লেখ করছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি গোধূলি লগনে এই বাদল গগনে
তার চরণধ্বনি আমি হৃদয়ে গনি সে আসিবে আমার মন বলে
সারাবেলা অকারণ পুলকে আঁখি ভাসে জলে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ভেসে আসে
কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে
আয় চলে আয়
ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে।

রজনীকান্ত সেন

আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু
কম করে মোরে দাওনি
যা দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া
কেড়েও তো কিছু নাওনি।

অতুলপ্রসাদ সেন

একা মোর গানের তরী
ভাসিয়েছিলাম নয়নজলে
সহসা কে এলে গো
এ তরী বাইবে বলে।

কাজী নজরুল ইসলাম

মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী
দেব খোঁায় তারার ফুল
কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির চৈতী চাঁদের দুল।

আধুনিক বাংলা গান

যে গানে অচ্ছেদ্য ও অনিবার্যভাবে মানুষের জীবনানুভূতি যুক্ত হয়েছে, মানবিক প্রেম যে গানের সৃষ্টির প্রেরণায় সম্বল, দীপ্যমান উজ্জ্বলতায় যে গানের উপমা সন্নিবেশিত, জীবনের বিরহ-বেদনায়, কিংবা আনন্দ-উন্মাদনায়, বিরহী চিত্তের বেদনাবোধ ও সুখময়স্মৃতি যে গানের রচয়িতাকে গান রচনায় প্রাণিত করেছে তাই আধুনিক গান। বাংলা গানের বিশিষ্ট ধরনের একপ্রকার গীতধারার নাম আধুনিক গান। বিশ শতকের ত্রিশের দশকের শুরুতেই সূচিত হয়েছিল শ্রোতানন্দিত এ ধারার। আধুনিক গান কোনো সুনির্দিষ্ট কালকে নির্দেশ করে না কখনো। রাজনীতি, জীবনের প্রয়োজন, রচয়িতার মনের ভাবনা রূপায়ণের নতুন কৌশলের জন্য, শিল্পে কোনো কোনো সময়ে আধুনিকতার প্রতিফলন ঘটে। যে কোনো শিল্পের প্রবহমান সমসাময়িক ভাবধারা, গতি-প্রকৃতি, সমাজবাস্তবতা

তাকে আধুনিক করে তোলে। আধুনিক গান বর্তমান সময়ে সবথেকে জনপ্রিয় এবং হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীতরূপে বিবেচিত।

গানের বাণী ও সুরের কাব্যিক মূল্যকে অক্ষুণ্ন রেখে, মনোমোহিনী সুরে মূলভাব এবং রসকে মূর্ত করে তোলাই আধুনিক গানের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। বাংলা গানের রূপায়নকল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম নিয়ে আসেন প্রবল ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত আধুনিকতার ধরণ। বাংলা গানের আধুনিক পর্বের উৎসপুরুষ রূপেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিবেচনা করা হয়। বাংলা গানের আধুনিকতার পথে বহু বাণীকার ও সুরকারের মৌলিক পদচিহ্ন অঙ্কিত। নজরুলের প্রাণের রঙে সবুজ মহিমায় রেঙে উঠেছে আধুনিক গান। বিচার বিস্ময়ের ঊর্ধ্বে নজরুলের গান। সে গান বাঙালিকে তাঁদের ক্ষীণকণ্ঠে তেজ দিয়েছে, অমৃতধারা সিঞ্চন করেছে বাঙালি শ্রোতার মুর্চ্ছাতুর প্রাণে। মানুষের ব্যথায় বিষে নীল হয়ে আবেশ বিহ্বলতাযুক্ত অনাগত ভবিষ্যতের যে গান নজরুল গেয়েছেন, সে গানে বাঙালির পূর্ণ জীবনের স্বপ্নাভাস বিরাজমান। অনির্বচনীয় সৃজনপারদর্শিতা ও নববৈভবে ঋদ্ধ করেছেন নজরুল আধুনিক ধারার গানকে।

গান বাঙালির প্রাণ। বাঙালির প্রাণ আছে তাই গানও আছে। পৃথিবীর আর কোনো জাতিই তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এভাবে গানকে আত্মীকৃত করে নিতে পারেনি। সুখে-দুঃখে, কর্মে-অবসরে, সঙ্গে-নিঃসঙ্গে, সংকটে-উৎসবে, আধ্যাত্মিকতায়-নাস্তিকতায়, শান্তিতে-সংকটে প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতি মুহূর্তেই তার প্রয়োজন গান। বাঙালির অন্য বৈশিষ্ট্য বা পরিচয় আর যাই থাকুক তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় হলো বাঙালি গানপ্রেমী। সেই সঙ্গে রয়েছে তার অতুল ঐশ্বর্য, বাংলা গানের অফুরন্ত ভাণ্ডার। আধুনিক গান বাংলা গানের জনপ্রিয় একটি ধারা। বাংলা গানের আধুনিককাল যা রবীন্দ্রনাথের হাতে রূপ পরিগ্রহ করেছে। নজরুলের হাতে পূর্ণতা পেয়ে, পরিণত এবং শিখরস্পর্শী হয়েছে আধুনিক গান। মোটকথা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী সঙ্গীতকার নজরুলের সুরে ও বাণীতে যে আধুনিক গান প্রাণ পেল, ভাব পেল, আধুনিক রূপও পেল সেই গান, বাংলা গানের ভুবনে বর্তমান প্রেক্ষাপটে কী অবস্থানে বিরাজমান রয়েছে, তা নিরূপণ করা এ গবেষণার মূল লক্ষ্য।

বৈচিত্র্যধারী সুরস্রষ্টা নজরুল গীতরচনায় বহুরূপী ছিলেন। টপ্পা, খেয়াল, ঠুমরি, গজল, ইসলামি গান, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন গানের সঙ্গে আধুনিক পর্যায়ের প্রেমনির্ভর কাব্যপ্রধান গান লিখেছেন অনায়াসে। তাঁর সে জীবন ও কর্ম ছিল নব নব সৃজনের মহোৎসব। নজরুলের সৃষ্ট সেসব আধুনিক গান সমসাময়িক সকল গীতরচয়িতা ও কবিদের অন্তঃপুরে সৌন্দর্যানুভূতির রেখাপাত করেছিল। এ ধারা নজরুল পরবর্তী বাংলা গানে অপরিসীম প্রভাব ফেলেছে। দেশ ও জাতির দুঃসহ ক্রান্তিলগ্নে বিধাতার আশীর্বাদ হিসাবে, বিস্ময়কর ও মহিমান্বিত এক অবিনাশী

প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। তাঁর প্রতিভার ছোঁয়ায় এবং প্রদর্শিত পথ ধরেই আত্মশক্তিতে পূর্ণ হয়ে জেগে ওঠে পরাধীন জাতি, এগিয়ে যায় স্বাধীন ও মানবিক সমাজ নির্মাণের দিকে। আমাদের সাহস, সৌন্দর্য ও শৈল্পিক অহংকারের মহোত্তম অনুপ্রেরণাও নজরুলের। বাংলা গানকে তিনি দিয়ে গেছেন মুক্তির অপার ও অসীম আনন্দ। তিনি তাঁর অবিস্মরণীয় প্রতিভার স্পর্শে বাংলা গানে যোগ করেছেন নতুন ক্ষেত্র। সে গীতধারা নতুন এবং তুলনাহীন। সাঙ্গীতিক বিবেচনায় নজরুলের যে গান খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরি, দাদরা বা গজল প্রভৃতি কোনো নির্দিষ্ট রূপবন্ধের অন্তর্গত নয় তাই আধুনিক গান। নজরুলের আধুনিক গানের সর্বপ্রধান বিষয়বস্তু প্রেম। বাংলা কাব্য সঙ্গীতের ধারায় প্রেমসঙ্গীতকে কেন্দ্র করেই আধুনিক সঙ্গীতকলার প্রতিষ্ঠা। তা ঐতিহাসিকভাবে নিধুবাবুর বেলায় যেমন সত্য, ত্রিশের দশকের নিরিখে নজরুলের বেলায়ও সত্য।

নানা রকম বৈচিত্র্য ও শৈলী সমেত বাংলা গান বাঙালির কাছে চিত্তবিনোদনের জন্য অদ্যাবধি উৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন কথা আর সুর মিশিয়ে রচিত। "বাঙালি কবির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি চিরদিনই ফুটে উঠেছে তাঁর গানে। বাংলাদেশের মাটি গানের অশ্রান্ত জোয়ারে আজও উর্বর। গঙ্গার ভাটার মধ্যেও যে স্রোত আবিল হয়নি, যুক্তিতর্ক বিজ্ঞানের দাপটে শুকিয়ে যায়নি। শুধু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, শশিশেখর, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ ভক্ত গীতিকাররাই নন হাজার হাজার আউল বাউল সারি ভাটিয়ালি কথকতাবর্গীয় ভক্তিসংগীত আমাদের মনের আকাশে বাতাসে নিরন্তর চলাফেরা করে আসছে যার ফলে একটু উর্ধ্ব দৃষ্টি হতে না হতে আকাশের সত্যও আমাদের মনের কানে কানে কথা কয়, আর অমনি শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি ভক্ত কবির মন গান গেয়ে ওঠে। ... কাজির ছিল এই শ্রেণির মন- স্বভাবপ্রবুদ্ধ কবিপ্রাণ, সহজ বিশ্বাসী অন্তর ও সর্বোপরি অসামান্য প্রতিভা যার আহ্বানে দিগন্তে অসীমের শুভ্রালোকের সঙ্গে মর্তের অসীম আঁধারের মিলনবাণী তার মনে জন্ম নিত অনন্যতন্ত্র ছন্দ ভাষার কল্পলোক। ... এমন শক্তি স্পন্দিত গান বাংলা ভাষায় বিরল তাই আরো দুঃখ হয় ভাবতে যে কাজি তার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের দীপ্ত লগ্নেই নীরব হলেন কর্মফলে-- যার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া দুরূহ।"[২৬] পূর্বেকার অপেক্ষাকৃত গণ্ডীবদ্ধ বাংলাগান বিপুল সংখ্যক শ্রোতাদের হৃদয়ে প্রসারিত হয়ে, গানের সীমানার গণ্ডীমুক্তি ঘটে। "আধুনিক প্রবণতার একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল বাংলা কাব্যসঙ্গীতের সীমানা সম্প্রসারণ। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল- অতুল প্রসাদের হাতে বাংলা গান বহুলাংশে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সে ছিল বিদগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর গণ্ডী। কিন্তু নজরুলের রচনায় বাংলা গানের গণ্ডীমুক্তি ঘটে। বিপুলসংখ্যক শ্রোতার হৃদয়ে প্রসারিত হয় এ গানের সীমানা। চুম্বকের মতো তাঁর গান সকল হৃদয়কে টানে। ত্রিশের দশকে সৃষ্ট আধুনিকতার এই ছিল মৌল প্রেরণা। নজরুলের প্রেমের গানে এই প্রেরণারই উচ্ছল প্রকাশ ঘটে।"[২৭]

আধুনিক বাংলা গানের অগ্রগতির একটা গৌরবদীপ্ত ইতিহাস আছে। ডি.এল রায়ের গানে পৌরুষদীপ্ততা ও দেশাত্মবোধ, রজনীকান্ত সেনের গানে ভক্তিভাব ও আত্মদীনতার আর্তি, অতুলপ্রসাদ সেনের গানে আত্মবেদনার সন্তাপে প্রেমময় লেখনি এবং সর্বোপরি কাজী নজরুল ইসলামের পরিমিত সামর্থ্যপূর্ণ সঙ্গীত আর প্রবল প্রাণসঞ্চারী

গান, বাংলা গানে নতুন ভাবলাবণ্য সংযোজন করেছে। সাধনবেদী থেকে উৎসব প্রাঙ্গণ, দেশবন্দনা থেকে আত্মজাগৃতির সন্ধান, সভামঞ্চ থেকে বাঙালির হৃদয় অনুভবের একান্ত বিনিময়ে, সর্বত্রই এঁদের গান কণ্ঠে তুলে নিলো বাঙালি। পরবর্তীতে বহু পদাতিক, পঞ্চকবির পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ পথেই হেঁটেছেন। গানের উপমায় আধুনিক শব্দের ব্যবহার নজরুলের আরও যথার্থ অবদান বলে বিবেচিত। গানের সৌন্দর্য, নান্দনিকতা পূর্ণরূপে প্রকাশে বাংলা আধুনিক গানে চাঁদ, ফুলমালা, সাগর, তারা, ফুলডোর, অনল, সমাধি, সমীরণের অনুষঙ্গ কাজী নজরুল ইসলামেরই হাত ধরে এসেছে। মূলত বাংলা গান নজরুল পর্বে এসে, একটা নতুন দিকে মোড় নিলো। গান আলাদা একটি শিল্প হিসেবে উপস্থাপিত হলো। তার কারণ একটি গানে তখন একজন গীতিকার, একজন সুরকার, একজন গায়ক অথবা গায়িকা আলাদাভাবে মেধা মনন নিয়ে অংশগ্রহণ করার পরে তবেই, একটি সম্মিলিত প্রয়াস মিশ্রিত পরিপূর্ণ গান তৈরি হয়েছে। যা এর আগে অনুপস্থিত ছিল বাংলা গানে। এখানে স্রষ্টা এককভাবে কোনো গান সৃষ্টির দাবিদার হতে পারে না। গানের যে কর্তৃত্ব রবীন্দ্রযুগে প্রকট ছিল তা নজরুল পরবর্তী আধুনিক বাংলা গানে মুক্তিলাভ করল। এর পরিণামে আমরা পেয়েছি হাজার রকমের মনোমুগ্ধ আধুনিক গান। কাজী নজরুল ইসলামের সমকালীন ঘনিষ্ঠদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দিলীপ কুমার রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, সলিল চৌধুরী, অনল চট্টোপাধ্যায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সুবিনয় রায় প্রমুখ। তখনকার আধুনিক বাংলা গানে এক ধরনের কথা ও সুরের সৃজনসুষমা লক্ষণীয় এবং তা স্বস্তিদায়ক ছিল। প্রতিভাবান সেসময়কার সুরকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হিমাংশু দত্ত, রাইচাঁদ বড়াল, দিলীপ কুমার রায়, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, অনুপম ঘটক, নিতাই ঘটক, চিত্ত রায়, সুরেশ চক্রবর্তী প্রমুখ। গায়কদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, কানন দেবী, কে এল সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, শচীন দেব বর্মন, উমা বসু, সন্তোষ সেনগুপ্ত প্রমুখ। প্রতিভাবান গীতিকারদের মধ্যে ছিল অজয় ভট্টাচার্য, সুবোধ পুরকায়স্থ, অনিল বাগচী, প্রণব রায়, শৈলেন রায়, হীরেন বসু, সজনীকান্ত দাস, পবিত্র মিত্র, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার প্রমুখ। নজরুল পরবর্তী সেসব গানের আধুনিক বাংলা গানের মূল অনুষঙ্গ ছিল- চাঁদ, সমাধি, বালুচর, বাসর, প্রিয়া, ফুলডোর। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মান্না দে, প্রণব রায়, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, অজয় ভট্টার্চর্য, কমল দাশগুপ্ত, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পবিত্র মিত্র, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন নজরুলের অনুজ। কিন্তু সমকালে তাঁদের গান জনপ্রিয় ছিল দারুণভাবে। বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে আধুনিক বাংলা গানের বিকাশের কাল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৫০ সালের দিকে বাংলা গান সবথেকে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সভা-সমিতি, গ্রামোফোন রেকর্ড, বেতার, চলচ্চিত্র, মঞ্চসহ সর্বত্র। আধুনিক বাংলা গানের এমন বিপুল জনপ্রিয়তার অন্তরালে গায়ক-গায়িকা, গীতিকার-সুরকার, সকলের ভূমিকা ছিল সীমাহীন।

তথ্যনির্দেশ

১. ম ন মুস্তাফা, *আমাদের সঙ্গীত ইতিহাসের আলোকে*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৮১; পৃষ্ঠা ২

২. ম ন মুস্তাফা, *আমাদের সঙ্গীত ইতিহাসের আলোকে*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ৩

৩. গোপিকা রঞ্জন চক্রবর্তী, *ভবা পাগলার জীবন ও গান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৯৫; পৃষ্ঠা ১১৯

৪. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *নজরুল রচনাবলী-অষ্টম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ২৭ শে আগস্ট ২০০৮; পৃষ্ঠা ২৮

৫. রবীদ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১১; পৃষ্ঠা ৭০, ৭১

৬. ডা বিমল রায়, *সংগীতি শব্দকোষ দ্বিতীয় খণ্ড*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, কলিকাতা, অক্টোবর ১৯১৬; পৃষ্ঠা ৫৭

৭. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্যাপিরাস, ঢাকা, আগস্ট ২০০৫; পৃষ্ঠা ১৩

৮. ম ন মুস্তাফা, *আমাদের সঙ্গীত ইতিহাসের আলোকে*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৮১; পৃষ্ঠা ২০৭, ২০৮

৯. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্যাপিরাস, ঢাকা, আগস্ট ২০০৫, পৃষ্ঠা ১৭

১০. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ২১

১১. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৯৩; পৃষ্ঠা ১

১২. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্যাপিরাস, ঢাকা, আগস্ট ২০০৫; পৃষ্ঠা ২২

১৩. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ২৩, ২৪

১৪. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ৪৫

১৫. করুণাময় গোস্বামী, *সঙ্গীতকোষ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন২০০৪; পৃষ্ঠা ৭২৬

১৬. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্যাপিরাস, ঢাকা, আগস্ট ২০০৫; পৃষ্ঠা ৪৫

১৭. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১; পৃষ্ঠা ৯৫

১৮. প্রবীর সেনগুপ্ত, *বাংলার গান বাংলা গান*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ৮ আগস্ট ২০০৬; পৃষ্ঠা ২৪

১৯. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্যাপিরাস, ঢাকা, আগস্ট ২০০৫; পৃষ্ঠা ৫৪

২০. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ৫৫

২১. প্রবীর সেনগুপ্ত, *বাংলার গান বাংলা গান*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ৮ আগস্ট ২০০৬; পৃষ্ঠা ২৭

২২. রমাকান্ত চক্রবর্তী, *নিধুবাবু ও তাঁর টপ্পা*, পুনশ্চ, কলকাতা, বইমেলা ২০০১; পৃষ্ঠা ১৮

২৩. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১; পৃষ্ঠা ১১৭, ১২২, ১২৩, ১২৪

২৪. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্যাপিরাস, ঢাকা, আগস্ট ২০০৫; পৃষ্ঠা ৬৪

২৫. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১; পৃষ্ঠা ২৮৯, ২৯০

২৬. সুধীর কুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত *বাংলা গান অদীন ভুবন, দিলীপ কুমার রায়: সাধক নজরুল*, কারিগর, কলকাতা, আগস্ট ২০১১; পৃষ্ঠা ২৫৩, ২৫৪

২৭. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত *নজরুল সমীক্ষণ, করুণাময় গোস্বামী: কাজী নজরুল ইসলামের আধুনিক গান*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, মে ২০০০; পৃষ্ঠা ৫১৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নজরুলের আধুনিক গানঃ গীতিকার ও সুরকার প্রসঙ্গ

নজরুলের আধুনিক গান অনুধাবনে পৃথকভাবে তাঁর গীতিকার ও সুরকারসত্তা সম্পর্কে দীর্ঘ বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক। গানের ভেতর দিয়েই বাঙালির সৃজনশীলতার বিপুল বিকাশ ঘটেছে। হাজার বছরের পথপরিক্রমায় বাংলা গান নানাভাবে পরিপূর্ণতা পেয়েছে বিকশিত হয়েছে। দেশী সঙ্গীতের ধারায় এই আপন বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বৈভবে কথা ও সুরের যুগল মিলনে ঋদ্ধ হয়েছে বাংলা গান। কথা ও সুরের সমগুরুত্বে আজও সে গান সম্মুখপানে ধাবমান। সৃজনের বহুমুখিতার নিরিখে নজরুলের বাংলা গানে অধিষ্ঠান অতি অসামান্য। সুরে ও বাণীর ছোঁয়ায় সঙ্গীতের অজস্র ধারায় অসীম বেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল নজরুলের প্রতিভা। সুর ও বাণীর মিলিত সুসমন্বয়ে নজরুলের সকল অনুভূতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর আধুনিক গানে। যখন একটি পরিপূর্ণ গানের রচয়িতা একজন কবি ছিলেন ঠিক তখনই বাংলা আধুনিক গানে গীতিকার ও সুরকার নামে দুই ভিন্ন নির্মাতার আবির্ভাব ঘটিয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম। অপরিমেয় সঙ্গীতসামর্থ্য নিয়ে আধুনিক বাংলা গানে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন নজরুল। আবেগতপ্ত বাণী আর গুঞ্জরিত সুরে সে গান বিপুলভাবে জনাদরসিদ্ধ হয়েছিল। আধুনিক গান নামক গীতধারার প্রতিষ্ঠায় প্রধান প্রেরণা কাজী নজরুল ইসলামের রচনা থেকেই বাংলা গানে এসেছে। আধুনিক ধারার গানের প্রধান প্রবণতা ছিল জনরুচির নিমিত্তে জননন্দন ও জনবোধ্য সঙ্গীত রচনা। তাই আধুনিক বাংলা গান নামে খ্যাত সঙ্গীতধারার প্রতিষ্ঠায় নজরুলের অবদান ভীষণভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুর ও সঙ্গীতকে পরম চিরপবিত্র হিসেবে অভিহিত করেছেন নজরুল। সুর রসলোকের অমৃত সুধাসম। জীবনের গহীনে প্রবেশ করে সুর হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটায়। সুর যাঁদের কণ্ঠবাহিত হয়ে, আশ্রয় করে ধ্বনিত হয়েছে এ পৃথিবীতে তাঁরা সৃষ্টিকর্তার বিশেষ আশীষধন্য। অমূল্য সুরসম্পদ সৃষ্টিকর্তা সবাইকে দান করেন না। বিশ্বচরাচরে সুরই একমাত্র বিদ্যা যা, পরমপিতার অনুগ্রহ ব্যতীত কারো কণ্ঠে আসে না। গান রচনা, সুর রচনার গুণকে নজরুল পৃথিবীর বুকে তাই মহৎকর্ম বলেই জেনেছেন। সুরকে অবলম্বন করে নিবিড় আরাধনায়, একাগ্র সাধনায় অনন্তলোকের পথের সন্ধান পাওয়া যায়। সুরের পথ ধরেই যুগে যুগে মুক্তি পেয়েছে মানবাত্মা। আল্লাহর রহমত হিসেবে পৃথিবীতে সুরের আগমন প্রসঙ্গে ‘ওস্তাদ জমির উদ্দিন খাঁ’ প্রতিভাষণে নজরুল বলেছেন– “আমি শুধু বলতে চাই যে বেহেশতের পাখি যখন গান করে তখন পৃথিবীর ধুলো থেকে সে ঊর্ধ্বে উঠে যায়। ফকির দরবেশ যখন সেজদা করে, তখন তাঁর মন মাটি থেকে ঊর্ধ্বে উঠে যায়। এই সুরের পথ ধরেই মানুষ মুক্তিপথ পেয়েছে। হজরত ইসমাইলের পায়ের দাগে মরুভূমির বুক চিরে পানি উঠেছিল। সেই পানি মানুষের জন্য, পবিত্র জমজমের

পানি হয়ে আত্মার শান্তিদান করে। সুরের আঘাতেও মনের পানি উথলায়। সুর কখনও খারাপ হয় না। খারাপ মানের পাত্রে পানি রাখলে সে পানি হয়তো দূষিত হয়, কিন্তু তাই বলে পানিকে দোষ দেওয়া যায় না। পানি মানুষের তৃষ্ণা মিটায়, মানুষের জীবন বাঁচায়; আবার বন্যা হয়ে মানুষের ধ্বংসও আনয়ন করে; তাই বলে পানিকে তো আমরা খারাপ বলতে পারিনে। সুরের সঙ্গে ফুলের তুলনা করা যেতে পারে। ফুল দিয়ে কোথাও কোথাও পূজা হয়। সেই ফুল নগরবিলাসিনীদের কণ্ঠেও শোভা পায়। তাই বলে ফুল খারাপ, একথা বলা যায় কি? শরিয়ত হয়তো খারাপ দিকটাকেই খারাপ বলতে পারে। কিন্তু সুর কখনো খারাপ নয়। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, মানুষের মারফতে দুনিয়ার বুকে আল্লার রহম নেমে আসে। সুরও আল্লার রহম-রূপে দুনিয়ায় নাজেল হয়েছে। কিন্তু সব মানুষের মুখ দিয়ে তো সুরের রহমত বের হয় না। যাঁদের মুখ দিয়ে সুর বেরোয় তাঁদের উপর আল্লার রহম আছে।"[১]

প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা আধুনিক গানকে অনন্য সঙ্গীত হিসেবে শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন নজরুল। কাব্যগীতি দ্যুতিময় উদ্ভাস ঘটে আধুনিক গানের এ ধারায়। বাংলা আধুনিক গানের ধারাটিকে নজরুল তাঁর বৈচিত্র্যয় অবদান ও বিপুল সৃজনসুষমায় ভরে রেখেছিলেন। নজরুল তাঁর প্রবর্তিত নবসঙ্গীতধারা সংযোজন করে এবং প্রবর্তিত ধারায় নবপ্রাণ সঞ্চার করে আধুনিক গান তথা বাংলা গানের যে সমৃদ্ধিসাধন করেছেন বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসে তা এক অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় অধ্যায়। নিধুবাবু যে নতুন মানবকেন্দ্রী সঙ্গীতের সূচনা করেছিলেন তাঁর পূর্ণ ও সফল পরিণতি হয়েছে নজরুলের হাতে। মহান সঙ্গীতকার কাজী নজরুল ইসলামের চিরস্মরণীয় আধুনিক গান সুরলোকের বিচিত্র সুরে ভরা। তাঁর আধুনিক গান শ্রোতাদের সুরের আকাশকে ভরে দিয়েছে শ্রাবণের বর্ষণমুখর সন্ধ্যার বিষণ্নতায়, আবার কখনো শরতের নির্মেঘ নীলে। অন্তরের তিয়াসা মিটিয়েছে নজরুলের শান্তিময় প্রাণবায়ুসম অমৃত বাণী ও সুর। শ্রোতাদের চিরদিনের পছন্দের গানে পরিণত হয়েছে তাঁর অসংখ্য গান। বাঙালির হৃদয়ভাবের সরল ও স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটেছে তাঁর আধুনিক গানে।

বাংলা গানের ভুবনে 'আধুনিক গান' জননন্দিত ও সুপ্রসিদ্ধ একটি গীতধারা। বিশিষ্ট এ ধারা বর্তমানে সমধিক বিখ্যাত ও জনপ্রিয়। বাংলা সঙ্গীতের এই আধুনিক যুগপর্যায় উন্মোচিত হয়েছিল, এখন থেকে বহু বছর পূর্বে, অষ্টাদশ শতকে রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯) বা নিধুবাবুর মাধ্যমে। বাংলা গানে আধুনিক যুগের সূত্রপাতকারী হিসেবে রামনিধি গুপ্তকে আজও স্মরণ করা হয় সসম্মানে। দৈব ও ধর্মনিরপেক্ষ এক ধরনের প্রেমসঙ্গীত রচনার মধ্য দিয়েই এ যুগের সূচনা করেছিলেন রামনিধি গুপ্ত। তাঁর রচিত ও সুরারোপিত সেই সঙ্গীতকে বলা হতো 'নিধুবাবুর টপ্পা গান'। সকল ধরনের রূপক প্রতীক বিবর্জিত সার্বজনীন এক ধরনের মানবিক

প্রণয় সঙ্গীত রচনার ভেতর দিয়ে বাংলা গান তথা গীতিকবিতার ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠা করলেন নিধুবাবু। বিশ শতকের ত্রিশের দশকের শুরুতেই কাজী নজরুল ইসলামের মাধ্যমে আধুনিক গানের প্রকাশ ও বিকাশ ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে বাংলা গানে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি.এল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেনসহ বাংলা গানে বহু সঙ্গীতরচয়িতার হাত ধরে আধুনিক গানের সমৃদ্ধিসাধন হয়েছে। আধুনিক বাংলা গানের এ পর্যন্ত সর্বোত্তম এবং সফলতম বিকাশ ঘটেছে, নজরুলের হাতে ধরে। শ্রুতিসুখকর সুরে আর মনোমুগ্ধকর বাণীর গীতসুধা রসে বাঙালি শ্রোতাদের ব্যাকুল করেছে নজরুলের আধুনিক ধারার গান। সাধারণ মানুষের স্বপ্ন অনুভবে, জাগতিক প্রেমের নিগূঢ় ও প্রত্যক্ষ স্পর্শে, কথা ও সুরের অপরূপ সমন্বয়ে নজরুল আধুনিক ধারার গান রচনা করেছেন। ভাষায়-সুরে ও ভাবে সুরুচিসম্পন্ন আধুনিক গান, সব শেষ পূর্ণতা পেয়েছে নজরুলের হাতে। শ্রোতাদের চাহিদা ও মনোরঞ্জনের কথা বিবেচনা করে, গানের বাজার মূল্য সম্পর্কে ভেবে, বাংলা গানে নজরুলেরই প্রথম গান রচনা করা। পরবর্তীতে এ ধারায় অনেক গীতরচয়িতা ও সুরকাররা এসেছেন কিন্তু নজরুলের আধুনিক গানই সর্বাপেক্ষা বেশি আধুনিক।

নজরুলের আধুনিক গানের নামকরণ

বিকাশের ধারাবাহিকতায় সমাজ ও দেশের হরেক রকম বাস্তবতায় নজরুল সঙ্গীত তথা নজরুলের আধুনিক গান; নানান ধরনের নাম ধারণ করেছে। যেমন: ভাবগীতি, কাব্যগীতি, আধুনিক গান, বাংলা গান, কাজী সাহেবের গান, নজরুল গীতি প্রভৃতি। সাবলীলতায়, শ্রুতি সুখকরতায়, বৈচিত্র্যে ও বিপুলতায় রচিত– আধুনিক গান শ্রোতাদের অন্তরসঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। প্রতিনিধিত্বশীলভাবে আধুনিক গানের উন্মেষ ও গীতিময়কাল তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। অতুলনীয় জীবনবৈচিত্র্যের সৃষ্টিসম্ভার সমৃদ্ধ সঙ্গীতকার হিসেবে নজরুল বাংলা গানে সুবিদিত। অসামান্য জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন নজরুল তাঁর সঙ্গীত সৃজনের অপরিমেয় পারদর্শিতার জন্য। নজরুল বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজসচেতন কবি। বাংলা সঙ্গীত রচনায় অযুত ভাবনা ও ভাবধারা প্রণয়নের বিরল দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। প্রেমের গান রচনায় নজরুল অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছেন। প্রেমের আকুতিতে ভাবের গভীরতায়, চিন্তার ব্যাপ্তিতে এবং সর্বোপরি শব্দচয়নে আধুনিক গানের কথা ও সুর অনবদ্য। পাওয়া না পাওয়া, আশা- হতাশা নর-নারীর মনের এমন সংশয় নজরুলের আধুনিক ধারার গানে জীবন্ত হয়ে ধরা পড়েছে সুরের অনুরণনে। বাঙালির জীবনে নজরুলের গান যে প্রাসঙ্গিকতা, গভীরমূল্য, যে বৈচিত্র্য, বিপুলতা তৈরি করেছিল তা সত্যিই দৃষ্টান্ত হয়ে আছে ইতিহাস জুড়ে। সেই সাঙ্গীতিক সুখস্মৃতি এখনো চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধতায় বাঙালি

শ্রোতার মন ভরিয়ে দেয়। মূলত প্রেমই আধুনিক গানের সর্বপ্রধান বিষয়। তাই বাংলা গানকে নিবিড় অন্তর্মুখী গানের প্রভাববলয় থেকে থেকে জনচিত্তমুখী করে তুলতে ব্রতী হয়েছিলেন নজরুল। নজরুল আধুনিক গানের বাণীর ভাবরূপায়ণে, তালাঘাত ও ছন্দ যোজনায়, সুর রচনায় পরিমিত মাত্রায় আধুনিক ছিলেন বলেই বাঙালি শ্রোতাদের শ্রেষ্ঠত্বের জয়মাল্য লাভ করেছেন।

প্রত্যেকটি যুগের সমকালীন ভাবধারাসম্পন্ন রচনাকে সে সময়কার আধুনিক রচনা হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে, কিন্তু গানের ক্ষেত্রে বিষয়টি ব্যতিক্রম। 'আধুনিক গান' বিশেষ অর্থে আধুনিক, সাধারণ অর্থ প্রযোজ্য নয় তাতে। বস্তু নির্বাচন এবং সঙ্গীতরীতির ভিত্তিতে আধুনিক গান শব্দটি একটি নাম। সমসাময়িক কালে রচিত বলে সে যে আধুনিক, তা নয়। এ গান হলো আধুনিক নামক একটি বিশিষ্ট সঙ্গীতরীতির নাম, এ যুগেই সৃষ্টি হয়েছে যে গানের। আধুনিক গানকে কোনো কোনো গবেষক 'কাব্যগীতি' নামে অভিহিত করেন। কাব্যে যে গীতির লক্ষণ বিদ্যমান থাকে অথবা যে গীতিতে কাব্য রয়েছে তাই মূলত কাব্যগীতি। 'কাব্যগীতি' ও 'আধুনিক গান' প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ করুণাময় গোস্বামী তাঁর 'নজরুল গীতি প্রসঙ্গ' গ্রন্থে লিখেছেন– "নজরুলগীতি অখণ্ড সংকলন গ্রন্থে আব্দুল আজীজ আল আমান নজরুলের প্রধানত আধুনিক শ্রেণীর গীতরচনাকে কাব্যগীতি শিরোনামে মুদ্রিত করেছেন। এখানে কাব্যগীতি শিরোনামটি ভুল, কেননা, কাব্যগীতি বললে যে গীতরূপ বোঝায় তা শুধু নজরুলের আধুনিক শ্রেণীর রচনায় সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতপক্ষে নজরুলের সকল শ্রেণীর গীতরচনাই কাব্যগীতি। তথাপি আল আমানের সংকলনে এই শিরোনামে নজরুলের আধুনিক শ্রেণীর গানসমূহ পাওয়া গেল। নজরুলের আধুনিক শ্রেণির গান সংখ্যায় বিপুল। নজরুলগীতি অখণ্ড এর দ্বিতীয় সংস্করণে কাব্যগীতি শিরোনামে ৭৮১ টি গান পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে নজরুলের আধুনিক শ্রেণীর গান সংখ্যায় আরো বেশি। তবে এখানে অন্তর্ভুক্ত সব গানই আধুনিক পদবাচ্য নয়।"[২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নজরুলের আধুনিক গানকে কাব্যগীতি হিসেবে আখ্যায়িত করা নিয়ে কোনো কোনো গবেষকের দ্বিমত রয়েছে।

'আধুনিক গান' নামের সাথে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে। আধুনিক গানের নামকরণ নিয়ে একটি মতবিরোধ প্রচলিত আছে বাংলা গানে। অনেকে মনে করেন রবীন্দ্র পরবর্তী একদল আধুনিকমনস্ক কবির লেখা কবিতাই বোধ হয় আধুনিক কবিতা, তদ্রুপ নজরুল পরবর্তী সময়ে রচিত সকল গান বোধ হয় আধুনিক গান। মূলত আধুনিক গান সংজ্ঞায়িত করার পেছনে কালের লক্ষণ মুখ্য নয়, ভাব প্রকাশের কৌশল আসল বিষয়। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদ সুধীর চক্রবর্তী তাঁর রচিত 'শত শত গীত মুখরিত' গ্রন্থে লিখেছেন– "১৯২৭ সালে কলকাতা বেতার কেন্দ্র চালু হবার পর যেসব নতুন তৈরি বাংলা গান সেখানে

পরিবেশিত হতো তার নাম ছিল 'ভাবগীতি' ও 'কাব্যগীতি'। অনেক পরে ঢাকায় যখন বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হলো তখন সেখান থেকে 'আধুনিক বাংলা গান' কথাটা প্রথম চালানো হয়। সেটাই শেষ পর্যন্ত সবাই মেনে নিয়েছেন।"[৩] 'নজরুল গীতি' বা 'নজরুল সঙ্গীত' হিসেবে নজরুলের গান প্রচারিত হবার বহু আগে থেকেই বাঙালি শ্রোতার কাছে 'আধুনিক গান' হিসেবে পৌঁছে গিয়েছিল নজরুলের গান। নজরুলের গানের এ অবস্থার পিছনে, নজরুলের অসুস্থতা, নজরুলের গানের কাণ্ডারীহীন অবস্থা অনেকাংশে দায়ী। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পরবর্তী সময় নজরুলের গান কিছুটা হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সেক্ষেত্রে কলকাতা বেতারের বেশ একটা বড় অবদান ছিল। কলকাতা বেতার কেন্দ্রে 'আধুনিক গান' হিসেবে প্রচারিত হতো নজরুলের গান। নজরুলের রচিত সুরারোপিত গানকে 'নজরুল গীতি' করার ক্ষেত্রে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের বিশেষ অবদান ছিল। ঢাকা বেতারের দু'জন কর্মী- নাজির আহমেদ ও শামসুল হুদা চৌধুরীর প্রচেষ্টায় তখনকার সময়ে 'নজরুল গীতি' নামে নজরুলের গানের ঘোষণা প্রচার হতো। এ ক্ষেত্রে তাঁদর অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য। সন্তোষ সেনগুপ্ত, কমল দাশগুপ্ত, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ফিরোজা বেগমের সহায়তায় কলকাতাকেন্দ্রিক নজরুলের গান পুনরায় বহুভাবে উজ্জীবিত হয় ও জনপ্রিয়তা পায়। এ প্রসঙ্গে উপমহাদেশের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ, সুরকার, শিল্পী, বেতারকর্মী, আবদুল আহাদ তাঁর রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আসা-যাওয়ার পথের ধারে' বইয়ে উল্লেখ করেছেন– "দেশবিভাগের পর পশ্চিম বাংলা থেকে নজরুল ইসলামের গান একরকম হারিয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে কলকাতা বেতারে আধুনিক গান হিসেবে নজরুল ইসলামের গান প্রচারিত হতো, বলা হতো রচনায়- 'কাজী নজরুল ইসলাম'। নজরুল গীতির যে সম্পূর্ণ আলাদা সত্তা আছে সেটা একরকম মুছেই গিয়েছিল। এখানে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে আমরা দিনের মধ্যে কয়েকবার নজরুল ইসলামের গান প্রচার করতাম এবং ঘোষণা করা হতো–নজরুল ইসলামের গান বলে। অনেক আগে যেমন এদেশের মানুষ রবীন্দ্র সঙ্গীতকে রবিঠাকুরের গান বলত। কিছুদিন পরে তৎকালীন বেতারের কর্মী নাজির আহমেদ ও শামসুল হুদা চৌধুরী ঠিক করলেন নজরুল ইসলামের গান ভালা শোনায় না, কাজেই এর একটা ভালো নাম দিতে হবে। তারা ঠিক করলেন নজরুল ইসলামের গানকে 'নজরুল গীতি' নামে ঘোষণা করা হবে। নজরুল গীতি নামটি ঢাকা রেডিওর অবদান। ঢাকা বেতারের জন্য এটা একটা গর্বের ব্যাপার যে নজরুল ইসলামের গানকে তারা নজরুল গীতি এই সুন্দর নামে প্রচার করছে। ৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত পশ্চিম বাংলায় নজরুল ইসলামের গান একরকম মুছেই গিয়েছিল। যে কবি তিন হাজারেরও বেশি গান লিখেছেন পশ্চিম বাংলার কলকাতায় বসে, সে কবি কী করে কলকাতার গানের জগৎ থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন, ভাবতে অবাক লাগে। মনে হয় সাম্প্রদায়িক মনোভাব এর পেছনে কাজ করেছে।

সন্তোষ সেনগুপ্ত একসময়ে কাজী সাহেবের কাছ থেকে গান শিখে বেশ কয়েকটি গান রেকর্ড করেছিল এবং বেশ বিখ্যাতও হয়েছিল সে গান ও শিল্পী। যেমন- কথা কও কথা কও থাকিও না চুপ করে, তুমি শুনিতে চেও না আমার মনের কথা, তুমি আমার সকাল বেলার সুর, যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই ও যত ফুল তত ভুল প্রভৃতি। কাজী সাহেবের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। ষাটের দশকে সে যখন কোম্পানির রেকর্ডিং দেখার দায়িত্ব নিল তখন তার মনে হলো যে কাজী সাহেবের গান সারাদেশকে মাতিয়ে রেখেছিল সে গানকে হারিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। এখানকার শিল্পীদের নিয়ে নতুন করে রেকর্ড করানো হবে। সন্তোষ ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছিল। মানবেন্দ্রের বাসায় নজরুল গীতির চর্চা হতো। কারণ ওর কাকা সিদ্ধেশ্বর মুখাপোধ্যায়ের সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে সময় ফিরাজো বেগম ও কমল দাশগুপ্ত কলকাতায় ছিলেন। তাঁদের মনেও প্রশ্ন জেগেছিল এবং তাঁরাও চেয়েছিলেন নজরুল ইসলামের গান ভালো শিল্পীদের দিয়ে রেকর্ড করানো উচিত। এঁরা দুজন তখন অক্লান্ত পরিশ্রম করে নামকরা কয়েকজন আধুনিক গানের শিল্পীকে দিয়ে সন্তোষের সহযোগিতায় নজরুলগীতির একটি এলপি রেকর্ড প্রকাশ করেন। রেকর্ডটি বেরোনোর পর অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের সংগীত পিপাসুরা বলেছিলেন, এত বড় সম্পদকে আমরা কী করে ভুলে ছিলাম? কমল দাশগুপ্ত ও ফিরোজা বেগমের এই প্রচেষ্টা সকলের কাছেই প্রশংসিত হয়। নজরুল ইসলামের গান পুনর্জীবিত হলো। আমার তো মনে হয় বাঙালির কাছ থেকে এই গান আর কোনদিনই হারিয়ে যাবে না।"[৪] আধুনিক গানের উদ্ভব ও বিকাশে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র এবং ঢাকা বেতার কেন্দ্র, গ্রামোফোন কোম্পানি, সবাক চলচ্চিত্রের নাম ও অবদান চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে বাংলা গানের ইতিহাসে। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের শেষ দিকে ভিন্ন নামে, নতুন নতুন বাংলা গান 'ভাবগীতি' ও 'কাব্যগীতি' নামে প্রচারিত হতো। বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত সেই কাব্যগীতিই মূলত আধুনিক গান। দেশবিভাগ পরবর্তী পূর্ববাংলার ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে আধুনিক গান নামে প্রথম প্রচারিত হয়েছে। নজরুলের পাশাপাশি অন্যান্য যে গীতিকাররা এই ধারার গানকে অগ্রগামী করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কালী মির্জা, রঘুনাথ রায়, শ্রীধর কথক, কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, দাশরথি রায়, কমলাকান্ত, গোপাল উড়ে প্রমূখ। উদাহরণস্বরূপ শ্রীধর কথকের গান– তারে ভুলিবো কেমনে আমি প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে, গোপাল উড়ের গান–ওই দেখা যায় বাড়ি আমার চারদিকে মালঞ্চের বেড়া, নিধুবাবুর গান– আমারি মনের দুঃখ চিরদিন মনে রহিল, ফুকারি কাঁদিতে নারি বিচ্ছেদে প্রাণ দহিল, রবীন্দ্রনাথের গান– ক্ষমা করো মোরে সখি শুধায়ো না আর, ডি এল রায়ের গান– সে কেন দেখা দিলরে না দেখা ছিল যে ভালো, রজনীকান্ত সেনের গান– মধুর সে মুখখানি কখনো কি ভোলা যায়, অতুল প্রসাদ সেনের গান– বঁধু ক্ষণিকের দেখা তবু তোমারে ভুলিতে পারে না আঁখি, নজরুলের গান– দীপ নিভিয়াছে

ঝড়ে জেগে আছে মোর আঁখি। আধুনিক গান 'বাংলা গান' নামে বহু বছর পর্যন্ত অন্য রচয়িতাদের গানের মধ্যে নামবিহীন অবস্থায় ঢালাওভাবে প্রচারিত হয়েছে। কিছু মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এ গানের প্রকৃত রূপ ও যশ বৃদ্ধিলাভ করেছে।

নজরুলের আধুনিক গান রচনার পটভূমি

আধুনিক গান রচনায় যেসব কার্যকারণ ও প্রেক্ষাপট নজরুলকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে, প্রাণিত করেছে সে প্রসঙ্গ ধরেই এবারের আলোচনা। বিশেষ কোনো সঙ্গীতরীতিকে অবলম্বন করে আধুনিক গান গড়ে ওঠেনি বলে, কোনো বিশেষ সঙ্গীতধারার অন্তর্ভুক্তি আধুনিক গানে নেই। অন্যান্য সকল গানের ধারার মধ্যে, কোনো না কোনো সঙ্গীতরীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কিন্তু আধুনিক গানে তা বিরল। এই গান রচিত বাংলা কাব্যসঙ্গীতের বৈচিত্র্যময় ও বিপুল পটভূমিকে কেন্দ্র করে। নির্দিষ্ট কোনো রীতিকে আধুনিক গান অনুসরণ করে না তবে, অনুসন্ধান করলে কোনো না কোনো প্রচলিত সঙ্গীতধারার উপাদান কমবেশি এর মধ্যে পাওয়া যাবে। সকল সঙ্গীতরীতিকে অবলম্বন করে স্বাধীনভাবে প্রকাশ পাওয়াই আধুনিক গানের মূল প্রবণতা। কবিগুরুর হাতে আধুনিক গান বহুপথ অগ্রসর হলেও, বিশ শতকের ত্রিশের দশকের গোড়ায় সৃষ্ট এক ধরনের বিশেষ সাঙ্গীতিক পরিস্থিতি এই নবসঙ্গীতধারা বিকাশের মূল কারণ। তার মধ্যে প্রধান কারণ হলো: শ্রোতাদের কথা বিবেচনা করে গান রচনা। শ্রোতাদের ভালোলাগা-মন্দলাগা, পছন্দ-অপছন্দসহ, শ্রোতাদের মনোরঞ্জন প্রভৃতি বিষয়কে বিবেচনায় রেখেই আধুনিক রচনা ও সুরসৃষ্টি আরম্ভ। বাংলা গানের দীর্ঘ ইতিহাসে শ্রোতা, শ্রোতার চাহিদা, বাজার প্রভৃতি পরিস্থিতি বিবেচনা করে সঙ্গীতসৃজন এর আগে আর হয়নি কখনো। এ দশকেই প্রথম বাংলা গানের সৃজনে শ্রমবিভাজনের বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ আধুনিক গান একটি সম্মিলিত প্রয়াসে সৃষ্টি হতে লাগলো। কেউ গান রচনা করছেন, কেউ সুর সংযোজন করছেন, কেউ তার সঙ্গীত আয়োজন করছেন, আবার অন্য কেউ সুললিত কণ্ঠে সে গান শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। আধুনিক গানের এমন ব্যতিক্রম এবং যুগোপযোগী কর্মটি বাংলা গানে যাঁর হাতে শুরু হয়েছে, তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। এক্ষেত্রে কাজী নজরুলের এবং আধুনিক বাংলা গানের এই নতুন প্রয়াসকে সফল করতে তৎকালীন গ্রামোফোন কোম্পানির অবদানও স্মরণযোগ্য।

গ্রামোফোন কোম্পানির মালিকানা বিদেশি হলেও এটি মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক একটি সঙ্গীত বিষয়ক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। বাংলা গানের চাহিদা, বাজার শ্রোতার পছন্দ অপছন্দের বিষয়গুলি গীতরচয়িতাদের সামনে চলে আসে ১৯০১ সালে গ্রামোফোন কোম্পানি কলকাতায় চালু হওয়ার পর থেকেই। ব্যবসায়িকভাবে সফল হওয়ার জন্য এই গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ড উৎপাদনের প্রাথমিক ও পূর্বশর্ত ছিল বাজারের বিক্রয়। কোম্পানির আসল উদ্যোগই ছিল ভালো গান তৈরি করা, না হলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সেগুলি গ্রহণ করবে না। এক আনন্দময় কর্মযজ্ঞ শুরু হলো নবসঙ্গীত রচনার। স্বনামধন্য ও বিখ্যাত গীতিকার সুরকার শিল্পীগণ যুক্ত হতে থাকলেন গ্রামোফোন কোম্পানির সাথে এবং বাংলা গানের ভুবনে নতুন গানের সংযোজন শুরু হয়ে গেল। রেকর্ড কোম্পানির এই ব্যবসায়িক শুভ ক্ষণ শুরু হবার আগেই কাজী নজরুল ইসলাম কোম্পানির সুরভাণ্ডারী হিসেবে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করেই গ্রামোফোন কোম্পানি রেকর্ড সঙ্গীতের তথা আধুনিক বাংলা গানের আলোকোজ্জ্বল ধারা রচনা করেছিল। কলকাতা বেতার কেন্দ্র, সবাক চলচ্চিত্র ও গ্রামোফোন কোম্পানি আধুনিক গান রচয়িতা ও সুরকারদের প্রচারমাধ্যম ও অবলম্বন হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক গান সৃজনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল কলাকুশলী ও শিল্পীদের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা, উৎসাহ, উদ্দীপনা দিয়েছে এসব প্রতিষ্ঠানগুলি।

গীতিকার ও সুরকার হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম তখন খ্যাতিমান। জীবন ঘনিষ্ঠতা এবং মানুষের অনুভূতিগুলোকে উচ্ছ্বসিত করে সহানুভূতির সাথে প্রকাশ করার এক দুর্বার শক্তি নিহিত ছিল কাজী নজরুল ইসলামের লেখনীতে। আর সে কারণেই জনচিত্ত নজরুল রচিত আধুনিক গানে বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিল সে সময়। কলকাতার হরফ প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত জনাব আব্দুল আজীজ আল আমানের সম্পাদিত 'নজরুলগীতি অখণ্ড' এর দ্বিতীয় সংস্করণে কাব্যগীতি হিসেবে আখ্যায়িত নজরুলের ৭৮১ টি আধুনিক গান পাওয়া যায়।

আধুনিক গানের লক্ষণ প্রবলভাবে বোঝা যায় গানের সুর মিশ্রণে, গানের মর্মার্থে, গানের ব্যঞ্জনার মৌলিকতায় আত্মভাষণে, তালের নববিন্যাসে। কালক্রমে আধুনিক গান বিভিন্ন সময় আন্তর্জাতিক মানের শব্দধারণ ব্যবস্থাপনা বা ধ্বনিব্যবস্থা ও কৃৎ-কৌশলের কারণেও অনেকটা আধুনিক হয়েছে। এ বিষয় নিয়ে অনেকটা মতবিরোধও আছে সনাতনপন্থী ও রক্ষণশীল শ্রোতা ও গান রচয়িতাদের মধ্যে। অনেক গানের শ্রোতা কিংবা সঙ্গীতকাররাও ঐতিহ্য ভ্রষ্টতা ও বাণিজ্যবান্ধব আমদানিকৃত রুচি মানতে নারাজ। এত চড়াই-উৎরাই পেরিয়েও বাংলা গান কিন্তু তার স্বমহিমায় ধাবমান আজও পর্যন্ত বাংলা গানের রাজ্যে। আধুনিক গানের ক্ষেত্রে এমন হওয়ার পেছনে একটা কারণ ছিল বটে, সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ থেকে অতুল প্রসাদ সেন পর্যন্ত প্রেরণা ও প্রয়োজনে কোথাও বাণিজ্য সংস্কার বা আর্থিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল না। সেজন্যই হঠাৎ করেই আধুনিক গান নামক এ ধারার বিপুল পরিবর্তনগুলি

শ্রোতাদের কাছে এবং সঙ্গীত রচয়িতাদের কাছে অনেকটা ব্যতিক্রম হয়ে ওঠার মূল কারণ। শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য শুধু সমকাল নয়, অনাগত কালও। আত্মপ্রকাশ ও আত্মবোধনই শিল্পের উদ্দেশ্য।

আধুনিক গানের প্রতি বাঙালি শ্রোতাদের এমন মমতার আসল কারণ হচ্ছে- তিনটি প্রতিষ্ঠান তখন রুচি গঠনে সহায়তা করেছিল বাঙালির। তাদের মধ্যে প্রথমত কলকাতায় গ্রামোফোন কোম্পানির প্রচলন যা, ১৯০৭ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে বাঙালির রুচি গঠনে অনেকটা সহায়তা করেছে, দ্বিতীয়ত ১৯২৭ সালের কলকাতা বেতার কেন্দ্র চালু হওয়ার ঘটনা এবং তৃতীয়ত ১৯৩১ সালে নির্বাক ছায়াছবির জগৎ সবাক হওয়া। এই তিন রকম প্রচারমাধ্যমের কারণে প্রচুর সংগঠন এবং একটি ব্যতিক্রমী বাঙালি শ্রোতার দল গঠন হয়, যাঁরা সর্বদাই শুধু নতুন গান শুনতে চাইতেন এবং পেতে চাইতেন। বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানির কাছে গানের জন্য ব্যাকুলপ্রায় শ্রোতাদের মারফত নতুন গান রেকর্ডের অনুরোধও আসতে শুরু হয়। ধারণা করা হয় সেই চাহিদা থেকেই আধুনিক গানের রচনার পথ অনেকটা উন্মুক্ত হয়। নানা জনের রুচির চাহিদা মেটাতে, নানা ধরনের অর্ডারি গান তৈরির ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায় বাঙালি গীতরচয়িতা ও সুরকারদের মধ্যে। অনেক গীতিকার ও সুরকার তাঁদের সব প্রতিভা নিয়ে বাংলা গানের এ নবনির্মাণের পথে যুক্ত হয়। পেশাদারি একটি যুগের শুরু হয়ে যায় তখন থেকে। শ্রোতার দিকে তাকিয়ে গান সৃষ্টি শুরু হয়ে যায় বাংলা গানে এই প্রথম। আর কাজী নজরুল ইসলাম সাফল্যে ও নৈপুণ্যে এ ধারায় সকলের অনুসরণীয় হয়ে ওঠেন। বাংলা গানের নবনির্মাণে কাজী নজরুলের আধুনিক গান যুগের দাবি অনুযায়ী রচিত।

সুরুচিসম্পন্ন ভাবনা, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নতুন চিত্রকল্প, আধুনিকতা সম্পন্ন ভাষা, সুর, তালের সমন্বয় বিদ্যমান এ গানে। আধুনিক গানের সুর যুগের উপযোগী ছন্দে আবদ্ধ এক গীতিরূপ। কথা ও সুর শিল্পের সমন্বয়ে বাংলা গানের এক অপরূপ সম্পদে পরিণত হয়েছে আধুনিক গান। সুরের প্রাধান্যবিহীন এ গানে, কাব্যের প্রাধান্য বহুগুণে পরিলক্ষিত হয় এবং সুর আধুনিক গানের কাব্যকে রসময় ও রঞ্জিত করে। পরিমিত বাক্যবিন্যাস লক্ষণীয় নজরুলের আধুনিক গানে। নজরুলের আধুনিক গানে সময়ের গতিতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করেই আধুনিক গানের প্রারম্ভিক বলয় তৈরি হয়েছে। এ শহরে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের জোয়ার এসেছিল তখন। এই সময়ে আমাদের দেশীয় লোকজ শিল্প-সংস্কৃতির সাথে পাশ্চাত্য আধুনিক-সাহিত্য ও সংস্কৃতির মিলন পর্বের সূত্রপাত হয়। জীবনের প্রয়োজনে ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে গ্রামীণ মানুষ কলকাতা শহরমুখী হয় এবং শহরকেন্দ্রিক অনেক সঙ্গীত সভার আয়োজন আরম্ভ হয়। সঙ্গীত পরিবেশন এবং সৃজনে তখন থেকেই গ্রামীণ ও দেশি-বিদেশি প্রভাব

সংযোজিত হয়। সেই সাঙ্গীতিক জোয়ারের বহমান ধারায় যাঁদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য- তাঁদের মধ্যে অন্যতম কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। পরবর্তীতে বাংলা গানের বিবর্তনের ধারায় আমাদের পঞ্চপ্রধান কবির হাতে আধুনিক গানের নবজাগরণের পথ প্রসারিত হয়েছিল। ১৯০৭ সালে গ্রামোফোন কোম্পানি, ১৯২৭ সালে আকাশবাণী এবং একইসাথে ১৯৩১ সালে সবাক ছায়াছবি প্রবর্তনে আধুনিক গান বাঙালি শ্রোতার ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। পরিপূর্ণ ও সফল আধুনিক গানের নির্মাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের আধুনিক ধারার সুর আত্তীকরণ, গানের গল্প অনুযায়ী ভাবের সংযোজন, ছন্দে নববৈচিত্র্য সাধন, সুরের কাঠামো অনুযায়ী শিল্পী নির্বাচন অথবা কণ্ঠকে উপলক্ষ করে গানে সুরের প্রয়োগ, অভিজ্ঞতাস্বম্পন্ন গুণী যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীতায়োজনে ব্যবহার করা হয়।

শুধু বেতার, রেকর্ড, চলচ্চিত্র মাধ্যমের চাহিদা অনুযায়ী রচিত হয়েই যে বাংলা গান নজরুল এবং তাঁর সমকালীন শিল্পীদের হাতে নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে তা নয়, মূলত আগে থেকেই বাংলা গানের একটি রূপরেখা ও সর্বজন গ্রহণীয় বৈশিষ্ট্য তৈরি করে ফেলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন। পুরানো বাংলা গান, লোকগীতি এমনকি বিদেশী সুর সুষ্ঠুভাবে বাংলা গানে মিশিয়ে বাংলা গানের একটি ধারা অগ্রগামী করে রেখেছিলেন আপামর বাঙালি শ্রোতাদের শোনার জন্য। সেসব বাংলা গানে আধ্যাত্মিকতা, প্রকৃতির নিসর্গ রূপভাবনা, স্বদেশ ধন্যতাবোধ মিলেমিশে একাকার ছিল। আনন্দ, উদ্দীপনা, অনুষ্ঠান, শোক, উৎসব, উচ্ছলতা প্রভৃতি সকল আয়োজনে শ্রোতাদের আধুনিক মনের পাশে ছিল আধুনিক ধারার গান, যা আজও বিরহে, অনুরাগে, আনন্দে, উচ্ছলতায় বাঙালির পাশে রয়েছে। নূন্যতম প্রেরণায় খুবই সামান্য সময়ে গান রচনা করার অভাবনীয় সৃজনসামর্থ্য ছিল কাজী নজরুল ইসলামের। বাংলা গানে পেশাদারী জৌলুশ এনে এভাবেই নজরুল ভুবনবিখ্যাত সাড়া জাগালেন আধুনিক গান রচনায়। বিভিন্ন সময়ে বহুজনের আবদার, উপলক্ষ ও অর্থকরী আহ্বানও কাজী নজরুল ইসলামকে আধুনিক গান রচনায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। সারাজীবনে নিজের উদাসীনতায় এবং যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে নজরুলের অসংখ্য গান বিস্তৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছে। তথাপি সুর, বাণী, ভাব আর গায়নরীতিতে ব্যতিক্রম নজরুলের গান সমকালে ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়।

নজরুলের আধুনিক গানে কথা ও সুরে জীবনানুভূতি

গভীর অনুভববেদ্য অনুপম জীবনবোধের বাস্তবিক প্রকাশ চিত্রায়ন করেছেন নজরুল আধুনিক গানের বাণী ও সুরে। অবিস্মরণীয় চিত্রকল্পের দুর্লভ সমাবেশ ঘটিয়েছেন তাঁর প্রেমের গানে। এতো মনোমুগ্ধভাবে ভাষা ব্যঞ্জনায়, এতো বর্ণোচ্ছলভাবে গানের ছবি আঁকেননি সমকালীন অন্য কেউ। চিত্রকল্পের বহুল ব্যবহার নজরুলের আধুনিক গান নান্দনিক হওয়ার অন্য একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। নজরুলের রচিত বিচিত্র ধারার গানের মতো, আধুনিক গানকে প্রকাশময়তার শীর্ষে উন্নীত করার নিমিত্তে গানের ভাষার বিস্তারধর্মী ব্যবহারে, উপমার ব্যবহারে, শব্দ চয়নে, চিত্রকল্পের রূপায়ণে, সুর সংগঠনে নিজস্বতার প্রতি নজরুল ইসলাম সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রকৃতির রূপ ব্যবহার, গানের ভাষা ও চিত্রকল্পের বহুল ব্যবহারে, গানের ভাবনায়, এক অপ্রকাশ্য পরিছন্নতাবোধে নজরুলের আধুনিক গান তাই অনন্য। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর আধুনিক ধারার গানে প্রকৃতির রূপ ব্যবহার করেছেন নানাভাবে। হৃদয় দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ উপলব্ধি করে আধুনিক গানের উপমা ব্যবহার করেছেন সেই রূপেরই ঐশ্বর্য। জীবনবেলার বিরহ বর্ণনা আর মিলনবেলার আবিরের রঙে সমভাবে প্রকৃতির রূপকে ব্যবহার করেছেন নজরুল। জীবনবোধ, মানবভাবনা প্রকাশে আধুনিক গানের অনুষঙ্গ হিসেবে সুরের মূর্ছনায় প্রকৃতি মোহনীয় হয়ে উঠেছে। কবির সেই গানের প্রয়াস ও প্রকাশ তাই নান্দনিক ও আধুনিক হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- নজরুলের আধুনিক গানে জ্যোৎস্না শোভিত রাতের তন্দ্রা হারা নয়ন, দীপ নেভা ঝড়ের রাতের জেগে থাকা আঁখি, আপন কুলায় ফেরা সাঁঝের পাখি, শ্রাবণের লঘু মেঘের সাথে মন ভেসে যাওয়া, শিউলি বিছানো পথে শারদ প্রাতের পথিকের আগমন– জীবনবোধের অনুপম নান্দনিকতা তৈরি করেছে প্রেমের গানে। গানের অন্তর্নিহিত রহস্যকে নন্দনবাহিত সুরের ভাষায় অভাবনীয়ভাবে পরিস্ফুটিত করে তুলতেন নজরুল।

কাব্য মহিমায়, সুর বৈভবে, আবেগের মনোহর দুত্যিতে, গভীর অনুভূতি সম্পন্ন সুরের সমৃদ্ধিতে নজরুলের হাতে আধুনিক গানের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল বহুগুণে, ফলে বাংলা গানের ইতিহাসে তিনি খ্যাতির কুসুমাস্তীর্ণ পথেই আজও রয়েছেন। অতৃপ্তির রোদনভরা মনের একান্ত সমর্পণ সক্ষম আধুনিক ও নিষ্ঠাবান সৃষ্টিকুশল কবি নজরুল। সমকালে বিপুল পরিমাণে আধুনিকতা বিবর্জিত গানও রচয়িত হয়েছে, কিন্তু যুগ জয়ের জয়ধ্বনিতে নজরুলকে ও তাঁর আধুনিক গানকেই বরণ করেছে আপামর বাঙালি। সৃষ্টিসফলতায় তাঁর এই গান চিরন্তনতা লাভ করেছে। কারণ নজরুলের আধুনিক গানে মানুষের সামগ্রিক জীবনের ছবি অঙ্কিত। "নজরুলের আধুনিক গানে উচ্ছ্বাস বেশি। এ উচ্ছ্বাস মিলনে যেমন তীব্র, বেহিসেবী, বাঁধভাঙ্গা তেমনি বিরহেও অতিমাত্রায় বিষণ্ন-রিক্ত ও বেদনার্ত। ... নজরুলের গান জটিল নয়-সুবোধ্য। নজরুলের গান সহজ-সরলভাবে বাঙালির

জীবনকে উপস্থাপন করে। বাঙালির মানসিক অবস্থা এ সব গানে চিত্রিত। বাঙালির মানসিক তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম তাঁর আধুনিক গান। অনেক শিল্পসমালোচকই বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, নান্দনিক শিল্প মানুষ সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয় না। নজরুলের আধুনিক গান শুবার্ট কথিত মানুষের 'অন্তরের গহন স্তর থেকে সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে মৌলিক' সত্যের দলিলরূপে গণ্য হয়েছে। ... জার্মান দার্শনিক হানস্ গ্যাডমার সকল শিল্পেই প্রত্যাশা করেন 'চিরন্তনতার স্বাদ'। আসলে চিরন্তনতার স্বাদই নজরুলের গানকে নান্দনিক করেছে। নজরুলের গানে ইন্দ্রিয়নির্ভর অনুভূতি বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে জীবনচলার বিশাল অভিজ্ঞতাকে ধারণ করেছে বলে জীবনের সামগ্রিক রূপকে প্রত্যক্ষ করি। জীবনের সামগ্রিকতা শিল্পকর্মে রূপায়িত হলেই শিল্প মনোহর হয়, চিরন্তনতাকে স্পর্শ করে।"[৫]

কথা ও সুরের মেলবন্ধনে নজরুলের আধুনিক গান অনুভবাশ্রিত উচ্ছ্বাসে রসোত্তীর্ণ হয়ে নান্দনিকতাপূর্ণ হয়েছে। নজরুলের আধুনিক গান চিরকালের হৃদয়োত্থিত সুর ও বাণী। চিরকালীন অপরিতৃপ্ত ভালোবাসা ও পরজনম ভাবনা তাঁর বহু আধুনিক গানে ব্যক্ত হয়েছে। প্রিয় হৃদয়হরিণীকে অন্যলোকে, অন্যরূপে, জনম জনমে চেয়েছেন কবি। নজরুলের বিরহ-প্রেম সে কারণেই এক জনমের নয়। পরজনম সম্পর্কিত নজরুলের অসংখ্য আধুনিক গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

১. জনম জনম তব তরে কাঁদিব যতই হানিবে হেলা ততই সাধিব

২. মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে বিদায় সন্ধ্যাবেলা আমি দাঁড়ায়ে রহিনু এপারে

৩. সাধ জাগে মনে পরজীবনে তব কপোলে যেন তিল হই

৪. মোরা আর জনমে হংস মিথুন ছিলাম, ছিলাম মাটির ঘরে যুগল রূপে এসেছি গো আবার মাটির ঘরে।

"নজরুলের বিরহের গান মানুষের নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনালিপি। তাঁর প্রেম যেমন জনম জনমের তেমনি তাঁর বিরহও জনম জনমের– 'বঁধু তোমার আমার এই যে বিরহ এক জনমের নহে'। দুঃখ ক্ষোভ অভিমান হতাশা ইত্যাদি গানগুলোকে বেদনার আকর করেছে। বেদনার ধূসর প্রলেপ বিরহের গানগুলোকে অন্যান্য গান থেকে আলাদা করেছে। বিরহের এই গানগুলোর মধ্যে শ্রোতা যেন তার নিজের বেদনাকে উচ্চারিত হতে দেখে।"[৬]

কাজী নজরুল ইসলাম হৃদয়ের রঙতুলিতে আপন মনে মনোহর রূপে নারীর ছবি এঁকেছেন আধুনিক গানে। জোছনার মতো স্নিগ্ধতাভরা হৃদয়হরা প্রিয়দর্শিনীর সে রূপ। নজরুলের অনুরাগের গানে যৌবনের অনাস্বাদিত শিহরণ আর চিরকালীন উচ্ছ্বাসের প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর আধুনিক গানে নারীর প্রেমময় রূপশ্রী,

প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের রূপ নান্দনিকভাবে শোভিত হয়েছে। নারীর চিরকালীন মনোমোহিনী রূপ কবির মানস ভুবনকে রাঙিয়ে দিয়েছে। সেই অনুভূতিই ব্যক্ত করেছেন তাঁর আধুনিক গানে। লাইলী, মমতাজ, আনারকলি, নূরজাহান, শিরি প্রমুখ ইতিহাস জয়ী মহীয়সী ও ঐশ্বর্যময়ী নারীর প্রসঙ্গ আধুনিক গানে রূপায়িত করেছেন অনন্য উপমায়। প্রেমাস্পদের নিমিত্তে ব্যাকুল বেদনাবিলাসী চিত্ত, চোখে ভালোবাসার অঞ্জন মাখিয়ে প্রেমে বিভোর করে রেখেছিল কবিকে, স্মৃতির মালিকা শুকিয়ে গিয়ে কখনো জীবনে ঘনিয়ে এসেছিল গোধূলিবেলা। বিষাদিত মনে প্রতীক্ষার অধীর মনোভাব নিয়ে, অন্তরে মলিনতাছন্ন-মৌনরূপ নিয়ে কবির অপেক্ষা। বিষাদে মৃত্যুলগ্ন কবির বেদনায় ম্লান হওয়া হৃদয়রূপ, সুরের অন্তহীন সে মূর্ছনা যথার্থভাবে প্রকাশ পেয়েছে আধুনিক ধারার গানে। মনের বেদনার রূপ যেন অবারিত হয়ে উঠেছে এসব প্রেমের গানে কথা ও সুরের আবেশে। দীর্ঘবিরহের অবসানে প্রিয়ার হাতের মাল্যদানও– শিল্পনন্দিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে আধুনিক গানে। এই প্রেমময় অনুভব মনোহর রূপে বিকশিত হয়েছে তাঁর আধুনিক ধারার গানে। এভাবে জীবন অনুভূতির সঙ্গীতে পরিণত হয় নজরুলের রচিত আধুনিক গান।

অনুভূতি প্রকাশের সরলতা, বাণী ও সুরের সহজবোধ্যতাই নজরুলের আধুনিক গানকে আমাদের জীবনের এতটা ঘনিষ্ঠ করেছে। বাঙালি শ্রোতার মনমন্দিরে প্রেম শতদল, নজরুলের গানে অর্ঘ্য সাজাতে শুরু করলো ত্রিশের দশকে। কাজী নজরুলের আধুনিক গানের কথা প্রসঙ্গে বলতে গেলে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ এসে যায়। কারণ সে যুগে রবীন্দ্রনাথসহ অন্যান্য শক্তিমান গীতরচয়িতারা লিখেছিলেন যে ধারায় গান, নজরুল লিখলেন তার বিপরীত দিকের গান। রবীন্দ্রনাথের গানে প্রকাশ পেয়েছিল পরমেশ্বরের চরণ ধরার ব্যাকুলতা, পূজার ছলে ঈশ্বরকে ভুলে থাকার আর্তি প্রভৃতি। সে যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন– চরণ ধরিতে দিওগো আমারে নিও না নিও না সরায়ে, অসীম কালসাগরে ভুবন ভেসে চলেছে, ওই মহামানব আসে, মহারাজ একি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝেসহ বিভিন্ন গান। কোনো গীতরচয়িতার গানের বিষয় ছিল জীবননদীর ওপার থেকে পরমপিতার ডাক, বিধাতার কাছে নিজেকে শুদ্ধ ও নির্মল করার ভক্তিপূর্ণ অনুনয়। ডি.এল রায় লিখেছেন–ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ভেসে আসে। রজনীকান্ত সেন লিখেছেন– আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাওনি, তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে। এমন গীতসমাবেশে, এমন কথার ভিড়ে– প্রিয়ার আঁখির মতো আকাশের দুটি তারা, গভীর নিশীথে প্রিয়ার ডাকে ঘুম ভেঙে তাকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজে ফেরা, প্রিয়তমের কানে চৈতী চাঁদের দুল দোলানো, চুলে জরিন ফিতা এবং জোছনার সাথে চন্দন দিয়ে মাখানো, তাঁর প্রিয়ার গায়ে মাখিয়ে দেয়ার অভিপ্রায় নিয়ে বাংলা গানে আধুনিক ধারার প্রচলন করলেন আমাদের চিরকালীন পরম পূজনীয় সঙ্গীতস্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম। পরবর্তীতে সমকালীন অন্যান্য গীতিকাররাও নজরুলের চাঁদ, ফুলমালা,

সমাধি, বাসর, নদীসহ নানা অনুষঙ্গ অনুসরণ করে গান রচনার শুরু করলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ গানের বাণীতে বলতে চেয়েছেন– রাতের ময়ূরী ছড়ালো যে পাখা আকাশের নীল গায় তুমি কোথায় ? অন্যজন আবার বলে উঠলেন এই কি গো শেষ দান, বিরহ দিয়ে গেলে, খনিকের মালা খানি তবে কেন দিয়েছিলে আনি। অন্য একজন গীতিকার আবার হৃদয় হরিণীর কাছে জানতে চেয়েছেন যাকে জীবনে মালা দেওয়া গেল না, মরণে কেন তাকে ফুল দিতে আসা! হংস পাখা দিয়ে ক্লান্ত রাতের তীরে প্রিয়ার নামটি লিখে রেখে যাওয়ার এমন বিচিত্র কথামালায় আধুনিক বাংলা গান স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি মেলে ছিল শ্রোতাদের দিকে।

নজরুল তাঁর সমকালে ছিলেন জাগ্রত জীবনের এক অনুকরণীয় গীতকারিগর। কাজী নজরুল ইসলামের নানামুখী প্রতিভা ও পরিচয় তাঁর জনপ্রিয়তা গগনচুম্বী করেছিল। স্বদেশ সঙ্গীত রচনা, বিদ্রোহবাদী কবিতা, সাংবাদিকতা, স্বাধীনতাকামী ছাত্রজনতা, বুদ্ধিজীবী কৃষক-শ্রমিকের নানা সম্মেলনে যোগদান, গজল গান রচনা, নতুন ধারার আধুনিক গান রচনা, চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনা, গ্রামোফোন, বেতার- এ সকল কিছু মিলেই কাজী নজরুল ছিলেন তাঁর সমকালে বাঙালি শ্রোতার কাছে দেবতুল্য সঙ্গীতকার। সে কারণেই সমসাময়িক গীতিকার ও সুরকাররা নজরুলকে অনুসরণ করতেন, অনুকরণ করতেন গীতরচনায় ও সুর যোজনায়। নজরুলের সঙ্গীত-সাফল্য ও তাঁর গানের ব্যবহারিক চাহিদা অনেক গুণী ব্যক্তিত্বকে বাংলা গানের দিকে টেনে নিয়ে এসেছে। বিশেষ করে গান লিখে ও সুর করে, অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি এর আগে গীতরচয়িতা ও সুরকারদের কাছে ততটা বোধগম্য ছিল না। কাজী নজরুল ইসলামের আর্থিক সাফল্যই পরবর্তীতে প্রলোভিত করেছে সমকালীন শিল্পী, কলাকুশলী গীতিকার-সুরকারদের।

আধুনিক বাংলা গানের গীতরচনায় নজরুলের পরবর্তী গীতিকাররা তাঁদের গানের বাণীতে প্রকাশের নানা মৌলিকতা এবং ভাবনার নতুনত্ব দেখিয়েছেন। রোমান্টিক বিষাদবোধ, কাল্পনিক বেদনাবিলাস, ভ্রষ্ট প্রেমের তরে সন্তাপসহ এক ধরনের অভিমানী বিচরণ ছিল স্বরচিত দুঃখের মায়া জগতে, যা বাঙালি শ্রোতাকে উপযুক্ত তৃপ্তিও দান করেছিল সে সময়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নজরুল তাঁর গানের বাণী রচনা করতেন সাবলীল ভঙ্গিমায়, আপনমনে। কোনো অসামঞ্জস্য, অপ্রাসঙ্গিক উপমার ব্যবহার করতেন না তাঁর গানে। কাল্পনিক এবং কৃত্রিমতা বিবর্জিত শব্দচয়ন করার এক দৈবিক ও মোহনীয় ক্ষমতা ছিল কাজী নজরুলের। আধুনিক ধারার বাণী ও সুর রচনার এ সরলতাই নজরুলকে সমকালে করেছে নন্দিত ও জনপ্রিয়। দেশবরেণ্য নজরুল বিশেষজ্ঞ করুণাময় গোস্বামী নজরুলের আধুনিক গান প্রসঙ্গে লিখেছেন এভাবে: "বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িকদের রচনায় বাংলা গান, বিশেষ করে বাংলা প্রেমের গান, গভীরভাবে অন্তর্মুখী হয়ে উঠল। তাতে শ্রোতার আবেগ যেমন

রূপায়িত হলো না, তেমনি শ্রোতৃচিত্তের সঙ্গে এই গানের সংযোগ স্থাপিত হলো না গভীরভাবে। বাংলায় অন্তর্মুখী সঙ্গীত রচনা সেই তুঙ্গ যুগে নজরুল ইসলাম শ্রোতৃচিত্তাভিমুখী সঙ্গীত রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন এবং তাতে তিনি অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন। ... এই জনচিত্তমনস্কতাই ত্রিশের দশকের নব্য আধুনিকতার মূল ব্যাপার। এই অর্থেই কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যসঙ্গীত এই নব্য আধুনিক যুগের প্রধান প্রবর্তক। নিবিড় অন্তর্মুখী সংগীতের প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত করে তিনিই তাকে জনচিত্তমুখী করে তুলতে প্রয়াসী হন। সেজন্য নজরুলের সংগীত রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্যকেই বলা যায় আধুনিক। ...পূর্ববর্তীদের কর্মে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের প্রেমসঙ্গীতে নরনারীর ভালোবাসা এমন সূক্ষ্ম সৌন্দর্যচেতনা স্তরে উন্নীত হয়েছে, এতটা দর্শনায়িত হয়ে পড়েছে যে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা অনুধাবন করে ওঠা কঠিন। কিন্তু নজরুলের প্রেমের গান সাধারণ মানুষের বোধগম্য সংগীত। এমন ঊর্ধ্বচারিতা সেখানে নেই যা সাধারণ মানুষের অনুভবের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। উচ্ছ্বাসে, অনুরাগে, বেদনায় নজরুলের প্রেমের গান অসাধারণ গৃহবাসী মানুষের স্বপ্ন অনুভবের প্রতিচ্ছবি। এর একটা বিপুল অংশের সুর প্রাণবন্ত, উচ্ছ্বাসময়, প্রবল আবেগের ব্যঞ্জনায় পূর্ণ। মর্মকে যেন স্পর্শমাত্র আকুল করে তোলে। পূর্ববর্তীদের গান গতিতে গম্ভীর, তাল ছন্দ সেখানে ব্যঞ্জনা অনুযায়ী বিলম্বপ্রবণ। কিন্তু নজরুল সঙ্গীত তালাঘাতে চঞ্চল, সেখানে প্রেমস্পৃষ্ট হৃদয়ের দোলাকে অনুভব করা যায়। ... শ্রমবিভাজন আধুনিক সঙ্গীত রচনা একটি উল্লেখযোগ্য দিক। গীতিকার- সুরকার ও গায়করূপে তিন পৃথক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে এই ধারায়। এমনটি এর আগে বাংলা গানের ইতিহাসে ঘটেনি।"[৭]

বাংলা গানের সব বয়সী শ্রোতার কাছে নজরুল রচিত যে গানগুলি জনপ্রিয়তা পেয়েছে- আমার ভুবন কান পেতে রয় প্রিয়তম তব লাগিয়া, আমি চিরতরে দূরে চলে যাব তবু আমারে দেব না ভুলিতে, আরো কতদিন বাকি, এখনো ওঠেনি চাঁদ এখনো ফোটেনি তারা, মোরা আর জনমে হংস মিথুন ছিলাম, কথা কও কও কথা থাকিও না চুপ করে, আধখানা চাঁদ হাসিছে আকাশে, আমার নয়নে নয়ন রাখি, গভীর রাতে জাগি খুঁজি তোমারে, গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙ্গে যায় কে যেন আমারে ডাকে, তোমার আঁখির মতো আকাশের দুটি তারা, তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, মোর প্রিয়া হবে এসো রানী, দীপ নিভিয়াছে ঝড়ে, নয়ন ভরা জল গো তোমার, বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ, মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে, যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পারো নাই, লাইলী তোমার এসেছে ফিরিয়া, শাওন রাতে যদি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আধুনিক গান। বাংলা কাব্যগীতির ধারায় অনবদ্য ও অবিস্মরণীয় সৃষ্টি এইসব আধুনিক গান। এসব গানের মধ্য থেকে ২/১ টি গানের সুর ও বাণীর অনুভূতি এমন:

আমি চিরতরে দূরে চলে যাব

তবু আমারে দেব না ভুলিতে

আমি বাতাস হইয়া জড়াইব কেশ

বেণী যাবে যবে খুলিতে।

এ গানের স্থায়ীর দ্বিতীয় লাইনে 'আমারে দেব না ভুলিতে' অংশটুকুতে গভীর বেদনার করুণ সুর লীলায়িত হয়েছে। সঞ্চারী অংশেও 'কত প্রিয়জন কে জানে' অংশটুকুতে কথা আর সুরে মিলেমিশে এমন এক চিত্রপট ফুটে উঠেছে, যা বিরহী শ্রোতার চোখ জলে পূর্ণ করে দেয়। প্রিয়ার মনে নিজের স্মৃতিচিহ্ন ধরে রাখার নিমিত্তে কবি প্রয়োজনবোধে চিরতরে অসীম শূন্যে চলে যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন, যেথা হতে কবি আর কোনোদিনও ফিরবেন না, তবুও যেন তাঁর প্রিয়তম কবিকে ভুলে না যায়– এই গানের মাঝে এটুকুই তাঁর মূল আর্তি। সহসা কবির প্রিয়ার চুলের বেণী যখন বাতাস এসে খুলে দিবে, কেশে জড়ানো সে বাতাসটুকুই চিরতরে দূরে চলে যাওয়া কবির স্পর্শ। প্রথম অন্তরাতে কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন তাঁর প্রিয়াকে– তোমার সুরের মোহনীয়তায় যখন বাতাস কেঁদে ক্লান্ত হবে আর আকাশ ঝিমিয়ে যাবে, ঠিক তখনই তোমার মনমাঝে যে বুকভাঙা বেদনা, হাহাকার তৈরি করবে সেই বেদনাটুকুই আমি। সঞ্চারীতে কবি বলেছেন– তোমার পরম উৎসব লগনে ভিখারীসম এই আমাকে হঠাৎ ক্ষণিকের তরে হলেও তোমার মনে পড়বে। এমনি করে তুচ্ছভাবে একবার মনে হলেও আমার অন্তরাত্মা তাতে তৃপ্ত হবে। কারণ যে উদ্দেশ্যেই হোক মনে তো হয়েছে এ অসহায়কে! তোমার নিয়ত চলার সে কুসুমাস্তীর্ণ পথে হঠাৎ একদিন দুঃসহ বেদনায় থেমে গিয়ে দেখবে, এই আমি মরে গিয়ে মিশে আছি তোমার পথের ধূলিতে, আর এভাবেই আমায় ভুলতে দেবো না হে প্রিয়! গানটির সবশেষে প্রিয়ার কুঞ্জপথে হঠাৎ থেমে যাওয়া, ধুলার সাথে মরে মিশে থাকা এ সকল দৃশ্যপট–তোমার কুঞ্জপথে যেতে হায় লাইনটির সুরে সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই ধূলির ধরণীতে মনে রাখা, স্মৃতি রেখে যাওয়া, অমর হয়ে থাকাই মানুষের জীবনের মূল ও স্বার্থক কর্ম, সেখানে স্বর্গীয় প্রেমে, গানে– প্রাণে অন্তঃপুরের চিরতরে বাঁধন সৃষ্টি করতেই নজরুলের এ গান।

তুমি শুনিতে চেয়ো না

আমার মনের কথা

দখিনা বাতাস ইঙ্গিতে বোঝে

কহে যাহা বনলতা।

নজরুল এ গানে তাঁর মনের অস্ফুট বাণী প্রিয়তমকে না জানার অনুনয় করেছেন। যে কথা বনলতা, দখিন হাওয়া পর্যন্ত অনুভবে বুঝে নেয়, সে কথা কবি তাঁর প্রিয়াকে বলতে নারাজ। দখিনা বাতাস কবি মনের সে কথা ইঙ্গিতেও বুঝতে পারে। এ এক নীরব অভিমনান কবির। গানটির স্থায়ীতে 'তুমি শুনিতে চেয়ো না' অংশে সম্পূর্ণ অভিমানসর্বস্ব একটি মনোমুগ্ধকর সুরের আবেশ ছড়িয়েছেন নজরুল। নজরুলের সার্থক সুরে চাঁদের চুপ করে থেকে মহাসাগরের কান্নার শব্দ শোনা, ভ্রমরের গুনগুন গুঞ্জন, কুসুমের নীরবতা গানে ব্যবহৃত সব অনুষঙ্গই চিত্রিত হয়েছে সফলভাবে। প্রথম অন্তরাতে– না বলা কথায় যেমন সব বলা হয়ে যায়, ঠিক তেমনই কিছু উপমা কবি ব্যবহার করেছেন এ গানে। দূর আকাশে নিশ্চুপ বসে থেকে মহাসাগরের কান্না শোনে রূপালী চাঁদ, অন্যদিকে ভ্রমর শত চেষ্টা করেও ফুলের নীরবতা ভাঙ্গাতে অসমর্থ। এখানেই কবির অভিমান তীব্র। রাতের আকাশের সব তারা যেমন আমাদের ক্ষীণ নয়নে দেখতে পাই না, তেমনি জীবনের সব কথা, সব অনুভূতি মুখে বলে প্রকাশ করা যায় না পুরোপুরিভাবে। প্রিয়জনের নয়নে নয়ন রেখে অনুভবে বুঝে নিতে হয় তা। এখানেই প্রকৃত ভালোবাসা মূর্ত হয়ে ওঠে জীবন মাঝে। হংস- মিথুন, বিহগ-বিহগীরা যখন একে অপরের পাখায় বাঁধা থাকে, সেথায় মুখে আর কোনো কথা রয় না তখন। একইভাবে ভ্রমর বা মধুকর যখন ফুলে মধু পান করে, তার সব চঞ্চলতার অবসান হয়। শুধু নীরবতা এসে ভর করে জীবন মাঝে। কবিও তাঁর প্রিয়ার কাছে প্রেমময় নিস্তব্ধতা পিয়াসী, যেথায় মনের আনন্দ, অভিমান, উচ্ছলতা, দুঃখবোধ সব নির্বিকারে অনুমেয়।

আধুনিক গান প্রসঙ্গে ইদ্‌রিস আলী তাঁর 'নজরুল সংগীতের সুর' গ্রন্থে মতামত দিয়েছেন এভাবে "নজরুল ইসলাম শ্রোতার চিত্তের সেই গোপন চাহিদা ও অনুভূতি তাঁর জীবনবোধ দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর রচিত বাংলা আধুনিক গানে সাঙ্গীতিক সৌকর্যসহ ছিল জীবনবোধ, জগৎচিত্র, শ্রোতৃচিত্তকে অনুপ্রাণিত করার রসদ, ভাষার সহজবোধ্যতা, জনঘনিষ্ঠতা এবং প্রকাশভঙ্গিতে সরলতা। সাধারণ মানুষের জীবনাচারের সাথে নজরুলের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র। সাধারণ মানুষকে খুব কাছাকাছি থেকে জানবার ও তাদের অনুভূতিগুলো সহানুভূতির সাথে উপস্থাপন করার দুর্লভ শক্তি একমাত্র নজরুলের মধ্যেই বর্তমান ছিল; ফলে নজরুলের গান জনচিত্তকে বিপুলভাবে সাড়া দিতে পেরেছিল।

নজরুলের এ ধরনের রচিত আধুনিক গানকে অনেকেই কাব্যগীতি বলে থাকেন কিন্তু এমনটি ঠিক নয়, সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, কাব্যগীতি বলে বাংলা গানে কোনো গীতধারা নেই। মূলতঃ কাব্যবিবর্জিত কোনো বাংলা গান রচিত হতে পারে না। তার জন্য কাব্য-সম্বলিত গানকে কাব্যগীতি বলা সমীচীন নয়। কাব্যগীতি কোনো স্বতন্ত্র শ্রেণির গানও নয়। বরং বাংলা সকল গানই কাব্যগীতি।... অর্থাৎ কাব্য ছাড়া বাংলা গান রচনা কখনো সম্ভব নয়।

বরং কাব্য ও সুরের পারস্পরিক ও অবিচ্ছেদ্য সংমিশ্রণেই বাংলা গান রচিত হয়ে থাকে। এর একটি ধারা আধুনিক গান। নজরুলের রচিত গানের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে আধুনিক গান। আধুনিক গান বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আঙ্গিক অবলম্বন করে রচিত হয়। গানের বাণীর কাব্যিক মূল্য, রস ও অর্থবোধকে সুরের স্পর্শে মূর্ত করে তোলাই আধুনিক গানের মূল লক্ষ্য।"[৮] বাংলা কাব্য সঙ্গীতের এক সুবর্ণ ও ফলপ্রসূকাল অতিবাহিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে। সঠিকভাবে বলতে গেলে গীতিকার সুরকার কণ্ঠশিল্পী সব প্রতিভাবানদের সমাগম ঘটেছিল এই সময়ে। সুবোধ পুরকায়স্থ, প্রণব রায়, তুলসী লাহিড়ী, অনিল ভট্টাচার্য, অজয় ভট্টাচার্য, হিরেন বসু, শৈলেন রায় প্রমুখ ছিলেন স্বনামধন্য গীতিকার। ওদিকে কমল দাশগুপ্ত, হিমাংশু দত্ত (সুর সাগর), তুলসী লাহিড়ী, সুবল দাশগুপ্ত, পঙ্কজ কুমার মল্লিক প্রমুখ ছিলেন বিখ্যাত সুরকার। শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আঙুরবালা, ইন্দুবালা, হরিমতী, কমলা ঝরিয়া, শৈল দেবী, কানন দেবী, যুথিকা রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীন দেব বর্মন, আব্বাসউদ্দীন, মৃণাল কান্তি ঘোষ, সুপ্রভা সরকার, জগন্ময় মিত্র প্রমুখ। উপরে উল্লেখিত গুণী মানুষদের এক মিলনকেন্দ্রে সেসময় বাংলা গান সমৃদ্ধিলাভ করেছিল বিকাশের ক্ষেত্রে। এমন স্বর্ণালী যুগের প্রতিনিধিত্বশীল ও উজ্জ্বল রচয়িতা ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। কালক্রমে বাংলা গানের সেই আধুনিক ধারার গৌরব বর্তমান সময়ে এসে রচয়িতা সুরকার শিল্পী ও শ্রোতাদের কারণেই আবার কিছুটা মলিনতায় আচ্ছন্ন গৌরবচ্যুত্য হয়েছে। আধুনিক গানের সেই চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধসুষমা অনুভব করতে হলে, এখনো আমাদের কাজী নজরুলের লেখা গানের পানে ফিরতে হয় বারবার।

নজরুলের হাত ধরে যে আধুনিক গানের নতুন ধারা বাংলা গানে সূচিত হয়েছিল, তার প্রায় শতবর্ষ আমাদের সন্নিকটে। এত বছর পরেও নজরুলের সেই আধুনিক গানের বা সমকালীন সময়ের ভিন্ন গীতিকার সুরকারের রচিত সেই আধুনিক গানে বাঙালি সঙ্গীতপিপাসু শ্রোতাদের আগ্রহের ভাটা পড়েনি বরং তা ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। "নজরুলের দ্বারা বাংলা গীতধারায় আধুনিক গানের স্বর্ণযুগ সূচিত হয়েছিল। কেবলমাত্র কাব্যভাগে সাধারণ মানুষের প্রেম, ভালোবাসা ও জীবনবোধ এবং ভাষার সহজবোধ্যতা, জগৎচিত্র, শ্রোতচিত্তের রঞ্জনা ও জনঘনিষ্ঠতার সৌকর্যে নয় সুরারোপে ও গায়কী-স্বাতন্ত্রের মূল্যও ছিল সমধিক। আধুনিক গানে রাগসুরের প্রয়োগে স্পষ্টতা একমাত্র নজরুলেই বিদ্যমান। নজরুলের আধুনিক গানের কাব্যিক-বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করলে দেখা যায়, মানবীয় প্রেম-বিরহ ও আনন্দ-বেদনার প্রকাশ সম্পূর্ণ পার্থিব। কোনো অতীন্দ্রিয় লোকের চিন্তা-চেতনা এই মিলন-বিরহে কোনরূপ প্রভাব ফেলতে পারেনি। যেমনটি রবীন্দ্রনাথের গানে ঘটেছে। তবে এই প্রভাব নজরুলের গজল, ভক্তিগীতি ও বাউলগানে লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-নজরুল কবি-মানসের মধ্যে ভাবগত মৌলিক ব্যবধান লক্ষ্য করার মতো- বিশেষভাবে গানকে সকল শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছানোর প্রয়াসে

সাফল্য অর্জন করার মধ্যে নজরুলই একমাত্র যাথার্থিক যশস্বীর যুগাদ্যায়ী। কামনা-বাসনার তপ্ত স্পর্শে, নজরুলের আধুনিক গান যেন দীপ্তিময় ও জ্যোতির্ময় । সুরের দ্যোতনায় সেই জ্যোতি নর-নারীর মিলন-বিরহে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উপলব্ধি ও স্পর্শে যেন বাস্তবতার স্বাদ গ্রহণ করে। নজরুলের এ ধরনের গানগুলি বেশি মাত্রায় পার্থিব নর-নারীর তাজা প্রেমকাব্য। পাওয়া, না পাওয়ার আকুতি মানব মনে যে শিহরণ ও অতৃপ্ত বাসনার উদ্রেক ঘটায়, নজরুলের আধুনিক গান তারই জীবন্ত-রূপ। ... নজরুলের কবি-মানসের প্রকাশ অন্তর্মুখী নয়, বহির্মুখী। দৈবানুষঙ্গের কোনো সম্পর্ক নেই। আছে মানবকেন্দ্রিকতা। মানব-মানবীর প্রেমানুভূতিতে নেই কোনো ঊর্ধ্বচারিতা যা সাধারণ মানুষের অনুভবের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। নজরুলের আধুনিক গানে আছে জাগতিক প্রেমের প্রত্যক্ষ ও নিগূঢ় স্পর্শ। আনন্দ-উচ্ছ্বাসে, রাগ- অনুরাগে, বেদনা-বিহ্বলতায় নজরুলের আধুনিক গানে বিধৃত হয়েছে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন ও অনুভবের প্রতিচ্ছবি। অতীন্দ্রিয়ালোকের অতল স্পর্শে নয়, জাগতিক দেহজ অনুভবের দ্বারা সেই প্রতিচ্ছবি স্বীয় হৃদয়ে প্রতিফলন ঘটিয়ে বাস্তবের ছোঁয়ায় অবগাহন করা যায়। নজরুলের কবি-মানসে তাই নেই কোনো আত্মকেন্দ্রিকতা, আছে সার্বজনীনতা। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে জনমানুষের কথাই ব্যক্ত করেছেন স্বীয় অভিজ্ঞতার পরশ বুলিয়ে। ... নজরুল-মানসে উচ্ছ্বসিত আবেগ-প্রবণতা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অভিব্যক্তির লক্ষণ। তাঁর এই অভিব্যক্তি সুরকে অবলম্বন করে গীতে প্রবিষ্ট হয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে। নজরুলের সুর-ভাবনা এবং গীতের বিষয়-উপস্থানার মধ্যে তাঁর এই লক্ষণ সুস্পষ্ট। মূলতঃ সুরকে কেন্দ্র করেই আধুনিক গানের যাত্রা শুরু, কথা থেকে নয়। সুর-ভাবনা ও সুর-পরিকল্পনা শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতের কঠোর নিগূঢ়চ্যুত হয়ে গীতের কাব্যে প্রবেশ করে কাব্যিক মূল্যকে তীব্রভাবে সুরের অনুষঙ্গে প্রকাশ করাই আধুনিক গানের লক্ষণ। এই লক্ষণকে কেন্দ্র করেই আধুনিক গানের গোড়াপত্তন। বাংলা-সঙ্গীতের আধুনিক যুগের উন্মেষ ঘটে নজরুলের দ্বারা। নজরুলই বাংলা গানের আধুনিকতার পথিকৃৎ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

আধুনিক গান কোনো একটি বিশেষ মূহুর্তে বিশেষ একটি গানকে কেন্দ্র করে এর প্রারম্ভ সূচিত হয়নি। তাই নজরুলকে আবার আধুনিক গানের স্রষ্টা বলা যাবে না, বরং সংস্কারক বা আত্ম-অভিব্যক্তি প্রকাশের পথ-প্রদর্শক বলা যায়। কারণ, নজরুলের গানে সুরের বৈচিত্র্যতা লক্ষণীয় এবং গানের কাব্যিক রস ও মূল্যবোধ একান্তই তাঁর স্বীয় অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ যা বাস্তবমুখী এবং গানের সহজ, সরল ও সাবলীল অভিব্যক্তির দাবিকে পূরণ করতেও সমর্থ।

বাংলা গান যখন একটি আত্ম-বলয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল, যে-গান যুগের চাহিদা ও শ্রোতাকুলের প্রাণের চাহিদা মূল্যায়নে ব্যর্থ হচ্ছিল এবং একটি গতানুগতিক ধারার বেদীমূলে গতিহারা অবস্থায় অবস্থান করছিল তখন নজরুল

তাঁর প্রতিভাগুণে সেই স্থির, অচল ও গতিহীন অবস্থা থেকে বাংলা গানকে মুক্ত করে তাতে সুর ও কাব্যের বৈচিত্র্য সব রসদ যুগিয়ে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। আজো তা প্রাণের চাহিদা, রসদের উপযোগিতা, গতির প্রবহতা ও সুরস্নাত কাব্যের যুগোপযোগিতায় প্রদ্যোতিত হয়ে আমাদের বাংলা-সঙ্গীতের আধুনিকতাকে চির-ভাস্বর করে রেখেছে।"[৯]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধ্রুপদী ধারার সুরের অনুসারী ছিলেন, তেমনি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন খেয়াল ও ঠুমরী ধারার সুরের অনুসারী। নজরুলের সঙ্গীতগুরু ঠুমরী সম্রাট ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁ ছিলেন বিখ্যাত সারেঙ্গী বাদক ধ্রুপদীয়া ও খেয়ালীয়া মজীদ খাঁয়ের পুত্র। কিরানা ঘরানার যোগ্য উত্তরসূরী ওস্তাদ ছন্দে খাঁ, ওস্তাদ বাদল খাঁয়ের যোগ্যতম শিষ্য ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের গুরু জমিরউদ্দীন খাঁ। নজরুলের বৈচিত্র্যধর্মী সুরসৃজনের ক্ষেত্রে রাগসঙ্গীতের উপরে জমিরউদ্দীন খাঁয়ের তালিম কবির সৃষ্টিতে প্রভাব ফেলেছে বহুলাংশে। নজরুলের রচিত সবধরনের গানে তাই আমরা নানাবিধ অলঙ্কারিক ক্রিয়া লক্ষ্য করে থাকি। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর রচিত বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক গানে নানা অলংকার যেমন– গমক, মুরকি, গিটকারী, জমজমা, খটকা, কণ্বস্বর ইত্যাদি এবং সারগাম, আলাপ, তান, বিস্তার প্রভৃতি সুনিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতপদ্ধতির মুসলমানি খেয়ালি ধারায়, নজরুল সংগীতের গায়কী শৈলী অধিকতর প্রভাবিত। নজরুলের গানের গায়কীতে এক ধরনের ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়। ঠুমরী চালের নানান অলংকারের আবেশও অনুভূত হয় সুরে।

বিষয়ভিত্তিক বাণীর ভাবরসের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের গান সুনিয়ন্ত্রিত হয়েছে, অন্যদিকে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সুর ও বাণীকে মহিমান্বিত করেছেন তাঁর সাঙ্গীতিক নৈপুণ্যের মাধ্যমে। আলোচনার প্রেক্ষিতে আধুনিক গানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে হয়– সকল শ্রেণির মানুষের কাছে আধুনিক গান সহজবোধ্য। এক ধরনের অতি বিশিষ্ট বাণীর সাথে সাঙ্গীতিক ভাবমিশ্রিত হয়েই এই গান তার রূপ পরিগ্রহ করে। আধুনিক গানের কথা ও সুরের আবেদন একে অপরের পরিপূরক। আধুনিক গানের সুর যোজনার মূল উদ্দেশ্য পদবাহিত ভাবকে মূর্ত করে তোলা। এই গান শাস্ত্রীয় সংগীতের আঙ্গিকে রচিত হয় না এবং শাস্ত্রীয় সংগীতের কোনো কঠোর নিয়মবিধি মেনে চলে না। সুর বর্জিত অবস্থায়ও এই গানের বাণী অর্থপূর্ণ ব্যঞ্জনাবাহি ও আনন্দদায়ক হয় শ্রোতাদের কাছে। আধুনিক গানের সুর ও তাল সংযোজিত হয় গানের বাণী ও ভাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। আধুনিক গানের অন্তর্নিহিত মানবীয় চিন্তা চেতনা, প্রেম বিরহ, আনন্দ বেদনার সকল উপলব্ধি পার্থিব ও ইহজাগতিক। উপরে উল্লেখিত সকল বৈশিষ্ট্যের আলোকে কাজী নজরুল ইসলামের আধুনিক গান শাশ্বত রূপ নিয়ে আমাদের বাংলা

গানের ধারায় চিরঅমলিন ও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। নজরুলের রচিত এই আধুনিক গানের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা সর্বকালের ও সর্বযুগের।

গানের রচয়িতা ও সুরকার হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা গানের ভুবনে আধুনিক স্বকীয় ধারায় শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত একজন সফল সঙ্গীতকার। নজরুলের সকল সৃষ্টিতে বিশেষ করে গানে হৃদয়ের ঘোষণা প্রবল। সবকিছু ছাড়িয়ে হৃদয় সংবেদনটিই বড় হয়ে উঠেছে তাঁর আধুনিক শ্রেণির গানে। বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ স্পৃহা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরাজ করছিল। সেই সংগ্রামী মনোভাবকে গানের আসরে রূপ দেয়ার ভাবনা নজরুলের মনেই সর্বপ্রথম জাগ্রত হয়। ফলে আমরা পেয়েছি অসংখ্য জাগরণী গান। তেমনি বাংলায় গজল গান রচনার সবটুকু কৃতিত্ব নিঃশেষে কাজী নজরুল ইসলামেরই প্রাপ্য। অন্যদিকে গানের নিজস্ব প্রয়োজনের মুখ চেয়ে নজরুল ইসলাম তাঁর গানের ছন্দ নির্ধারণ করতেন। নজরুলের গানের সুর সৃষ্টির ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। বাউল, ভাটিয়ালি, ঝুমুর প্রভৃতি লোকসঙ্গীত থেকে আরম্ভ করে মার্চের সুর, গজল, আধুনিক, স্বদেশ সঙ্গীত, খেয়াল, ধ্রুপদ, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, লুপ্ত প্রায়, অর্ধলুপ্ত রাগরাগিণীর ভিত্তিতে রচিত বাংলা গান কোনোকিছুই কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিভার বাইরে নয়। বিবিধ সুরের রাজ্যে নজরুলের অগাধ গতিবিধি পরিলক্ষিত হয়। যে হাতে তিনি দিয়েছেন প্রেম বিহ্বলতা সম্পন্ন চটুল অঙ্গের গজল গানের সুর, সেই একই হাতে তিনি দিয়েছেন গম্ভীর প্রকৃতির ধ্রুপদ অঙ্গের গানের সুর। যে হাতে দিয়েছেন দৃপ্ত মার্চ সংগীতের সুর, সেই একই হাতের স্পর্শে আমরা পেয়েছি শ্যামাসঙ্গীত। বিশেষ ধরনের রুচিসম্পন্ন সঙ্গীতকার না হলে, একই সাথে মার্চের সুর, শ্যামাসঙ্গীতের সুর, আধুনিক গানের সুর ও বাণী গঠন পুরোপুরি অসম্ভব।

নজরুলের সুরসৃষ্টির পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। বাংলা গানের বিভিন্ন শ্রেণি নিয়ে এত পরীক্ষা নিরীক্ষা আর কোনো সঙ্গীত রচয়িতা করেননি। নজরুলের এই সর্বক্ষেত্রে সঞ্চরণশীলতা এবং প্রচেষ্টার ব্যাপকতার জন্য সমকালীন বাংলা গানের ধারায় নজরুলের আধুনিক গান হয়েছে অন্যান্য সকল সঙ্গীতকারের থেকে যশস্বী ও জনপ্রিয়। সৃজনধর্মী বা সৃষ্টিকুশল প্রতিভার বলেই নজরুল যখন যে গানের ধারার দিকে হাত বাড়িয়েছেন, তাঁর হাতে সেই গান সোনা হয়ে ঝরেছে। নজরুলের সুরের লীলায় উচ্ছল প্রাণের প্রাবল্য লক্ষ্যণীয়। কবির সুরের স্রোত প্রাণাবেগে মুখর ও চঞ্চল। শ্যামাসঙ্গীত ও কীর্তনে নজরুলের যেমন ভক্তি বিগলিত অন্তরের আত্ম-সমর্পণের আকুতি প্রকাশিত, স্বদেশী গানে পরাধীনতার গ্লানিজর্জর সুতীব্র অনুভূতি পরায়ন অন্তরের অভিব্যক্তি স্পষ্ট, প্রাণের লীলা প্রকটভাবে মার্চের সুরে প্রকাশিত। কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ভক্তিভাবের গানে নিবিড় আত্ম-সমর্পণের আকুতি ফুটে উঠেছে। বিধিবদ্ধ নিয়মরীতি অনুসরণ করে সুপরিচিত হিন্দুস্তানি খেয়াল গানের আদলে বাংলা খেয়াল

রচনা নজরুলের রচয়িতা ও সুরকার প্রতিভার আরেকটি উজ্জ্বলতম ধারা। পাশাপাশি অপ্রচলিত, অর্ধলুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় রাগে রচিত গান রচনা নজরুলের শিল্পীজীবনের আর একটি মহৎ প্রচেষ্টা। লোকরঞ্জনকৃত বাংলা গানের মধ্য দিয়ে অবহেলায় লুপ্ত হয়ে যাওয়া সকল রাগ রাগিনীকে পুনরুদ্ধার করার মতো এমন ব্যতিক্রম ও প্রশংসনীয় সৃজন, বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাসে বিরল। নজরুল সমকালে তাই আধুনিক গানসহ সকল ধারার গান সফলভাবে সৃজনকৌশলে স্বার্থক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

আধুনিক বাংলা গান এবং কাজী নজরুল ইসলামের রচিত আধুনিক গান সম্পর্কে এবং আধুনিক গানের দৈন্যদশাসহ বাস্তবতা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী সন্তোষ সেনগুপ্ত তাঁর আত্ম-জীবনীমূলক গ্রন্থ 'আমার সংগীত ও আনুষঙ্গিক জীবন' এ উল্লেখ করেছেন: "আধুনিক গান মানেই সাম্প্রতিককালের গান, অর্থাৎ contemporary song, তা সে যে - যুগেই হোক না কেন। এই সব আধুনিক গানের রচয়িতা যারা- তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের সমকালীন যুগের উপযোগী গান লিখে থাকেন। এই গান বিভিন্ন দশকে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। ১৯৩০ সাল থেকে দেখা যায় তৎকালীন প্রচলিত সঙ্গীতধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রসের বাংলা গান জন্মলাভ করেছে। এই গান প্রধানতঃ কাব্যধর্মী এবং সুর রাগাশ্রয়ী। পরিশীলিত কণ্ঠের প্রয়োজন ছিল এই রসের গান গাইবার জন্য। প্রথম যুগে এই সাম্প্রতিক গানের রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন প্রধানতঃ কাজী নজরুল ইসলাম এবং তার পরে অজয় ভট্টাচার্য্য, শৈলেন রায়, প্রণব রায়, সুবোধ পুরোকায়স্থ প্রমুখ। এই সময় থেকে বাংলা গানের জগতে একটি নূতন সংজ্ঞার সূত্রপাত হয়- তার নাম সুরকার। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সুরকারদের পুরোভাগে ছিল হিমাংশু দত্ত (সুরসাগর), অনুপম ঘটক, উমাপদ ভট্টাচার্য্য, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, কমল দাশগুপ্ত, অনিল ভট্টাচার্য, সুধীরলাল চক্রবর্তী ইত্যাদি। কাজী নজরুল ইসলাম এমন একজন লেখক যাঁর লেখা সত্যিই যুগোপযোগী, যাঁর লেখা গান সব যুগসীমার গণ্ডী সহজেই অতিক্রম করে একটা সার্বজনীনতা ও সর্বকালীনতা লাভ করেছে। (একটি নতুন পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে) বস্তুতঃ ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল হলো তৎকালীন আধুনিক বাংলা গানের স্বর্ণযুগ। এতগুলি দিকপাল শিল্পী, সুরকার ও গীতিকারের সমন্বয় আর কখনো ঘটেনি, ভবিষ্যতে কখনো ঘটবে কিনা কেউ বলতে পারে না। এই সময়কার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জ্ঞান গোস্বামী, শচীন দেব বর্মণ, কে.এল সায়গল, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, বেচু দত্ত, সুধীরলাল চক্রবর্তী, জগন্ময় মিত্র, শৈল দেবী, যূথীকা রায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, উৎপলা সেন, সুপ্রভা ঘোষ (সরকার), আরতি মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ওদিকে নজরুল ইসলাম তাঁর গানের একটি আলাদা পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন। তাঁর গানের সর্বপ্রধান শিল্পী ছিলেন ইন্দুবালা। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ইন্দুবালার গান বা রেকর্ড যে না শুনেছে নজরুল ইসলামের গানের প্রকৃত রূপ– তাঁর গায়কীর পরিচয় সে পায় নি। ... বর্তমান যুগে নজরুল ইসলামের

গানের বহুল প্রচার হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তার ভেতরে অনেক সময়েই নজরুলকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর রচিত গানে অন্য অনেকের সুর সংযোজনার ফলে নজরুল সঙ্গীতের বৈশিষ্ট থাকছে না অনেক ক্ষেত্রে। ... বস্তুতঃ সর্বধারার সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ সমন্বয় ঘটেছিল ঐ সময়ে। কেনো বিষয়েই কারো কোনো গোঁড়ামি ছিল না কি শ্রোতার কি শিল্পীর। তৎকালীন আধুনিক গান প্রধানতঃ রাগাশ্রয়ী ছিল। কাজেই আধুনিক সঙ্গীতশিল্পীদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে পারদর্শী হতে হতো। তাঁদের কণ্ঠ অনেক মার্জিত ও পরিশীলিত ছিল। তখনকার দিনের একখানা আধুনিক গানের রেকর্ড অন্ততঃ ১০ বৎসর বিক্রী হত। আমাদের এই বাংলাদেশে সঙ্গীতের বহুমুখী প্রবাহ চিরকালই অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সব ভাষাভাষী অঞ্চলে দেখা যায় যে হিন্দী ফিল্মের গান অন্যান্য সকল আঞ্চলিক গানকে নিস্প্রভ করে দিয়েছে। শুধু আমাদের এদেশেই রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি সকল কবিদের গানই অব্যাহত রয়েছে। বাংলা বা হিন্দী ফিল্মের গান এদের কিছুমাত্র স্থানচ্যুত করতে পারে নি। (আগেকার দিনের আধুনিক গান প্রধানতঃ রাগাশ্রয়ী ছিল)। কিন্তু এখনকার দিনের আধুনিক গান কোনো রকম আশ্রয়ের কথা বিবেচনা করে না-বরঞ্চ অগ্রাহ্য করে। আধুনিক গানে সাম্প্রতিককালের সঙ্গীতচিন্তা প্রতিফলিত হয় তাই সে সমকালীন গান। এর রূপ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। আজকের যে-গানে চমৎকৃত হচ্ছি, কিছুকাল পরেই তা বিস্বাদ লাগবে পুরানো খবরের কাগজের মতো। বহুকাল বেঁচে থাকবার দাবি তার নেই। শুধু তাৎক্ষণিক সঙ্গীত পিপাসা মেটাতে পারলেই তার কাজ শেষ। ঝলমলে উজ্জ্বল তার রঙ, সারাআকাশ তা ক্ষণকালের মতো রাঙিয়ে দিয়ে গেল। সারাদেশের মানুষের মুখে ঐ গানের কলি কিছুদিনের মতো প্রতিধ্বনিত হলো তারপর আবার বিস্মরণের অতলে মিলিয়ে গেল। এ যেন, রঙিন প্রজাপতি, মানুষের মনে রঙীন স্বপ্ন জাগিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। মনের আকাশে ক্ষণকালের মতো রামধনুর এক অপূর্ব সম্ভার। স্থায়ীত্বের মানদণ্ড দিয়ে এর বিচার চলে না, কারণ স্থায়ীত্বের বিচারই তো সব নয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং অনুভূতি এতো সবই একান্ত সাময়িক। মানুষের প্রথম প্রেমের মতো ক্ষণভঙ্গুর অথচ এর থেকে মধুরতম উপলব্ধি আর কী-ই বা থাকতে পারে। এই যে আধুনিক গান-এর কোনো বংশপরিচয় নেই, কোনো ঐতিহ্য নেই- গর্ববোধ নেই, আভিজাত্য নেই, কাজেই কোনো উন্নাসিকতাও নেই। যা খুশি কথা যেমন খুশি সুরে বলবার এর এক সহজ স্পর্ধা আছে। আধুনিক গানের বক্তব্য হলো 'কালিদাস তো নামেই আছেন আমি আছি বেঁচে'। অন্যান্য সব নামী কবিরা তো সবাই গত হয়েছেন তাঁদের গান যতদিন খুশি চলুক না কেন, তাতে আপত্তি করবার কী-ই বা আছে। তাঁদের গানের উৎসই তো শুকিয়ে গেছে। কিন্তু আধুনিক গানের উৎস কখনই শুকাবে না, প্রতিনিয়ত এর কবিরা জন্মগ্রহণ করছেন। বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে এই আধুনিক গানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তবু একথা স্বীকার করতেই হবে এই যুগে আধুনিক বাংলা গানের জগতে একটা গভীর নৈরাশ্যের ছায়া পড়েছে। বাংলা গানে এমন কোনো নবতর প্রতিভার সন্ধান

পাওয়া যাচ্ছে না, যা একে পুনর্জীবিত করতে পারে। তাই বলে আধুনিক গানের মৃত্যু ঘটেনি। নবতর শিল্পী, গীতকার ও সুরকারের অপেক্ষায় আছে নবতর প্রতিভার জন্মলাভ নিশ্চয়ই হবে।"[১০] গান রচনায় ইতিহাসে সংখ্যার বিচারে পৃথিবীব্যাপী সবার উপরে কাজী নজরুল ইসলাম। পৃথিবীর আর কোনো গীতিকার এত অধিকসংখ্যক গান রচনা করেননি এত কম সৃষ্টিশীল সময়ের মধ্যে। কত গভীর সুরের জ্ঞানসম্পন্ন হলে এত অধিকসংখ্যক গান বিচিত্র ভঙ্গিতে, সুরকে সাবলীলভাবে লীলায়িত করা যায় তা সহজেই অনুমেয়।

নজরুলের গীতিকবিতা, আধুনিক গান, সুর প্রয়োগ সম্পর্কে ড.বাঁধন সেনগুপ্ত তাঁর 'নজরুলের কাব্য বিচারে: আধুনিক পরিপ্রেক্ষিত' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন: "দেখা যাচ্ছে সমসাময়িকদের মধ্যে তিনি তাঁর কাব্যে হয়ে উঠতে চেয়েছেন একান্তভাবেই আধুনিক। আধুনিকতার অর্থাৎ আধুনিক গীতিকবিতার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে অনেকে তাই স্মরণ করেন সুপরিচিত সেই মন্তব্য : The characteristic of the lyric is that it is the product of pure poetic energy unassociated with others energies. (Drinkwater). নজরুল তা মনে রেখেও তাতে দান করেছিলেন অতিরিক্ত বিশুদ্ধ এক বিমুগ্ধতা, যা তাঁর গীতিকাব্যকে মান্যতা এনে দেয়। এতে আধুনিকধর্মী লিরিকের ভাবের আবেগ এবং ভাষার প্রসাধন যেমন তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি অলক্ষ্যে তাতে যোগ হয়েছে যুগপৎ আশা ও বেদনার সুর। এই বেদনাবিলাস গীতিকবিতার দান। কবির রচনায় এই বিষাদময় অন্তর্লীন সুরটি কবির সবিশেষ অর্জন হিসেবে চিহ্নিত। আসলে তাঁর কাব্য যেন সৌন্দর্যের অন্তহীন পথে আবেগরঞ্জিত অভিসার। একদিকে যেমন আধুনিক জীবনের বাস্তবতা, অসহায়তার পীড়ন, দারিদ্রের অন্তহীন প্রসার, অসাম্য আর শোষণের নিঃশব্দ পদচারণা, তেমনি পাশাপাশি মানবতার জয়গানে মুখরিত অভিলাষীদের মানবতার আদর্শলোকে পাখা বিস্তারের ক্ষণস্থায়ী চেষ্টা। সংকটের এই চোরাপথেও তাঁর গীতিকবিতা যেন আপন মানসিকতার পরিমণ্ডলে বেদনার বাহার খুঁজে বেরিয়েছে। তাই তাঁর কবিতায় বেদনার এত নিবিড় প্রস্ফুটন। এইভাবে নজরুলের কাব্য হয়ে উঠেছিল রোমান্টিক বিষাদ ও জীবনের নিগুঢ় অর্থবাহী মরমিয়া তত্ত্বের নিবিড় অবগাহী অনুধাবন। একদিকে অস্তিত্ববাদের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আর্তি, অন্যদিকে তাঁর কাব্যের ঈশ্বর বা সমাজের দ্বান্দ্বিক বিন্যাস। স্বভাবজাত বাঙালি মানসের ভাবপ্রবণতা, উচ্ছ্বাস তাঁর কাব্যকে তাঁরই আড়ালে এনে দিয়েছিল গীতিকবিতার মৃদুমন্দ সুগন্ধী বাতাস এবং আকাশের নিঃসীম নীলিমায় অন্তহীন পদচারণার স্বাধীনতা। ... কিভাবে গীতিকবিতা সদর্থে গানের ভুবনটি রচনা করতে সমর্থ হলো সে-কথা জানে সমকাল। তাঁর গীতিকাব্যে যে শব্দই হল মূলধন সার্থক ব্যবহারের গুণে যা হয়ে উঠেছিল সার্থক সঙ্গীত। সুর তাতে প্রাণদান করেছে। জীবনের অজস্র অনুভূতির স্পর্শে তা সহজেই হয়ে উঠেছে নন্দিত জীবনের সহজ বন্দনা-গান। অজস্র পরীক্ষানিরীক্ষার রসায়নাগারে তখন কথা আর সুরের মেলবন্ধন। যে প্রয়োগ কুশলতা তাঁর কাব্যধর্মের প্রধান গুণ তার বিনিময়ে

তিরিশের দশক এবং চল্লিশের সূচনায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলা গানের মুকুটহীন সম্রাট। তাই সময় যেন তখন তাঁরই অধিগত। শ্রেষ্ঠ শিল্পী তাঁর গানের তিয়াসায় অধীর। এমন ভাগ্য বিগত শতাব্দী শুধু কেন তাঁর প্রয়াণের পরেও আর কারো ক্ষেত্রে হয়নি। একালের মতো গান শুধু লেখা হয় তা নয়। গান অর্থাৎ নজরুলের গীতিকবিতা লেখা হতো শব্দ আর সুরের আভিজাত্যে অবশ্যই কালোত্তীর্ণ হবার আশায়। সম্ভবত সেই আশায় তাঁর শব্দাংশগত ঝোঁক এত প্রিয়। ধ্বনির কৌলীন্য তাঁকে প্ররোচিত করে এসেছে তাঁর কাব্যে। তাঁর কবিতার অর্থ সম্ভবত সেই কারণেই এত আবেগদীপ্ত এবং হৃদয় সংবেদী। গীতিকবিতার স্বাভাবিক নিয়মে তিনি ব্যক্তিগত আবেগময়তার দ্বারা পরিচালিত।"[১১]

আধুনিক গানসহ এক বিচিত্র সঙ্গীতসম্ভারে পূর্ণ কাজী নজরুল ইসলামের গানের ভাণ্ডার। কাজী নজরুল ইসলামের অজস্র সম্ভাবনাময় ও সৃষ্টিশীল প্রতিভার নবউন্মেষের ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি সমৃদ্ধ বাংলা গানের ধারা। নজরুল রচিত সব ধারার মধ্যে জনপ্রিয় আধুনিক ধারার গান। নজরুল রচিত উল্লেখযাগ্যে কয়েকটি আধুনিক গান– গভীর নিশিথে ঘুম ভেঙে যায়, তোমার আঁখির মতো আকাশের দুটি তারা, তোমারেই আমি চাহিয়াছি প্রিয়, তোমার মনে ফুটবে যবে প্রথম মুকুল, দীপ নিভিয়াছে ঝড়ে জেগে আছে মোর আঁখি, গভীর রাতে জাগি খুঁজি তোমারে, গানগুলি মোর আহত পাখীর সম, এত রঙ ছড়ালে কে গো আমার সাঁঝ গগনে, ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে, চমকে চমকে ধীর ভীরু পায়, চম্পা পারুল যুথী টগর চামেলা, জানি জানি প্রিয় এ জীবনে মিটিবে না সাধ, মোরা আর জনমে, ঝরা ফুল দলে কে অতিথি, ঝিলের জলে কে ভাসাল নীল শালুকের ভেলা, তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরিগো সকল ফুলের মাঝে, তুমি আমার সকাল বেলার সুর, আমায় নহে গো ভালোবাস শুধু ভালোবাস মোর গান, আমি গগন গহনে সন্ধ্যাতারা, অনেক ছিল বলার, অনেক কথা বলার মাঝে, আজ শেফালির গায়ে হলুদ, আজো ফোটেনি কুঞ্জে মম কুসুম, আধখানা চাঁদ হাসিছে আকাশে, আমার গানের মালা আমি করব কারে দান, আমার ঘরের মলিন দীপালোকে, আমার নয়নে নয়ন রাখি, আমার ভুবন কান পেতে রয় প্রিয়তম তব লাগিয়া, আমার সুরের ঝর্নাধারায় করবে তুমি স্নান, আমি চাঁদ নহি চাঁদ নহি অভিশাপ, আমি চিরতরে দূরে চলে যাব, আমি পূরব দেশের পুরনারী, আমি যার নূপুরের ছন্দ, আমি যেদিন রইব না গো লইব চিরবিদায়, আমি সন্ধ্যামালতী বনছায়া অঞ্চলে, আরো কত দিন বাকি, এখনো ওঠেনি চাঁদ এখনো ফোটেনি তারা, এস প্রিয় মন রাঙায়ে ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙায়ে, ওগো প্রিয় তব গান, ওরে শুভ্র বসনা রজনীগন্ধা বনের বিধবা মেয়ে, কথা কও কও কথা থাকিও না চুপ করে, সবার কথা কইলে কবি, কলঙ্ক আর জোছনায় মেশা তুমি সুন্দর চাঁদ, কার মঞ্জীর ঝিনিঝিনি বাজে, কে নিবি ফুল কে নিবি ফুল, ভীরু এ মনের কলি, কেন মনোবনে মালতী বল্লরী দোলে, খেলা শেষ হলো শেষ হয় নাই বেলা, আসে রজনী সন্ধ্যামণির প্রদীপ জ্বলে, আয় বনফুল ডাকিছে মলয়, আঁখি ঘুম ঘুম নিশীথ নিঝুম ঘুমে ঝিমায়,

একাদশীর চাঁদরে ঐ রাঙা মেঘের পাশে, তুমি আর একটি দিন থাকো, তুমি কি আসিবে না, তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয় সে কি মোর অপরাধ, তুমি হাতখানি যবে রাখ মোর হাতের পরে, তোমার আকাশে উঠেছিনু চাঁদ, তোমার হাতের সোনার রাখি, তোমার বিনা তারের গীতি বাজে আমার, বঁধু আমি ছিনু বুঝি বৃন্দাবনের রাধিকার আঁখি জলে, বঁধু মিটিল না সাধ ভালোবাসিয়া তোমায়, বাসন্তী রঙ শাড়ি পরো, বিকাল বেলার ভূঁই-চাপা গো সকাল বেলার জুঁই, বেণুকার বনে কাঁদে বিধুর, বেলওয়ারী চুড়ি কে নিবি আয় পুরনারী, ভোরের স্বপনে কে তুমি দিয়ে দেখা, মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে, মোমতাজ! মোমতাজ তোমার তাজমহল, দূর দ্বীপবাসিনী, দোপাটিলো করবী নাই সুরভি রূপ আছে, নন্দনবন হতে কে গো ডাকো মোরে আধ-নিশীথে, নয়নভরা জল গো তোমার, নাই চিনিলে আমায় তুমি রইব আধেক চেনা, নাই পরিলে লাটেন খোঁপায়, নিশি না পাহোতে যেয়ো না, নূরজাহান নূরজাহান ! সিন্ধু নদীতে ভেসে, পায়ে বিঁধেছে কাঁটা সজনী ধীরে চল, প্রজাপতি! প্রজাপতি! কোথায় পেলে ভাই এমন রঙীন পাখা, প্রিয়তম হে বিদায়, ফুলের মতন ফুল্ল মুখে, বনের তাপস কুমারী আমি গো, বলেছিলে তুমি তীর্থে আসিবে আমার তনুর তীরে, মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে নেচে, মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী, মোরা আর জনমে হংস মিথুন ছিলাম, মোরে ভালোবাসায় ভুলিয়ো না, মৌরী ফুলের মিঠে সুবাস, যত ফুল তত ভুল কণ্টক জাগে, যবে তুলসীতলায় প্রিয় সন্ধ্যাবেলায়, যবে ভোরের কলি মেলিবে আঁখি, যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই, যেদিন আমি হারিয়ে যাব, রুমঝুম ঝুমঝুম রুমঝুম ঝুম, লায়লী তোমার এসেছে ফিরিয়া, শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে, শুকনো পাতার নূপুর পায়ে, সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়, সাঁঝের আঁচলে রহিল হে প্রিয় ঢাকা, সাঁঝের পাখিরা ফিরিল কুলায়, হাসিমুখে বাসিফুল ফেলে দাও ভোরে প্রভৃতি। বাংলা কাব্যসংগীতের ধারায় অবিস্মরণীয় সৃষ্টি হিসেবে সুদীর্ঘকাল বিবেচিত হয়ে আসছে নজরুলের এমন সব আধুনিক গান।

নজরুলের নিজস্ব সুরারোপিত আধুনিক গানঃ

নজরুলের যেসব গানের সুরদান তিনি তাঁর আপন হাতেই করেছেন, সেসব গানে আরও বেশি অনুভূত হয় প্রিয় কবির অস্তিত্ব। নজরুলের নিজের সুর করা অধুনিক গানের মধ্যে– অনেক ছিল বলার যদি সেদিন, অনেক কথা বলার মাঝে, আজ শ্রাবণের লঘু মেঘের সাথে, আমার আছে এই কখানি গান, আমার কথা লুকিয়ে থাকে, আন্ গোলাপ-পানি আন্ আতরদানি, আমায় নহে গো ভালোবাসো শুধু, আমি গগন গহনে সন্ধ্যাতারা, আমি সন্ধ্যামালতী বনছায়া অঞ্চলে, আমি সুন্দর নহি জানি, আমি সূর্যমুখী ফুলের মতো, আসে রজনী সন্ধ্যামনির প্রদীপ, একলা গানের পায়রা উড়াই, এলো ঐ পূর্ণশশী ফুল জাগানো, এসো বঁধু ফিরে এসো, এসো প্রিয় এসো প্রাণে, ওগো প্রিয়

তব গান, কত আর এ মন্দির দ্বার, কত নিদ্রা যাও রে কন্যা, কথা কও কও কথা, কদম কেশর পড়ল ঝরি, কার মঞ্জীর রিনিঝিনি বাজে, কে নিবি ফুল নিবি ফুল, কেন কাঁদে পরাণ, কোন দূরে ওকে যায়, গহীন রাতে ঘুম কে এলে ভাঙাতে, গত রজনীর কথা মনে পড়ে, গাঙে জোয়ার এলো ফিরে, গুন গুনিয়ে ভ্রমর এলো, চঞ্চল শ্যামল এলো গগনে, জানি জানি তুমি আসিবে, টল মল টল মল টলে সরসী, ডাকতে তোমায় পারি যদি, ঝিলের জলে কে ভাসালো, তুমি আমায় যবে জাগাও গুণী, তুমি আমার সকাল বেলার সুর, তুমি কি আসিবে না, তুমি কি নিশীথ চাঁদ, তুমি কেন এলে পথে, তুমি প্রভাতের সকরুণ ভৈরবী, তুমি শুনিতে চেয়ো না, তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি, দিনগুলি মোর পদ্মেরই দল, তোমার বিনা তারের গীতি, তোমারেই আমি চাহিয়াছি প্রিয়, থৈ থৈ জলে ডুবে গেছে পথ, নতুন পাতার নূপুর বাজে, নদীর স্রোতে মালার কুসুম, মোর না মিটিতে আশা ভাঙ্গিল খেলা, নিশিদিন তব ডাক শুনিয়াছি, নিশি ভোরে অশান্ত ধারায়, নূরজাহান নূরজাহান, পথিক বন্ধু এসো এসো, পূবালী পবনে বাঁশি বাজে, প্রিয় কোথায় তুমি কোন গহনে, প্রিয়তম এত প্রেম দিও না গো, প্রিয়তম হে বিদায়, ফিরিয়া যদি সে আসে, ফিরে এসো ফিরে এসো প্রিয়তম, ফুটলো যেদিন ফালগুনে হায়, ফুল কিশোরী জাগো জাগো, ফুল ফুটেছে কয়লা ফেলা ময়লা, বনমালীর ফুল জোগালি, বনের তাপস কুমারী আমি গো, বন্ধু পথ চেয়ে চেয়ে, বল্লরীভূজ বন্ধন খোল, বঁধু তোমার আমার এই যে বিরহ, বনফুলের তুমি মঞ্জরি গো, বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ, বিধুর তব অধর কোনে, বুনো ফুলের করুণ সুবাস ঝরে, বেদনার পারাবার করে হাহাকার, বেল ফুল এনে দাও, ব্যথার উপর বঁধু ব্যথা দিও না, ভেঙ্গো না ভেঙ্গো না বঁধু, ভোরের স্বপনে কে তুমি দিলে দেখা, মম মায়াময় স্বপনে, মমতাজ মমতাজ তোমার তাজমহল, মরম কথা গেল সই মরমে মরে, মালতী মঞ্জুরী ফুটিবে যবে, মালা যদি মোর ধুলায় মলিন, ম্লান আলোকে ফুটলি কেন, মোর দুখ নিশি কবে হবে ভোর, মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী, মোর ভুলিবার সাধনায়, মোরা ছিনু একেলা, যখন আমার গান ফুরাবে, যবে ভোরের কুন্দকলি, যবে তুলসী তলায় প্রিয় সন্ধ্যাবেলায়, যাইগো চলে যাই, যাও যাও তুমি ফিরে, যাও মেঘদূত দিও প্রিয়ার হাতে, যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পারো নাই, শ্রাবণ রাতের আঁধার নিরালা, সকরুণ নয়নে চাহ, সই ভালো করে বিনোদ বেণী, সাঁঝের পাখিরা ফিরিল কুলায়, হৈমন্তিকা এসো এসো, খ্যাপা হাওয়াতে মোর আঁচল উড়ে প্রভৃতি।

নজরুলের সুরারোপিত কিছু আধুনিক গানের পূর্ণবাণী

১.

আমি সূর্যমুখী ফুলের মতো দেখি তোমায় দূরে থেকে

দলগুলি মোর রেঙে ওঠে তোমার হাসির কিরণ মেখে ॥

নিত্য জানাই প্রেম-আরতি

যে পথে, নাথ, তোমার গতি

ওগো আমার ধ্রুবজ্যোতি সাধ মেটে না তোমায় দেখে ॥

জানি, তুমি আমার পাওয়ার বহু দূরে, হে দেবতা

আমি মাটির পূজারিণী, কেমন করে জানাই ব্যথা।

সারাজীবন তবু স্বামী

তোমার ধ্যানেই কাঁদি আমি

সন্ধ্যাবেলায় ঝরি যেন তোমার পানে নয়ন রেখে ॥

২.

তুমি আমার সকাল বেলার সুর

হৃদয় অলস-উদাস-করা অশ্রু ভরাতুর ॥

ভোরের তারার মতো তোমার সজল চাওয়ায়

ভালোবাসার চেয়ে সে যে কান্না পাওয়ায়

রাত্রি-শেষের চাঁদ তুমি গো বিদায়-বিধুর ॥

তুমি আমার ভোরের ঝরা ফুল

শিশির-নাওয়া শুভ্র-শুচি পূজারিণীর তুল।

অরুণ তুমি, তরুণ তুমি, করুণ তারো চেয়ে

হাসির দেশে তুমি যেন বিষাদ-লোকের মেয়ে

তুমি ইন্দ্র-সভার মৌন-বীণা নীরব নূপুর ॥

৩.

তুমি কি আসিবে না

বলেছিলে তুমি আসিবে আবার ফুটিবে যবে হেনা ॥

সেদিন ঘুমায়ে ছিল যে মুকুল

আজি সে পূর্ণ বিকশিত ফুল

সেদিনের ভীরু অচেনা হৃদয় আজি হতে চায় চেনা ॥

ঘনপল্লব গুণ্ঠন ঢাকা ছিল সেদিন যে লতা

আজিকে পুষ্প নিবেদন লয়ে কহিতে চায় যে কথা।

প্রদীপ জ্বালায়ে আজি সন্ধ্যায়

পথ চেয়ে আছি তোমারি আশায়

পূর্ণিমা-তিথি আসিল, হে চাঁদ-অতিথি আসিলে না ॥

৪.

মোর না মিটিতে আশা ভাঙিল খেলা

জীবন প্রভাতে এলো বিদায়বেলা ॥

আঁচলের ফুলগুলি করুণ নয়ানে

নিরাশায় চেয়ে আছে মোর মুখপানে,

বাজিয়াছে বুকে যেন, কার অবহেলা ॥

আঁধারের এলোকেশ দু' হাতে জড়ায়ে

যেতে যেতে নিশীথিনী কাঁদে বনছায়ে।

বুঝি দুখ-নিশি মোর হবে না হবে না ভোর

ভিড়িবে না কূলে মোর বিরহের ভেলা ॥

৫.

পথিক বন্ধু এসো এসো পাপড়ি ছাওয়া পথ বেয়ে

মন হয়েছে উতলা গো তোমার আসার পথ চেয়ে ॥

আকাশ জুড়ে আলোর খেলা বসুন্ধরায় ফুলের মেলা

রঙিন মেঘের ভাসলো ভেলা তোমারই আসার আভাস পেয়ে ॥

সাধ জাগে ঐ পথে তোমার পেতে রাখি মনপ্রাণ

চলতে গিয়ে দলবে তারে চরণ ছোঁয়া করিবে দান।

তোমার ধ্যানে, হে রাজাধিরাজ সাজ ভুলেছি ভুলেছি কাজ

আসবে তুমি সেই খুশিতে আছে আমার মন ছেয়ে ॥

৬.

মোরা ছিনু একেলা, হইনু দু'জন

সুন্দরতর হলো নিখিল ভুবন ॥

আজি কপোত-কপোতী শ্রবণে কুহরে

বীণা বেণু বাজে বন-মর্মরে

নির্ঝর-ধারে সুধা চোখে মুখে ঝরে

নূতন জগৎ মোরা করেছি সৃজন ॥

মরিতে চাহি না, পেয়ে জীবন-অমিয়া

আসিব এ কুটিরে আবার জনমিয়া

আরো চাই আরো চাই অশেষ জীবন।

আজি প্রদীপ-বন্দিনী আলোক-কন্যা

লক্ষ্মীর শ্রী লয়ে আসিল অরণ্যা

মঙ্গল-ঘটে এলো নদীজল-বন্যা

পার্বতী পরিয়াছে গৌরী-ভূষণ ॥

৭.

সাঁঝের পাখিরা ফিরিল কুলায় তুমি ফিরিলে না ঘরে

আঁধার ভবন জ্বলেনি প্রদীপ মন যে কেমন করে ॥

উঠানে শূন্য কলসির কাছে সারাদিন ধরে ঝরে পড়ে আছে

তোমার দোপাটি গাঁদা ফুলগুলি যেন অভিমান ভরে ॥

বাসন্তী রাঙা শাড়িখানি তব ধূলায় লুটায় কেঁদে

তোমার কেশের কাঁটাগুলি বুকে স্মৃতির সমান বেঁধে।

যাইনি বাহিরে আজ সারাদিন ঝরিছে বাদল শ্রান্তিবিহীন

পিয়া পিয়া বলে ডাকিছে পাপিয়া এ বুকের পিঞ্জরে

৮.

মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী দেবো খোঁপায় তারার ফুল

কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির চৈতী চাঁদের দুল ॥

কণ্ঠে তোমার পরাব বালিকা

হংস-সারির দুলানো মালিকা

বিজলী জরীণ ফিতায় বাঁধিব মেঘরঙ এলো চুল ॥

জোছনার সাথে চন্দন দিয়ে মাখাব তোমার গায়

রামধনু হতে লাল রঙ ছানি আলতা পরাব পায়।

আমার গানের সাত সুর দিয়া

তোমার বাসর রচিব প্রিয়া

তোমারে ঘেরিয়া গাহিবে আমার কবিতার বুলবুল ॥

৯.

তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়

সে কি মোর অপরাধ

চাঁদেরে হেরিয়া কাঁদে চকোরিণী বলে না তো কিছু চাঁদ ॥

চেয়ে চেয়ে দেখি ফোটে যবে ফুল

ফুল বলে না তো সে আমার ভুল

মেঘ হেরি ঝুরে চাতকিনী মেঘ করে না তো প্রতিবাদ ॥

জানে সূর্যেরে পাবে না তবু অবুঝ সূর্যমুখী

চেয়ে চেয়ে দেখে তার দেবতারে দেখিয়াই সে যে সুখী।

হেরিতে তোমার রূপ-মনোহর

পেয়েছি এ আঁখি, ওগো সুন্দর

মিটিতে দাও হে প্রিয়তম মোর নয়নের সেই সাধ।

১০.

ওগো প্রিয়, তব গান

আকাশ-গাঙের জোয়ারে উজান বহিয়া যায়

মোর কথাগুলো কাঁদিছে

বুকের দুয়ারে পথ খুঁজে নাহি পায় ॥

ওগো দখিনা বাতাস, ফুলের সুরভি বহ

ওর সাথে মায়ের না-বলা বাণী লহ

ওগো মেঘ, তুমি মোর হয়ে গিয়ে কহ

বন্দিনী গিরি ঝরনা পাষাণ-তলে

যে কথা কহিতে চায় ॥

ওরে ও সুরমা, পদ্মা,

কর্ণফুলী তোদের ভাটির স্রোতে

নিয়ে যা আমার না-বলা কথাগুলি

ধুয়ে মোর বুক হতে।

ওরে চোখ গেল বউ কথা কও পাখি

তোদের কণ্ঠে মোর সুর, যাই রাখি কি

(ওরে) মাঠের মুরলী কহিব তাহারে ডাকি

আমার গানের কলি না-ফোটা বুলি ঝরে গেল নিরাশায় ॥

১১ .

আমি গগন গহনে সন্ধ্যা-তারা

কনক গাঁদার ফুল গো

গোধূলির শেষে হেসে উঠি আমি এক নিমেষের ভুল গো ॥

আমি ক্ষণিকা আমি সাঁঝের অধরে

ম্লান আনন্দ-কণিকা

আমি অভিমানিনীর খুলে ফেলে দেওয়া মণিকা

আমি দেব-কুমারীর দুল গো ॥

আলতা রাখার পাত্র আমার আধখানা চাঁদ ভাঙা

তাহারি রং গড়িয়ে পড়ে (ঐ) অস্ত-আকাশ রাঙা।

আমি এক মুঠো আলো

কৃষ্ণা-সাঁঝের হাতে

আমি নিবেদিত ফুল আকাশ-নদীতে রাতে

ভাসিয়া বেড়াই যাঁর উদ্দেশে গো তার পাই না চরণ-মূল ॥

১২.

আজ শ্রাবণের লঘু মেঘের সাথে

মন চলে মোর ভেসে

রেবা নদীর বিজন তীরে মালবিকার দেশে ॥

মন ভেসে যায় অলস হাওয়ায়

হালকা-পাখা মরালী-প্রায়

বিরহিণী কাঁদে যথা একলা এলোকেশে ॥

কভু মেঘের পানে কভু নদীর পানে চেয়ে

লুকিয়ে যথা নয়ন মোছে গাঁয়ের কালো মেয়ে

একলা বধূ বসে থাকে যথায় বাতায়নে বাদল দিনের শেষে ॥

নজরুলের রচিত আধুনিক গানে বিভিন্ন সুরকার

কাজী নজরুল ইসলামের রচিত বিচিত্র ধারার গানের মধ্যে আধুনিক পর্যায়ের গানেও নজরুল ছাড়া বিভিন্ন সুরকারের সুর পাওয়া যায়। সেই বিখ্যাত সুরকারদের মধ্যে– কমল দাশগুপ্ত, অনিল বাগচী, গিরীন চক্রবর্তী, তুলসী লাহিড়ী, চিত্ত রায়, নরেন মুখোপাধ্যায়, সুবোধ দাশগুপ্ত, কে মল্লিক, গোপাল সেন, রণজিৎ রায়, নিতাই ঘটক, সুবল দাশগুপ্ত, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, ধীরেন দাস, সুখময় গাঙ্গুলী, ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, জগন্ময় মিত্র, ভীস্মদেব চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল কান্তি ঘোষ, জ্ঞান দত্ত, বিমল দাশগুপ্ত, রাইচাঁদ বড়াল, হিমাংশু দত্ত, নীলমনি সিংহ, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, গোপেন মল্লিক, রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শচীন চক্রবর্তী, দুর্গা সেন, অনিল ভট্টাচার্য, শ্রীমতি মোহিনী সেনগুপ্ত, সুরেশ চৌধুরী, সত্যেন চক্রবর্তী, সত্য চৌধুরী, কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়, পঙ্কজ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, মনোরঞ্জন সেন, অধীর বাগচী, নৃপেন মজুমদার প্রমুখ।

কমল দাশগুপ্তের সুরে নজরুলের আধুনিক গান

আমার ভুবন কান পেতে রয়, আধখানা চাঁদ হাসিছে আকাশে, আজ নিশীথে অভিসার আমার মালায় লাগুক তোমার, আমার সকল আকাশ ভরল, আমি যার নূপুরের ছন্দ, আরো কতদিন বাকি, এখনো ওঠেনি চাঁদ, এসো প্রিয় মন রাঙায়ে, ওরে শুভ্রবসনা রজনীগন্ধা, কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও, কলঙ্ক আর জোছনায় মেশা, ভীরু এ মনের কলি কেন ফোটালে না, খেলা শেষ হলো শেষ হয় নাই বেলা, গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়, চম্পা পারুল যুথি, কেন মনবনে মালতি বল্লরী, জানি জানি প্রিয় এ জীবনে মিটিবে না সাধ, মনে রাখার দিন গিয়েছে, তুমি আরেকটি দিন থাকো, তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরি গো, তব গানের ভাষায় সুরে, তুমি হাতখানি যবে, দীপ নিভিয়াছে ঝড়ে, নয়নে নিদ নাহি, মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে, বঁধু আমি ছিনু বুঝি, মুখে কেন নাহি বলো, লায়লী তোমার এসেছে ফিরিয়া, তুমি আমার সকাল বেলার সুর, লায়লী লায়লী ভাঙিও না ধ্যান, হে প্রিয় তোমার আমার মাঝে, বঁধু মিটিল না সাধ, তোমার হাতের সোনার রাখি।

কমল দাশগুপ্তের সুরারোপিত নজরুলের কয়েকটি আধুনিক গানের পূর্ণবাণী

১.

আমার ভুবন কান পেতে রয় প্রিয়তম তব লাগিয়া

দীপ নিভে যায়, সকলে ঘুমায় মোর আঁখি রহে জাগিয়া ॥

তারারে শুধাই কত দেরি আর কখন আসিবে বিরহী আমার

ওরা বলে হের পথ চেয়ে তার নয়ন উঠেছে রাঙিয়া ॥

আসিতেছে সে কি মোর অভিসারে কাঁদিয়া শুধাই চাঁদে

মোর মুখপানে চেয়ে চেয়ে চাঁদ নীরবে শুধু কাঁদে।

ফাগুন বাতাস করে হায় হায়

বলে, বিরহিণী তোর নিশি যে পোহায়

ফুল বলে, আর জাগিতে নারি গো

ঘুমে আঁখি আসে ভাঙিয়া ॥

২.

আরো কতদিন বাকি

তোমারে পাওয়ার আগে বুঝি হায়! নিভে যায় মোর আঁখি ॥

কত আঁখি-তারা নিভিয়া গিয়াছে কাঁদিয়া তোমার লাগি

সেই আঁখিগুলি তারা হয়ে আজো

আকাশে রয়েছে জাগি যেন নীড়-হারা পাখি।

যত লোকে আমি তোমারি বিরহে ফেলেছি অশ্রুজল

ফুল হয়ে সেই অশ্রু ছুঁইতে চাহে, চাহে তব পদতল

সে-সাধ মিটিবে নাকি ॥

৩.

দীপ নিভিয়াছে ঝড়ে জেগে আছে মোর আঁখি।

কে যেন কহিছে কেঁদে মোর বুকে মুখ রাখি

পথিক এসেছ না কি ॥

হারায়ে গিয়েছে চাঁদ জল-ভরা কালো মেঘে

আঁচলে লুকায়ে ফুল বাতায়নে আছি জেগে

শূন্য গগনে দেয়া কহিতেছে যেন ডাকি

পথিক এসেছ না কি ॥

ভাঙ্গিয়া দুয়ার মম কাড়িয়া লইতে মোরে

এলে কি ভিখারি ওগো প্রলয়ের রূপ ধরে

ফুরাইয়া যায় বঁধু শুভ-লগনের বেলা

আনো আনো ত্বরা করি ওপারে যাবার ভেলা

পিয়া পিয়া বলে বনে ঝুরিছে পাপিয়া পাখি

পথিক এসেছ না কি ॥

৪.

ভীরু এ মনের কলি ফোটালে না কেন ফোটালে না

জয় করে কেন নিলে না আমারে, কেন তুমি গেলে চলি ॥

ভাঙ্গিয়া দিলে না কেন মোর ভয়

কেন ফিরে গেলে শুনি অনুনয়

কেন সে বেদনা বুঝিতে পার না মুখে যাহা নাহি বলি ॥

কেন চাহিলে না জল নদী তীরে এসে

অকরুণ অভিমানে চলে গেলে মরু-তৃষ্ণার দেশে।

ঝোড়ো হাওয়া ঝরা পাতারে যেমন

তুলে নেয় তার বক্ষে আপন

কেন কাড়িয়া নিলে না তেমনি করিয়া মোর ফুল অঞ্জলি ॥

৫.

মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে

বিদায় সন্ধ্যাবেলা

আমি দাঁড়ায়ে রহিনু এপারে তুমি ওপারে ভাসালে ভেলা ॥

সেই সে বিদায় ক্ষণে

শপথ করিলে বন্ধু আমার,

রাখিবে আমারে মনে

ফিরিয়া আসিবে খেলিবে আবার সেই পুরাতন খেলা ॥

আজো আসিলে না হায়,মোর অশ্রুর লিপি বনের বিহগী

দিকে দিকে লয়ে যায় তোমারে খুঁজে না পায়।

মোর গানের পাপিয়া ঝুরে

গহন কাননে তব নাম লয়ে

আজো পিয়া পিয়া সুরে

গান থেমে যায় হায় ফিরে আসে পাখি বুকে বিঁধে অবহেলা ॥

সুরকার চিত্ত রায়ের সুরারোপিত নজরুলের আধুনিক গান

নয়ন ভরা জল গো তোমার, একাদশীর চাঁদ রে ঐ, এসো এসো পাহাড়ি ঝর্ণা, আয় বনফুল ডাকিছে মলয়, যত ফুল তত ভুল প্রভৃতি।

চিত্ত রায়ের সুরারোপিত কিছু আধুনিক গানের পূর্ণবাণী

১.

নয়ন ভরা জল গো তোমার আঁচল ভরা ফুল

ফুল নেব না, অশ্রু নেব ভেবে হই আকুল ॥

ফুল যদি নিই তোমার হাতে

জল রবে না নয়ন পাতে

অশ্রু নিলে ফুটবে না আর প্রেমের মুকুল ॥

মালা যখন গাঁথ তখন পাওয়ার সাধ যে জাগে

মোর বিরহে কাঁদ যখন আরো ভালো লাগে

পেয়ে তোমায় যদি হারাই

দূরে দূরে থাকি গো তাই

ফুল ফোটায়ে যাই গো চলে চঞ্চল বুলবুল ॥

২.

আয় বনফুল ডাকিছে মলয়

এলোমেলো হাওয়ায় নূপুর বাজায়, কচি কিশলয় ॥

তোমরা এলে না বলে ভোমরা কাঁদে

অভিমানে মেঘ ঢাকিল চাঁদে

ভুল বঁধু ভুল টুলটুলে মৌটুসী বুলবুলে কয় ॥

কুহু যামিনীর তিমির টুটে

মুহু মুহু কুহু কুহরি ওঠে।

হে বন-কলি, গুণ্ঠন খোলো

হে মৃদু-লজ্জিতা, লজ্জা ভোলো

কোথা তার দুল দোলে নটিনী তটিনী খুঁজে বনময় ॥

নিতাই ঘটকের সুরারোপিত নজরুলের আধুনিক গান

আজকে গানের বান এসেছে, ঘুমাও ঘুমাও দেখিতে এসেছি, তোমার আঁখির মতো আকাশের দুটি তারা, মোরে ডেকে লও সেই দেশে, গভীর নিশিতে জাগি, নদীর স্রোতে মালার কুসুম প্রভৃতি।

শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে নজরুলের আধুনিক গান

আমায় নহে গো, আকাশে ভোরের তারা, গানগুলি মোর আহত পাখির সম, উপল নুড়ির কাঁকন-চুড়ি, ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে, চৈতি চাঁদের আলো, মোরে ভালোবাসায়, সেদিনও বলেছিলে প্রভৃতি।

নজরুলের গান রেকর্ড করেছেন এমন কমপক্ষে ৩৩১ জন শিল্পীর নাম পাওয়া যায়। ২১৬০টি রেকর্ডকৃত গানের মধ্যে ৯৮ টি গান রেকর্ড করে মৃণাল কান্তি ঘোষ সবথেকে বেশি গান রেকর্ডের নাম করেছেন। শিল্পীরা রেকর্ডের ক্ষেত্রে একাধিক জায়গায় ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। যেমন:

কে মল্লিক– মহম্মদ কাশেম/ মহ.কাশেম/মানু মিঞা/মনু মিঞা/শংকর।

গিরীন চক্রবর্তী–গোলাম হায়দার/সুজন মাঝি/রতন মাঝি/সোনা মিঞা।

চিত্ত রায়– দেলওয়ার হোসেন/দিলওয়ার হোসেন।

কাজী নজরুল ইসলামের গানে প্রায় পঞ্চাশেরও অধিক সুরকার সুর করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবথেকে বেশি সুর করেছেন কমল দাশগুপ্ত, চিত্ত রায়, নিতাই ঘটক, কে মল্লিক, মোহিনী সেনগুপ্ত, রনজিৎ রায়, জ্ঞান দত্ত, দুর্গা সেন, সুবল দাশগুপ্ত, গিরীন চক্রবর্তী, সত্যেন চক্রবর্তী, ধীরেন দাস, হিমাংশু দত্ত প্রমুখ। নজরুলের গানের সব থেকে বেশি স্বরলিপি করেছেন জগৎ ঘটক, নিতাই ঘটক, কাজী অনরুদ্ধ, মনোরঞ্জন সেন। বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের প্রচেষ্টায় নজরুল ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে আমাদের দেশে নজরুলের গানের আদি রেকর্ড ভিত্তিক গানের স্বরলিপি প্রণয়ন সবচেয়ে বেশি করেছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রী সুধীন দাশ। কলকাতার এগারোটি গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানিতে কাজী নজরুল ইসলাম সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন সেসময়। সবচেয়ে বেশি গান যাঁরা রেকর্ড করেছেন– মৃণাল কান্তি ঘোষ, রাধারানী, রণজিৎ রায়, যূথিকা রায়, ধীরেন দাস, বীণাপাণি, পারুল সেন, হরিমতি, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, রাধারানী, শৈল দেবী প্রমুখ।

নজরুলের আধুনিক শ্রেণির গীতরচনার সংখ্যা বিপুল। নজরুল তাঁর অনেক গানের শিরোদেশে মডার্ন **(Modern)** কথাটিও লিখে দিয়েছিলেন। আধুনিক বাংলা গানের মুখ্য বিষয়বস্তুরূপে নজরুল তথা সমসাময়িক গীতরচয়িতারা প্রেমকেই গ্রহণ করেছিলেন। এই গীতধারায় নর-নারীর ভালোবাসার পরিপূর্ণ অনুষঙ্গ রূপায়িত হয়। জগৎচিত্র ও জীবনবোধ নজরুলের আধুনিক গানে, সৌন্দর্য সুষমায় সাবলীলভাবে রূপায়িত হয়েছিল। আধুনিক গানের বক্তব্য ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে কবির যে রূপকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে, সেখানে মর্তবাসী নর-নারীর যৌবন স্পন্দিত অনুভূতিমালার সমারোহ। শ্রোতৃচিত্ত সচেতন একজন সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন নজরুল। তাঁর গান রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, গানকে সুরের ভুবনে স্থায়ী আসন দেয়া। গান রচনার সময় শ্রোতার দাবি সহজেই তাঁর গানে প্রকাশ পেত। নজরুলের রচিত আধুনিক গানের মতো সুর ও বাণীর এমন মধুর ও আশ্চর্য মাধুর্যে বাংলা গান খুব কমই রূপায়িত হয়েছে। বাংলা গানের ইতিহাসে বাঙালি সঙ্গীত রচয়িতারা কাজী নজরুল ইসলামের মতো অকুণ্ঠ অভিনন্দনসিক্ত, শ্রুতি সুখকর গান, খুবই কম রচনা করেছেন। শ্রোতাভিমুখী সঙ্গীত রচনা করে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা গানে নতুন যুগের সূচনা করেছেন। বাণী ও সুর রচনায় এনেছিলেন সত্যিকারের পেশাদারী দক্ষতা। কোথাও কোথাও নিজের লেখা গানে অন্যকে দিয়ে সুরও করে নিয়েছেন নজরুল। সে কারণেই পূর্ববর্তী ধারার শেষ প্রধান প্রতিনিধি এবং অপরদিকে আধুনিক যুগেরও প্রধান সঙ্গীতস্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম। মূলকথা নজরুল বিগত যুগ ও বিকাশমান যুগের সেতুবন্ধনসম সঙ্গীতকার।

তথ্যনির্দেশ

১. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *নজরুল রচনাবলী- অষ্টম খণ্ড*, বাংলাএকাডেমি, ঢাকা, ২৮শে আগস্ট ২০০৮; পৃষ্ঠা ৩১

২. করুণাময় গোস্বামী, *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬; পৃষ্ঠা ২৮৭

৩. সুধীর চক্রবর্তী, *শত শত গীত মুখরিত*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, মে ২০১৮; পৃষ্ঠা ২১৪

৪. আবদুল আহাদ, *আসা-যাওয়ার পথের ধারে*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, আগস্ট ২০১৪; পৃষ্ঠা ১৬৩, ১৬৪

৫. মোহাম্মদ আবুল খায়ের, *নজরুল সংগীতে নান্দনিকতা*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৪; পৃষ্ঠা ১১৩

৬. মোহাম্মদ আবুল খায়ের, *নজরুল সংগীতে নান্দনিকতা*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৪; পৃষ্ঠা ১০০

৭. করুণাময় গোস্বামী, *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬; পৃষ্ঠা ২৮৯, ২৯০

৮. ইদ্‌রিস আলী, *নজরুল সংগীতের সুর*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, জুন ১৯৯৭; পৃষ্ঠা ৭১, ৭২

৯. ইদ্‌রিস আলী, *নজরুল সংগীতের সুর*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৬

১০. সন্তোষ সেনগুপ্ত, *আমার সঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক জীবন*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, বইমেলা ১৯৮৬; পৃষ্ঠা ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬

১১. ড.বাঁধন সেনগুপ্ত, *কবি নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পুনশ্চ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০; পৃষ্ঠা ৮৮, ৯০।

তৃতীয় অধ্যায়

নজরুল ও অন্যান্য সঙ্গীতকারদের আধুনিক গানের মধ্যে তুলনা

কাজী নজরুল ইসলামের সমকালীন সকল সঙ্গীতকারের গানেই শ্রোতাদের মনে প্রশান্তি এনেছে তবে অপেক্ষাকৃত কাজী নজরুল ইসলামের আধুনিক ধারার গান মানুষের মনের সন্তুষ্টি বিধান একটু বেশি করেছে। কথা ও সুরের একটি শোভন মাত্রাগত অনুপাত দিয়ে বাংলা গানের একটি সার্বজনীন ধরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে অতুলপ্রসাদ সেন হয়ে কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত প্রত্যেকেই। প্রায় কাছাকাছি দশকের গীত রচয়িতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের প্রত্যেকের গানের চরিত্র আলাদা। প্রেম, পূজা ও স্বদেশ পর্যায়ের গানের প্রসঙ্গই ছিল মূলত পঞ্চ গীতিকবির রচনার বিষয়। প্রয়োগ ক্ষেত্রের স্বাতন্ত্র্যতা, শ্রোতা ও পরিবেশ এসবের মূল কারণ। সমকালীন পেশাদারী মঞ্চের প্রয়োজনে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গরিষ্ঠসংখ্যক গান রচনা করা হয়েছে সে সময়। পল্লীবাংলার সীমায়িত বাতাবরণে আবদ্ধ রজনীকান্তের করুণ ভক্তিভাবের গান বাঙালি শ্রোতার মন করুণ রসে পরিপূর্ণ করেছে। অতুলপ্রসাদ সেনের নিভৃত অবকাশে লেখা আত্মবেদনার শুশ্রুষামূলক আর্তিময় গান আমাদের অন্তরের সন্তাপকে বাণীময় করেছে। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন গীতিকারদের মধ্যে রবীন্দ্রভাব ও রূপে আত্মনিমজ্জনের ফলে গীতিকাব্যের ধরনে এক ধরনের সমতল রকম সাদৃশ্য প্রতীয়মান। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গানের সিদ্ধিলাভ এবং গানের পৌরুষদীপ্ততা, রজনীকান্ত সেনের গানের আত্মদীনতার উচ্চারণ ও অকপট ভক্তিভাব, অতুলপ্রসাদের গানের আত্ম-বেদনার দহন বাংলা গানের শ্রীবৃদ্ধি ও ভাবলাবণ্য সংযোজন করেছে। গায়নরীতি ও রূপবন্ধতে ব্যতিক্রমী ছিলেন নবসঙ্গীতকাররা এবং রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত গানের সঞ্চারী এঁরা গ্রহণ করেননি কেউ কেউ। গানের সুরবিহারের স্বাধীনতা গায়নরীতিতে মেনে নিয়েই গান রচনায় সাহস সঞ্চার করে এক ধরনের বিপ্রতীপ পথেই এগিয়েছেন। আগেকার গানের রূপরীতি প্রকৃতভাবে সমীকৃত হিন্দুস্তানি সঙ্গীতের সর্বব্যাপী দাপট প্রতিহত হয়েছে আধুনিক গানে। নবকালের নবীন গান যেন হাতে পেয়েছেন শিষ্ট বাঙালিরা। আন্তরিক হৃদয়ভাবের অনুভবে বাঙালিরা কণ্ঠে তুলে নেয় তাঁদের এ গান। গানের ক্ষেত্রে নজরুলের ঘনিষ্ঠ সমকালীন ছিলেন অন্য চারজন সঙ্গীতকার– সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, দিলীপ কুমার রায় এবং তুলসী লাহিড়ী। স্রষ্টার একক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ভেঙে গিয়ে বাংলা গানে প্রচলন শুরু হলো বিভাজিত শিল্পের। নিভৃতে - সমাবেশে সুখে-আনন্দে সর্বব্যাপী আধুনিক গানের সুবাতাস ভরা জয়ধ্বনি বইতে শুরু হলো। সঙ্গীত রচনায় প্রবল

প্রতাপসম্পন্ন গীতিকার সুরকার নজরুলসহ সমকালীন সঙ্গীতকারের মনোময় সৃষ্টিতে বাংলা আধুনিক গান হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট ও স্বয়ম্ভর। "পরিণাম যাই হোক, আধুনিক বাংলা গানে নজরুলই প্রথম রবীন্দ্রোত্তীর্ণ অনুষঙ্গ আনেন। ভাব ও সুর দু-দিক থেকেই অন্যরকম তাঁর রচনা এবং সমকালে সবচেয়ে জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তা যেমন গানের বিষয়গত লঘুতার জন্য, তেমনই রাগ মিশ্রিত সুরতানের চমৎকার খোশমেজাজি চালের জন্যও। সেই সঙ্গে তাঁর অস্থির জীবনের উন্মাদনা, সমকালীন স্বদেশী আন্দোলনের চারণী এবং চলচ্চিত্রে তাঁর গানের সফলতা– এই সন্নিপাতগুলি যোগ করতে হবে। নজরুলের গানকে তবু আলাদাভাবে বুঝে নিতে হবে আমাদের, কেন-না পরবর্তীকালের বাংলা গানে রবীন্দ্রনাথ থেকে অতুলপ্রসাদ পর্যন্ত গীতকার চারজনের চেয়ে নজরুলগীতির প্রভাব অনেক প্রত্যক্ষ।...আধুনিক বাংলা গানের ক্ষেত্রে নজরুলের আর-এক প্রয়াস ছিল গানকে ব্যবহারিক করে তোলা। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদের মতো শুধু গান গাওয়ার আনন্দেই গানের সৃজন তিনি যতটা করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি গান তাঁকে দিয়ে তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। রাগরাগিণীতে তিনি ছিলেন স্বচ্ছন্দচারী, অন্তরে সর্বদাই থাকত তরতাজা সৃষ্টিসুখের উল্লাস"[১]

পরিপূর্ণভাবে আধুনিক বাংলা গানের সার্থক প্রতিফলন ও পূর্ণ রূপ আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের গানে। পরবর্তীতে আধুনিক বাংলা গানে সর্বপ্রথম কাজী নজরুল ইসলাম পেশাদারি জৌলুস আনেন। "অনেক শিক্ষিত মানুষ মনে করেন রবীন্দ্রনাথ- দ্বিজেন্দ্রলাল- রজনীকান্ত- অতুলপ্রসাদ এবং নজরুলের গান ঠিক যেন এই জাতীয় আধুনিক গান নয়। স্পষ্টত তাঁরা মনে করেন নজরুল পরবর্তী বাংলা গানই আধুনিক গান। ... প্রাচীন বাংলা গানের সঙ্গে আধুনিক গানের স্বভাবগত তফাৎ এইখানে যে, আধুনিক গান ব্যক্তিগত অনুভূতিকে নিজের মতো করে প্রকাশ করতে চায় সঙ্গীতকারের নিজের বাণী ও সুর সৃজনে। যেমন- তেমন এক নির্দিষ্ট রাগরাগিণীর যথাবিহিত ছাঁচে গানের ভাব ঢালাই করা আধুনিকতার ধর্ম নয়। মল্লারেই বর্ষা সংগীত বাঁধতে হবে এমন অনুশাসন আধুনিক মন মানেনি বলেই রবীন্দ্রনাথ এমন কি বাহার রাগিনীতে বর্ষার গান বেঁধেছেন এবং তা সকল আধুনিক মনকে নাড়া দিয়েছে। এ দিক থেকে ভেবে দেখলে বোঝা যায় উনিশ শতকের মাত্র চারজন সঙ্গীতকার- রাধা মোহন সেন, নিধুবাবু, কালী মির্জা ও শ্রীধর কথক– তাঁদের কালের প্রচলিত বিধিবদ্ধ ছককে ততটা মানেননি। সেজন্যই তাঁদের গানকে আধুনিকতার অগ্রদূত বললে ভুল হয় না অর্থাৎ তাঁরা গান রচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অনুভূতিকে প্রধান বিবেচ্য মনে করেছিলেন বলেই রূপবন্ধকে ভেঙেছিলেন, গানের ভুবনে সেটাই নবসৃষ্টি, সেটাই আধুনিকতা।"[২]

নিজেদের নতুন ভাবনার শ্রেষ্ঠ উচ্চারণ বাঙালিরা প্রথম পেয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামের কণ্ঠে ও পাশাপাশি সমসাময়িক সঙ্গীত রচয়িতাদের কাছ থেকে। আনন্দে বেদনায় শোকে উদ্দীপনায় উৎসব অনুষ্ঠানে সর্বত্রই বাঙালির আধুনিক মনকে রূপ দিয়েছে তাঁদের গান। এ প্রসঙ্গে সুধীর চক্রবর্তী তাঁর 'বাংলা গানের সন্ধানে' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এভাবে: "কোনো দেশের মৌলিক সংগীত সৃষ্টির সঙ্গে যোগ থাকে যুগ ও সমকালীন মানুষের চাহিদার। এ কথা নিশ্চিত যে উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ থেকে খাঁটি বাংলা গানের জন্য একটা বড় রকমের আকুতি ও ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছিল। রামমোহনের ধ্রুপদ, আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়কদের রচনায়, গিরিশচন্দ্র ইত্যাদির নাট্যগানে সেই আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তি ঘটছিল না। অথচ ওস্তাদ কলাবন্তদের তানসর্বস্ব সুরের কেরামতি বাঙালির মন ভরাতে পারেনি। নতুন যুগের নবীন গীতিকারের আবির্ভাবের জন্য একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা সবাই বহন করেছিলেন। যিনি গানের ক্ষেত্রে সুরের একাধিপত্য মোচন করে কথার মূল্যকে বুঝবেন, যাঁর রচনায় কথা ও সুরের সংগতি প্রতিষ্ঠা ঘটবে, যাঁর সৃষ্টিতে আবহমান বাংলা গানের এক সুসমঞ্জস বিন্যাস লক্ষ্য করা যাবে। সবচেয়ে বড় কথা যাঁর বা যাঁদের গান আধুনিক মানুষের বিচিত্র অন্তর্বেদনা, আনন্দ-উল্লাসকে রূপ দেবে নৈর্ব্যক্তিকভাবে। ধর্মনিরপেক্ষ মার্জিত রুচি সম্পন্ন মেধাবী সঙ্গীতরসিক বাঙালি যে গান বুঝে নেবে, কণ্ঠে রূপায়িত করবে। অনুষ্ঠানে অথবা ব্যক্তিগত উন্মোচনের তাগিদে যে গান গাওয়া যায়। যা নিগূর্ঢ়ভাবে নিজের অথচ সকলস্পর্শী। বলাবাহুল্য, এসবেরই সার্থক প্রতিফলন ও পূর্ণরূপ আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের গানে। দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদের গানে তারই সম্প্রসারণ বা বৈচিত্র্য, রূপের ও ভাবের অন্যতর বিকাশ ও পরিপূরণ।"[৩] যেকোনো উপলক্ষে নুন্যতম প্রেরণায়, নতুন সুখ অনুভূতিজাত গান রচনা আর অপরিমিত সৃজন সামর্থ্য ছিল কাজী নজরুল ইসলামের। বিরামহীনভাবে একের পর এক বৈচিত্র্যপূর্ণ গান রচনা করে বাংলা গানে সহজেই সাড়া জাগালেন নজরুল। কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গীতিকাব্যের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য ছিল– কবির সমস্ত প্রয়াস কখনোই কেবলমাত্র জন্মভূমির নিসর্গ বন্দনাতে নিঃশেষিত হয়নি উপরন্তু তা ব্যক্তিহৃদয়ের গভীর দুঃখ সুখের অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আরো গভীরতর এক অর্থকে প্রকাশ করেছে নিয়ত।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গান

শিল্প সংস্কৃতিসহ অন্যান্য সৃষ্টিশীল বিদ্যার ক্ষেত্রে কখনোই কোনো কালে কোনো সৃষ্টিকে সর্বশেষ বা সর্বোত্তম হিসেবে মূল্যায়ন করা হয় না। কারণ সে বিবেচনাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে পারে ভবিষ্যতের আরো মনমুগ্ধকর কোনো সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, চিত্রকর্ম। তাই বাংলা গানের যাঁরা অমর স্রষ্টা, সুরের অমর জাদুকর তাঁদের একজনের সাথে অন্যজনের তুলনা করা সমীচীন নয়। প্রত্যেক সফল সঙ্গীতকারই নির্দিষ্ট শ্রোতাদের কাছে প্রকৃষ্ট ও

অতুলনীয়। শিল্পী, সুরকার, গীতিকার যাঁর যাঁর অবস্থানে স্বতন্ত্র ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। একজনের সঙ্গে অন্যজনের বৈশিষ্ট্যের মিল কখনো কোনোদিন হয় না। গান রচনা, সুর প্রয়োগ, গায়কী, গানের দর্শন, গান রচনার পটভূমি, শব্দচয়ন প্রভৃতি নানা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নজরুল দুজনই স্বতন্ত্র ছিলেন কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ে এই দু'জন কবির মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন: দেশের রাজনীতিসচেতনতা, কবিতার সঙ্গে সঙ্গীতের মৈত্রী স্থাপন, গভীর সঙ্গীতজ্ঞান, বিচিত্র রকমের অসংখ্য গান রচনা, নাটক রচনা ও নির্দেশনাদান, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্নেহের বিনিময় প্রভৃতি।

পৃথিবীর সব বাঙালির কাছে বরণীয় বাঙালি গীতিস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বাঙালি জীবন ও যৌবন প্রতিষ্ঠাতার বাণী পেয়েছিল নজরুলের বহু আগে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম দুজনেরই সঙ্গীতের প্রতি ছিল গভীর আকর্ষণ এবং সে কারণেই দুজনেরই বাংলা গানে অসামান্য অবদান। সঙ্গীত বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ মানুষ ছিলেন তাঁরা। এত গভীর সঙ্গীতজ্ঞান নিয়ে বাংলা গানের ইতিহাসে আর কোনো সঙ্গীতকার গান রচনা করেননি। সঙ্গীত বিষয়ে এত গভীর জ্ঞান বাঙালি অন্য কবিদের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। কবিতার সাথে গানের সখ্য সৃষ্টি করেছেন এ দুজন কবি। সঙ্গীতের সঙ্গে কবিতার মৈত্রী এত সুন্দর করে বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতে আর কেউ স্থাপন করতে পারেননি। দুজন কবির সঙ্গীত রচনায় আরো একটি দিক লক্ষ্যণীয়; রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল দুজনেরই সঙ্গীতের সকল শাখাতে বিচরণ ছিল। সকল ধারার গান রচনা করেছেন সুনিপুণভাবে। আরো বেশকিছু বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় যেমন দুজন কবি নাটক লিখেছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন, বহু শিশুতোষ গান রচনা করেছেন। তবে একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের জীবনের একটু অমিল ছিল। বিত্ত-বৈভব, উচ্চবংশ ও জমিদারির কারণে নজরুলের মতো গ্রামোফোন, বেতারে সরাসরি অর্থের প্রয়োজনে গান লিখতে হয়নি কোনোদিন রবিঠাকুরের। দারুণ নিবিড় ছিল তাঁদের আত্মিক সম্পর্ক। কবিগুরুর প্রয়াণে তাই ব্যথিত হয়ে নজরুল শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে ছিলেন গান লিখে–

ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে

জাগায়ো না জাগায়ো না

সারাজীবন যে আলো দিল

ডেকে তাঁর ঘুম ভাঙায়ো না।

নজরুলের জীবনের সবথেকে বেশি সময় কেটেছে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে। সৈনিকজীবনে এবং সৈনিকজীবন থেকে ফিরে এসেও রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি ভালোবাসা কাজী নজরুল ইসলামের এতোটুকু কমেনি বরং এত বেশি রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর মুখস্থ ছিল যে বন্ধুরা তাঁকে 'রবীন্দ্র সংগীতের হাফেজ' বলে ডাকতেন কেউ কেউ।

নিজের কবি ও সঙ্গীতকার হিসেবে প্রতিষ্ঠার আগপর্যন্ত রবিঠাকুরের লেখা গানকে পরিবেশন করেই কবির গায়কখ্যাতি এসেছিল। কিন্তু এই কবিগুরুর গানের ঢং, প্রথা, সঙ্গীত রচনাসহ সকল ধারার বাইরে এসে নবরূপে সর্বপ্রথম গান ও কবিতা বাঙালি শ্রোতাদের উপহার দিয়েছেন নজরুল। বাংলা গানে সুরারোপের যে বৈচিত্র্য, সুরকারদের যে স্বাধীনতা তার প্রথম দাবিদার কাজী নজরুল। ধ্রুপদের সংহত কাঠামোয় রবীন্দ্রনাথের গান পরিপূর্ণ ছিল। গান রচনায় সুরের বহুমুখিতা অপেক্ষাকৃত নজরুলের গানের থেকে, রবীন্দ্রনাথের গানে কম পরিলক্ষিত হয়। সে প্রসঙ্গে সুধীর চক্রবর্তী তাঁর 'শত শত গীত মুখরিত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এভাবে– "নজরুল তাঁর সমকালে ছিলেন উচ্চকিত যৌবনের বিগ্রহ। তাঁর অস্থির অনিশ্চিত আর আবেগসর্বস্ব জীবনযাপনের রীতি, তাঁর বিদ্রোহবাদী কবিতা ও নতুন রকমের গান, তাঁর রাজনৈতিক উন্মাদনা ও চলচ্চিত্রের সংরাগ তাঁকে জনপ্রিয়তার এমন এক উন্মাদনাকর শীর্ষে তুলে ধরেছিল যার ধারেকাছে আর কেউ ছিলেন না। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, সেকালে অর্থাৎ তিনের দশকে রবীন্দ্রনাথের গানের চেয়ে নজরুলের গান অনেক বেশি জনপ্রিয় ছিল। রবীন্দ্র কবিতা তখন যতটা বহুপঠিত ছিল রবীন্দ্র সঙ্গীত ততটা সম্প্রচার পায়নি। এই তথ্য আশ্চর্যজনক কিন্তু ঐতিহাসিক তাৎপর্যে খুবই দ্যোতক। এখন নিরপেক্ষভাবে দূর থেকে বিচার করলে বোঝা যায় বাংলা গানের বাতাবরণে রবীন্দ্র সংগীতের চেয়ে নজরুল গীতির সেকালীন জনপ্রিয়তার ফল ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো হয়নি। কেননা নজরুল পরবর্তী বাঙালি গীতিকাররা নজরুল গীতির অপকৃষ্ট দিকটির দাঁড়াই বেশি প্রভাবিত হয়েছেন। যেমন– চাঁদ ফুল মালা আর সমাধির প্রসঙ্গ নজরুলের গানের সরণি বেয়ে চলে এসেছে পরবর্তী বাংলা গানে। আর বাংলা গান যে নজরুল-পরবর্তীকালে রুদ্ধ হয়ে যায় কেবল প্রেম ও বিরহের প্রসঙ্গে তার মূলেও বোধহয় নজরুলের অপপ্রভাব। ... তাঁর নিজস্ব দৃপ্ত গায়ন ছাড়াও নজরুলগীতি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল দিলীপ কুমার রায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী ও শচীন দেব বর্মনের মতো বিখ্যাত ও দক্ষ শিল্পীর কণ্ঠে।"[৪] রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের গান ধ্বনিব্যঞ্জনা, শব্দ, চিত্রকল্প, ভাষারীতি দিয়ে মোটামুটি অনুমান করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গান স্বপ্ন সুষমায় অনুভবের এক নিগূঢ় প্রকাশ। প্রেমনির্ভর রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের আধুনিক গান–

(ক) দুজনে দেখা হলো মধু যামিনীরে

কেন কথা কহিল না চলিয়া গেল ধীরে।

(খ) এখনো ওঠেনি চাঁদ এখনো ফোটেনি তারা

এখনো দিনের কাজ হয়নি যে মোর সারা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের অন্তঃপ্রেরণায়ই গান লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গানকে দেখেছেন পারিবারিকভাবে সঙ্গীতমুখর এক বিশাল সঙ্গীতময় অভিজ্ঞতার আলোকে, তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় মেলে ধরে। গানের মাঝে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুঁজে পেয়েছেন আত্মবোধের প্রয়াস, আত্ম-আবরণের মুক্তি। চিরায়ত বাংলার উৎসব-পার্বণে রবিঠাকুরের গান জেগেছে মহাসমারোহে। গান লেখার আনন্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন: "গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয় এমন আর কিছুতে হয় না। এমন নেশায় ধরে যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়, বড়ো বড়ো দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়। কর্তব্যের দাবিগুলোকে মন এক ধার থেকে নামঞ্জুর করে দেয়।"[৫]

নজরুলের সাথে রবীন্দ্রনাথের গীতি বৈচিত্র্যে ও পরিব্যপ্তিতে বহুলাংশে মিল রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান নানা ধরনের জীবনস্পন্দনে-উপলক্ষে, উল্লাসে-উৎসবে, তত্ত্বে-রসে, জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনে, দুঃখ-সুখে সম্মুখপানে অগ্রসর হয়েছে ক্রমাগত। মানুষের জীবনব্যাপী অর্জনের সমস্ত কিছুই ধরা পড়েছিল রবিঠাকুরের গানে। রবীন্দ্রনাথ রচিত আধুনিক গানকে তিনি চিত্রকল্পের গূঢ় নির্মাণে, বাণী সৃজনের নবীনতায় উল্লাস আনন্দের অনুভূতিতে এক সম্ভ্রমপূর্ণ সৌজাত্যে অপরূপ করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গানের জীবন বিচিত্র ও পরিব্যাপ্ত। অমিয় চক্রবর্তীর ভাষায়: "গান তাঁর প্রাণের প্রতীক, তাঁর প্রেরণা, প্রাণের সঙ্গে পৃথিবীর সেতু। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'সবচেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান'। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ গানকে কখনও অর্ধদৃষ্টিপাতের করুণা দেখাননি; নেননি নিছক বিনোদন রূপে।"[৬] আধুনিক গানের উৎসপুরুষ রূপে নিধুবাবুর পরে রবীন্দ্রনাথের স্থান। বাংলা গানের অস্ফুট ভবিষ্যৎকালের বাণীকার ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর গান ছিল সর্বাধুনিকতায় অগ্রচারী। রবীন্দ্রনাথের গানে অন্তর্জীবনের বিচিত্র ইঙ্গিতের প্রকাশ রয়েছে। নির্মাণের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের গান বৈচিত্র্যসঞ্চারী। তবে সে গানের অন্তঃস্বভাবী রহস্য এখনো গুরুগম্ভীর ও ঘোলাটে সাধারণ শ্রোতার নিকট। বহু বিকাশের পথপরিক্রমায় কবিগুরুর প্রেমের গান নানা রকম অপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে, বিপত্তির মুখে অঙ্গুলিমেয় সম্ভ্রান্ত শিল্পীদের কণ্ঠাগত হয়েছিল কোনো এক সময়ে। কিন্তু নজরুলের আধুনিক গান সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই গ্রামোফোন কোম্পানিসহ অন্যান্য প্রচারমাধ্যমে এবং দৃপ্ত গায়নপ্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীদের কণ্ঠবাহিত হয়ে চিরকালীন রসিক চিত্তধারী বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। বিকাশের তীর্থপথে বহু আঁধারে সুরের দীপালি জ্বেলেছে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের রচিত-সুরারোপিত আধুনিক গান। এ প্রসঙ্গে সুধীর চক্রবর্তী যথার্থাই বলেছেন: "গানের এই জ্যোতির্ময় সাধনা, আমাদের তিমির হননের গান, সে তো অসত্য নয়। তাই আধুনিক বাংলা গানে মানবসাধনারই অলঙ্ঘ্য পরম্পরা আমরা পেয়ে যাই। তারও আছে এক সগর্ব ইতিহাস।"[৭]

সুদীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নানা উপলক্ষকে ঘিরে এতসব গান লিখে গেছেন যে তাতেই মিটে যাচ্ছে আমাদের প্রত্যহের আর উৎসবের চাহিদা। প্রাণহীন এদেশ গানহীন হয়ে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকালে। গানহীন হয়ে পড়েছিল সমগ্র পরিবেশ, সত্যিই গীতসুধার তরে তাঁর চিত্ত পিপাসিত হয়েছিল। বাঙালির জীবনযাপনের আধুনিকায়নে বহুকিছুতেই কলকাতার ঠাকুর পরিবারের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। দেশাত্মবোধ, শিক্ষা, সঙ্গীত, ধর্ম, কৃষি, পোষাক, খাদ্যাভাস, রাজনীতির মতো বাংলা গানকেও রাগসঙ্গীতের কঠিন বলয় ভেঙে সাধারণের উপযোগী করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন: "রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে যেমন পুঁথির গণ্ডী থেকে, ধর্মকে শাস্ত্রের গণ্ডী থেকে, রাজনীতিকে বক্তৃতামঞ্চ থেকে উদ্ধার করেছিলেন তেমনি সংগীতকেও ওস্তাদি এবং কালোয়াতি থেকে মুক্ত করে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন তা যথার্থ হয়ে ওঠে। তাঁর এ-বক্তব্যও সঠিক যে, রবীন্দ্রনাথ প্রথমদিকের গান লিখেছেন আপন তাগিদে, শেষের দিকে তাগিদ এসেছে বাইরে থেকে।"[৮]

দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুলের গান

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত আধুনিক গান বা প্রেমসঙ্গীতে বিরহী কবির হৃদয়ের আর্তি প্রভাব প্রবলভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। নজরুলের আধুনিক গান রচনার মূলভাবে ও কৌশলে এ বিষয়টি বিবেচ্য ছিল সবচেয়ে বেশি। যেমন:

আমি সারা সকালটি বসে বসে সাধের মালাটি গেঁথেছি (ডি.এল রায়)।

মালা গাথা শেষ না হতে তুমি এলে ঘরে (কাজী নজরুল ইসলাম)।

ডি.এল রায়ের প্রেমের গানের কথা ও সুর প্রয়োগ বহুলাংশে রবীন্দ্রনাথের মতো গুরুগম্ভীর প্রকৃতির তা নজরুলের গানে অনুপস্থিত ছিল। ডি.এল রায় এবং নজরুল অতি অল্প বয়স থেকেই গান রচনা শুরু করেছেন। কথা ও সুরের অপূর্ব সমন্বয়ে গান রচনা ছিল দু'জনেরই সহজাত ক্ষমতা। অত্যন্ত আধুনিক ভঙ্গিমায় যুগোপযোগী রীতিতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং কাজী নজরুল ইসলাম দুই আধুনিক কবি প্রেমের গান, হাসির গান, নাটকের গান, দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন। যেমন:

ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা (ডি.এল রায়)।

শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা আয়রে আয় (কাজী নজরুল ইসলাম)।

বেশকিছু স্কচ, আইরিশ ও ইংরেজি গান ভেঙেছেন ডি.এল রায় এবং সেই সুরের আদলে গান রচনা করেছেন। একইরকমভাবে কাজী নজরুল ইসলাম ও সে ধারায় হেঁটেছেন এবং বহু মিশরীয়, আরবীয়, তুর্কি, ইরানি সুর অনুসরণ করে গান রচনা করেছেন। যেমন:

আজি এসেছি এসেছি বঁধু হে (ডি.এল রায়)।

শুকনো পাতার নূপুর পায়ে (কাজী নজরুল ইসলাম)।

এখানে এ দু'জন মহান কবির দারুণ মিল লক্ষণীয়। বাংলা গানে নাটকের গান, হাসির গান, দেশাত্মবোধক গান রচনা এবং বিলেতি সুর বাংলা গানে সফলভাবে মিলিয়ে দেবার জন্য ডি.এল রায়ের নাম সগৌরবে লেখা রয়েছে বাংলা গানের খাতায়। বাংলা গানের সুরে বিলেতি ঢং আমদানির জন্য ডি.এল রায়কে প্রশংসার পাশাপাশি নিন্দিতও হতে হয়েছে। হাসির গান রচনার জন্য জীবনের সবচেয়ে বেশি শ্রোতাসমাদর পেয়েছেন ডি.এল রায়। নজরুলের রচিত হাসির গানেও তিনি সাড়া জাগিয়েছিলন কিন্তু সেটা ডি.এল রায়ের হাসির গানের খ্যাতির মতো ছিলোনা। কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে দেশের গান রচনায় ডি.এল রায়ের অনেকাংশে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জন্মভূমিকে মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করে গান রচনায় কাজী নজরুল ইসলাম ও ডি.এল রায়ের মধ্যে সাদৃশ্য প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথের গান লক্ষ্য করলে আমরা বৈচিত্র্য খুঁজে পাই তেমনি ডি.এল রায়ের গানের মধ্যে পাওয়া যায় নাট্যধর্মিতা, প্রকৃতিপ্রেম, দেশাত্মবোধ ও বিদেশী সুরের সমীকরণ। আমরা মলয় বাতাসে ভেসে যাব, আমরা এমনি এসে ভেসে যাই, হৃদয় আমার গোপন করে, আজি এসেছি আজি এসেছি এসেছি বঁধু হে, সে কেন দেখা দিল রে, আমি সারা সকালটি বসে বসে, আজি তোমার কাছে ভাসিয়া যায় অন্তর আমারসহ বহু প্রেমের গান রচনা করেছেন ডি.এল রায়।

রজনীকান্ত ও নজরুলের গান

রজনীকান্ত সেনের অধিকাংশ গান আত্মনিবেদনের, ভক্তিভাবের। রজনীকান্তের গানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গানের কথায় ও সুরে আত্মবেদনা ঢেকে যায়, আত্মদীনতায়। তাঁর গানের মুখ্য বিষয় ছিল ঈশ্বরভক্তি। প্রেম ও প্রকৃতি ভাবের গানও আছে রজনীকান্ত সেনের। কান্ত কবি দুঃখ বেদনা সন্তাপকে আপন ভেবে নিয়েছেন জীবনব্যাপী। নিজের যন্ত্রণাকে ভাবেন দৈব আশীর্বাদ স্বরূপ। এসবের মূল কারণ রজনীকান্ত সেন শিল্পীর চেয়েও অনেক বড় ভক্তপরম

পিতার এ জগতে এবং ঈশ্বরে মন-প্রাণ সমর্পিত একজন মানুষ। রজনীকান্তের কাছে গান সৃজন মানে পরমেশ্বরকে স্মরণ। সৃষ্টিকর্তার প্রতি এমন অবিচল ভক্তিভাব রজনীকান্তের মতো কাজী নজরুল ইসলামের বহু গানে প্রকাশ পেয়েছে। নজরুলের মতো রজনীকান্তের মানবিক প্রেমনির্ভর আধুনিক ধারার গান রচনা অপেক্ষাকৃত কম। রজনীকান্ত সেন লিখেছেন–স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি রেখেছি স্বপনে ঢাকিয়া। কান্ত কবির মতোই ভক্তিভাবের, অত্মসমর্পনের বহু গান লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। এই ধরায় গান রচনা করার মিলটিই দুজনের মধ্যে লক্ষণীয়। যেমন:

কোন কুসুমে তোমায় আমি পুজিব নাথ বল বল

ওগো অন্তর্যামী ভক্তের তব শোন শোন নিবেদন

অন্তরে তুমি আছো চিরদিন ওগো অন্তর্যামী

কান্ত কবির সাথে নজরুলের ভক্তিভাবের গানের মিল অনেক। গানের বাণীতে জগত ও জীবনের প্রতি বৈরাগ্যভাবের প্রকাশ পেয়েছে। যেমন:

কেন বঞ্চিত হব চরণে আমি কত আশা করে বসে আছি, পাব জীবনে না হয় মরণে

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে

আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাওনি

সরল আত্ম-সমর্পিত একজন মানুষ ছিলেন রজনীকান্ত সেন। বিবেক লাঞ্ছিত যন্ত্রণায় জর্জরিত এক পিড়িত কবিসত্ত্বা যেন ঈশ্বরের কাছে মুক্তিভিক্ষা চাইছে। রজনীকান্তের কাব্যগীতিতে বিবেকযন্ত্রণা, বিপন্ন পাপ, দীনতা ইত্যাদি সমারোহে ভরপুর। রজনীকান্তের গানের ভক্তিভাব, সর্বকালের ভক্তচিত্তের স্নিগ্ধ আকুতির ব্যঞ্জনায় রসসিক্ত।

অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের গান

অতুল প্রসাদের গানের ভিতরে প্রণয়সূচক ঠুমরী চালে সুরের খেলা গভীরভাবে নাড়া দেয় শ্রোতাদের। বিচিত্র ব্যঞ্জনাময় ও সুষম লাবণ্যসম্পন্ন অতুলপ্রসাদের গানের অন্তঃপুর। বাংলা গানকে স্পষ্টরূপ দেয়ার নিমিত্তে অতুলপ্রসাদ সেন রাগসঙ্গীত থেকে শুরু করে, লোকসঙ্গীত, ঠুমরির মিহি দানার কাজ, বিদেশী সুর সব মিশিয়ে একাকার করে তৈরি করেছেন বাংলা আধুনিক গানের আপন ধারা। অতুলপ্রসাদ এবং নজরুলের গান রচনা,

সাঙ্গীতিক বুনিয়াদ বৈচিত্র্যধর্মী গান রচনার প্রবণতায় উদ্ভাসিত। আধুনিক বাংলা গানের নির্মাণকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়েছেন যে অমর রূপকারগণ অতুলপ্রসাদ তাঁদের মধ্যে নমস্য। একা মোর গানের তরী ভাসিয়ে ছিলাম নয়ন জলে, বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে, কে আবার বাজায় বাঁশি, আমি বাঁধিনু তোমার তীরে তরণী আমার, মোর আজি গাঁথা হল না মালা, বঁধু ক্ষণিকের দেখা তবু তোমারে আধুনিক ধারার ও ঠুমরি সুর আশ্রিত এসব গানে কথা ও সুরের অপূর্ব মিশ্রণে এক নির্মল সুখানুভূতির উপস্থিতি বিরাজমান। গানের সুর প্রয়োগে অতুলপ্রসাদ সেন ও নজরুল ইসলাম সমধর্মী ছিলেন।

অতুলপ্রসাদ সেন জীবনের ৬৩ বছরের মধ্যে শেষ ৩২ বছর তিনি ছিলেন লখনৌয়ে। অতুলপ্রসাদের লখনৌতে দীর্ঘদিন থাকাকালীন গান শুনে বিমোহিত হয়েছেন বহু বিখ্যাত ঠুমরি শিল্পীর। লখনৌয়ের সব বড় ওস্তাদদের অতুলপ্রসাদ নিজের বাড়িতে এনে মেহেফিল করতেন। লখনৌয়ে তখনকার তাঁর পরিচয় ছিল ব্যারিস্টার এ.পি সেন নামে। রবীন্দ্রনাথের ও নজরুলের গানের বড় বৈশিষ্ট্য– গানের মধ্যে সঞ্চারীর ব্যবহার করা, যেটা অতুলপ্রসাদ কম ব্যবহার করতেন তাঁর গানে। অতুলপ্রসাদ পরপর ২-৩ টি অন্তরা দিয়েছেন। অতুলপ্রসাদ সেন গান রচনার বিষয়ে কোনোভাবেই রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোনো সঙ্গীতকারের পদাংক অনুসরণ করেননি, প্রভাবিতও হননি। ঠুমরি অঙ্গের গান রচনায় অতুলপ্রসাদ যে ধারা রচনা করে গেছেন, কাজী নজরুল ইসলামের হাতে সেই ধারা পূর্ণতা পেয়েছে। ঠুমরি অঙ্গের গানের রচনায় নজরুল এবং অতুলপ্রসাদের যোগসূত্র লক্ষণীয়। পারিবারিক জীবনে অতুলপ্রসাদ সেন তেমন সুখী ছিলেন না। পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অতুল প্রসাদের সমস্ত জীবন অন্তরবেদনায় ব্যস্ত ছিল। অসম সম্পর্ক, পারিবারিক ব্যর্থতা সবকিছু তাঁর গান রচনার মানসিকতাকে রুদ্ধ করেছে বারবার।

অতুলপ্রসাদ এই বিশ্বচরাচরে দিশেহারা, তাঁর জীবনতরণী ভাসাতে চেয়েচেন প্রেমময় তীর্থপথে। অতুলপ্রসাদের বিশ্বাস বিফল জীবনের ছিন্নকুসুম, ঈশ্বর হয়তো গ্রহণ করবেন। তাঁর গানের সকল অবয়বে এক নিরবচ্ছিন্ন বেদনার সুর অনুরণিত হয়েছে। অতুলপ্রসাদের মতো নজরুলের প্রেমের গানও বিরহদীর্ণতায় পূর্ণ। অতুলপ্রসাদের গান শুধু বিরহের আঘাতে বেদনায় অভিমান ভরা চিত্তের আক্ষেপে অশ্রুসজল। বিরহের ব্যথা-দীর্ন বিলাপে কাজী নজরুল ইসলামকে চেনা যায় সহজে। অতুলপ্রসাদের প্রেমের গানে কাব্যের প্রকাশ সহজ সরল কিন্তু এই সারল্যের মধ্যেই এক সংযত কাব্যসুষমায় বিরহ বেদনা আভাসিত হয়েছে। এখানেই নজরুলের সাথে অতুলপ্রসাদের আধুনিক গানের সৃজনশৈলীর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। পঞ্চগীতিকবির গান সম্পর্কে স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সমকালের বাংলা গান: রবীন্দ্রসঙ্গীত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এভাবে: "কেবলমাত্র বাক্যবন্ধে

শব্দবৈভবে নয়, রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা অনুভবের গভীরতায় অন্যান্যের রচনা থেকে পৃথক। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমভাবনা প্রকৃতির ফুল, চাঁদ, মলয় বাতাস ইত্যাদি উপমার সাহায্যে সীমিত অনুভবের জগতে বন্ধ। নজরুলের প্রেমচেতনা পরিচিত উপমায়, দেহাশ্রিত বাসনায় সীমাবদ্ধ। অতুলপ্রসাদের প্রেমভাবনা বিরহের স্নিগ্ধ বেদনায় অশ্রুভারাবনত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনায় সর্বকালের মানুষের ভালোবাসার বহুবিধ অনুভব, অতলস্পর্শ গভীরতায় নিমজ্জিত।... এই ধরনের প্রেমচিত্রে অনুভূতির সর্বব্যাপী বিস্তার। কবির অন্তরের নির্জন উপলব্ধির নিহিতার্থ স্বহৃদয় পাঠকচিত্তে কাব্যের অমূল্য রসসৃষ্টি করে অনায়াসে।...দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমভাবনা মর্তবাসনানুরঞ্জিত, নজরুলের প্রেমচেতনা গজল গানে, স্থুল দেহবদ্ধ প্রেমভাবনায় রূপায়িত, অতুলপ্রসাদের প্রেমচিন্তা বিরহের স্নিগ্ধ বেদনায় অশ্রু ভারাক্রান্ত।"[৯]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান রচনা একটা দীর্ঘসময় কেটেছে প্রকৃতির রূপচিত্রনে। অতুলপ্রসাদ সেন তাঁর বিরহীচিত্তের বেদনাভার মিশিয়েছেন প্রকৃতির নীরব রূপের মাঝে। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর আধুনিক গানের মাধ্যমে মানবমনের ব্যথার দোসর করেছেন প্রকৃতিকে। বিরহী মনের অস্ফুট বেদনামাখা কথা স্থান পেয়েছে নজরুলের আধুনিক গানে। সুরপিপাসু শ্রোতাচিত্ত অনায়াসে ভেবে নেয়– এ যেন তারই গান, তারই চিরকালীন সুর। কাব্যপিপাসু শ্রোতা ধরে নিয়েছেন, তাঁরই মনের গোপন কথায় সাজানো এ গান। আধুনিক গানের দীর্ঘ পথচলায়- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে এ গান বহুভাবে বিকশিত হয়েছে, ডি.এল রায়ের গানের আধুনিকতার স্পর্শে শ্রোতার মনের চিত্রপট উজ্জ্বল করেছে বহুকাল, রজনীকান্ত সেনের সঙ্গীতে বারবার ঘুরে ফিরে আধুনিকতার পরিবর্তে ঈশ্বরপ্রেম স্থান পেয়েছে, কিন্তু নবভক্তিভাবে পরিপূর্ণ সে গান। গানের শব্দচয়নে, বক্তব্য উপস্থাপনে রজনীকান্ত সেন দারুণ আধুনিক। অতুলপ্রসাদ সেন সর্বপ্রথম 'গজল' অনুষঙ্গ বাংলা গানে এনে, এক নতুন মানবিক প্রেমনির্ভর আধুনিক ধারার গানের সংযোজন করেছেন। সবশেষে নজরুলের হাতে এ আধুনিক গান পেয়েছে সম্পূর্ণতা, যা অন্যকোনো সঙ্গীত রচয়িতার হাতে এমনভাবে তিমিরবিদারী হয়ে আলো জ্বালেনি গানের গগনে।

নজরুলের গানের বাণীতে অভিজাত ভাবের সহজ প্রকাশ বিদ্যমান। কাজী নজরুলের গানের সাফল্য আর ব্যবহারিক চাহিদার ফলে তাঁর সমকালীন এবং পরবর্তী বহু সঙ্গীতগুণী বাংলা আধুনিক গান রচনায় ও সুরারোপের সাথে যুক্ত হয়েছেন। গান লিখে বা সুরারোপ করে সুনিশ্চিত অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সে যুগে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল নবীন রচয়িতাদের মনে। নজরুল পরবর্তী অনেক গীতিকার, সুরকার আধুনিক গানের নবরূপে প্রাণসঞ্চার করেছেন তাঁদের রচনার মাধ্যমে। সে আধুনিক গান রচনার পিছনে তাগিদ ছিল বিচিত্র জনরুচির চাহিদা মেটানো এবং অর্ডারি গান রচনা। অর্থাৎ মঞ্চনাটক, চলচ্চিত্র, ব্যক্তিগত অনুরোধ, গ্রামোফোন, বেতার এসবের উপলক্ষকে কেন্দ্র

করে গান রচনা। শ্রোতাদের দিকে চেয়ে আধুনিক গানের সৃষ্টি তাই বেশিরভাগ গান সৃজন শুরু হয়েছিল ব্যবহারিক ও বাণিজ্যিক কারণে। তখনকার সময় যাঁরা আধুনিক গান রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন মনেপ্রাণে, তাঁদের মধ্যে তুলসী লাহিড়ী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সজনীকান্ত দাস, নলিনীকান্ত সরকার, অনিল ভট্টাচার্য, হীরেন বসু, শৈলেন রায়, অজয় ভট্টাচার্য, বাণী কুমার, সুবোধ পুরকায়স্থ, প্রণব রায় প্রমুখ। সুরকারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুবল দাশগুপ্ত, শৈলেশ দত্ত গুপ্ত, শচীন দেব বর্মণ, কমল দাশগুপ্ত, অনুপম ঘটক, সুধীরলাল চক্রবর্তী, অনিল বাগচী, হীরেন বসু, হিমাংশু দত্ত, কৃষ্ণচন্দ্র দে, দিলীপ কুমার রায়, রাইচাঁদ বড়াল প্রমুখ। আর এই আধুনিক গানকে যাঁরা কণ্ঠে ধারণ করে যুগ-যুগান্তরে, দেশ-দেশান্তরে আজও স্মরণীয় বরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন– কানন দেবী, আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কমলা ঝরিয়া, দিলীপ কুমার রায়, কে.এল সায়গল, জগন্ময় মিত্র, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, সন্তোষ সেনগুপ্ত প্রমূখ। নজরুল পরবর্তী গীতিকারদের রচিত আধুনিক গান, বাংলা গানের অগ্রগতির ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখিত এজন্য যে, তাঁরা আধুনিক গানের বাণীতে প্রকাশের নানা মৌলিকতা দেখিয়েছেন এবং ভাবনায় নতুনত্ব দেখিয়েছেন, যা শ্রোতাদের কাছে আধুনিক গানকে আপন অনুভবের গান হিসেবে জনপ্রিয় করেছে আরও। যেমন: পবিত্র মিত্রের কথায়, শ্যামল মিত্রের সুরে, শিল্পী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে আধুনিক গান–

কাজল ও নদীর জলে ভরা ঢেউ ছলছলে

প্রদীপ ভাসাও কারে স্মরিয়া

সোনার বরণী মেয়ে বল কার পথ চেয়ে

আঁখি দুটি ওঠে জলে ভরিয়া ॥

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় এবং মান্না দে'র সুরে হৈমন্তী শুক্লার গাওয়া আধুনিক গান–

ঠিকানা না রেখে ভালোই করেছ বন্ধু

না আসার কোনো কারণ সাজাতে

হবে না তোমায় আর

বানানো কাহিনী শোনাতে হবে না

কথা দিয়ে না রাখার ॥

উপরে উল্লেখিত গান দুটিতে বাঙালির নয়ন ও মননের কথা অনায়াসে প্রকাশ পেয়েছে সরল সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিমায়। নজরুলের আধুনিক গানে শব্দের প্রয়োগ থেকে শুরু করে, গানের তাল, ছন্দ প্রয়োগ সবকিছুই সমসাময়িক অন্যান্য সকল সঙ্গীতকারের থেকে ব্যতিক্রম।

গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায় কে যেন আমারে ডাকে সে, তোমার আঁখির মতো আকাশের দুটি তারা চেয়ে থাকে মোর পানে, শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে, আমি চিরতরে দূরে চলে যাব তবু আমারে দেবো না ভুলিতে, সাঁঝের পাখিরা ফিরিল কুলায় তুমি ফিরিলে না ঘরেসহ এমন শ্রুতিমধুর ও জীবনঘনিষ্ঠ বাণী আধুনিক গানকে করেছে আরো বেশি আধুনিক বৈশিষ্ট্যের। এমন আধুনিকতায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও রচনা করেছেন:

ক. আজি গোধূলি লগনে এই বাদল গগনে তার চরণধ্বনি আমি হৃদয়ে গনি

খ. আমার এ পথ তোমার পথের থেকে অনেক দূরে

গ. আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান

ঘ. কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে

ঙ. তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম

রবিঠাকুরের লেখা এসব গান শুনে শুনে চিত্ততৃপ্তিলাভ করার পরে, তরুণ বয়সে সৈনিক কবি নজরুলের পরবর্তীতে গানের ভুবনে, সুরময় জীবনে স্থায়ীভাবে প্রবেশ। তথাপি রবীন্দ্রনাথের এই প্রেম পর্যায়ের আধুনিক সঙ্গীতের তুলনায় নজরুলের লেখা আধুনিক গান– জনচিত্তকে অনেক বেশি মুগ্ধ করেছে, তৃপ্ত করেছে এবং তাদের অন্তরের কথা বলেছে সুরে সুরে। এ কারণেই নজরুলের আধুনিক গান অদ্যাবধি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথ ডি.এল রায় এবং অতুলপ্রসাদ সেনের গানের মধ্যে কমবেশি একটা বিলিতি সুরের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এ তিনজন কবিরই ইংল্যান্ডে যাওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে যেটা রজনীকান্ত এবং কাজী নজরুল ইসলামের ভাগ্যে জোটেনি তাই এ তিনজনের গানের মধ্যে একটা বিদেশী সুরের ভাব রয়ে গেছে। গান রচনার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ সবথেকে দীর্ঘজীবন বেঁচেছিলেন। ডি.এল রায়ের জীবনকাল ৫০ বছর, রবীন্দ্রনাথের জীবনকাল ৮০ বছর, রজনীকান্তের মাত্র ৪৫ বছর। অতুলপ্রসাদের জীবনকাল ৬৩ বছর। কাজী নজরুল ইসলামের জীবনাবসান

হয় ৭৭ বছরে কিন্তু কর্মময় জীবন ছিল ১৯২০ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত। মাত্র ২০ বছরের কর্মময় জীবন। রবীন্দ্রনাথের গানের পূর্ণতার পিছনে তাঁর দীর্ঘ জীবনের সৃষ্টিশীল সময় খুবই প্রাসঙ্গিক। পারিবারিকভাবে রবীন্দ্রনাথের নানা রকম সাংগীতিক সাহচর্য, ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব পরিবেশ, শান্তিনিকেতনের নির্মল জীবন– এ সকল কিছু রবীন্দ্রনাথের গানের পূর্ণতার পিছনে রুধির ধারার মতো কাজ করেছে, উচ্ছ্বাস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। একমাত্র ভক্তিভাবসম্পন্ন বাংলা গান দিয়ে রজনীকান্ত সেন যে অসামান্য উপহার রেখে গেছেন তা অনুসরণীয়। মানবপ্রেমের যথার্থ কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে ভক্তিভাবের মিল আছে রজনীকান্ত সেনের গানের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানকে আমরা আলাদা করতে পারি অনুভবের গভীরতায়, নিপুণ ছন্দে, চিত্রকল্পে এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভাষায়। অপরপক্ষে কাজী নজরুল ইসলামের গানকে অনায়াসে আলাদা করতে পারি সুরবৈচিত্র্যের নিপুণ বিশালতায়, সুরে ও বাণীর বর্ণিল সমাবেশে।

নজরুলের আধুনিক গানের বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্যের নিরিখে নজরুলের আধুনিক গান বিচিত্র ও বর্ণিল। আধুনিক ধারার প্রবর্তক কবি হিসেবে বহু দিবসাবধি কাজী নজরুল ইসলাম স্বীকৃত। বাংলা গানে নজরুলের রচিত গজল গান ও আধুনিক শ্রেণির গান তাঁকে মহিমান্বিত করেছে এবং খ্যাতির চিরআয়ু দান করেছে। নজরুলের গানের আধুনিক মনোভঙ্গির অন্তরালের মূল কারণ–মানবিক হৃদয়ের ঘোষণা প্রতিষ্ঠা করা। গানের ক্ষেত্রে প্রাণের সুষমা প্রকাশ করা। গীতিকার ও সুরকার হিসেবে নজরুলের গানের বিচরণক্ষেত্র ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত। যে সুর, যে কথা, যে ভাব শ্রোতাকে সহজেই মোহাবিষ্ট করে দিতে পারে– যথার্থ সেই ভাবই প্রকাশ করেছেন নজরুল তাঁর আধুনিক শ্রেণির গানে। গানের উপমা, শব্দালঙ্কার, বর্ণনা, অনুভূতির ব্যবহারে, নিজস্বতায় নজরুল সমকালে অন্যসব সঙ্গীতকারের নমস্য ছিলেন। নজরুলোত্তর যুগে অবশ্য বহু গীতিকার নজরুলের প্রভাববলয় এড়িয়ে যাবার জন্য প্রেমবর্জিত আধুনিকতা বিঘোষী গান রচনা করেছেন তাতে আধুনিক গানের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য আসলেও সুর প্রয়োগের রীতি একই রকম ছিল। প্রকাশভঙ্গির বিচারে, বাক্যবিন্যাসে এবং সুরপ্রবাহের রীতিতে আধুনিক গান নজরুলের স্বকীয়তায় উচ্ছ্বসিত। আধুনিক গানের রচনারীতি কাজী নজরুল ইসলামের একান্ত নিজস্ব না হলেও, এই গানের ক্ষেত্রে নজরুল রচিত আধুনিক গানের সাফল্য বাংলা গানের ইতিহাসে চরম ঔৎকর্ষ অর্জন করেছে। নজরুলের সঙ্গীত রচনারীতি আজও পর্যন্ত বাঙালিদের মধ্যে বহু গীতিকার অনুসরণ করেন পরম শ্রদ্ধার সাথে।

যে গানে প্রণয়ক্ষুধা কাতর নর-নারীর প্রেমআচ্ছন্ন রূপ প্রকাশ পেয়েছিল সাবলীলভাবে, হৃদয়ের মর্মমূলে নাড়া দেয় যে গান, নির্বিশেষ যৌবন চেতনায় বাসনার-ব্যাকুলতার বিশ্বস্ত বিবরণ মেলে যে গানে সে গানই নজরুলের আধুনিক গান। ব্যক্তি বেদনার বাঁধভাঙ্গা স্বতোচ্ছ্বসিত আত্ম–প্রকাশে পরিপূর্ণ যে গানে তাই নজরুলের আধুনিক গান। এই আধুনিক গানের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলি আপন অভিরুচিতে তিলে তিলে সৌন্দর্য আহরণ করে কল্পনাতেই তিলোত্তমার প্রতিমা গড়ে তোলে মনমাঝে। বাস্তব জীবনে স্বপ্নসারথিকে সেই রূপেই পাওয়া বহুলাংশে কষ্টসাধ্য। নজরুলের আধুনিক গানের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১. নজরুলের আধুনিক গান উপমার ব্যবহারে সুনিপুণ। বাংলা গানের সকল বয়সী শ্রোতাদের কাছে আধুনিক গান সহজবোধ্য ও শ্রুতিমধুর।

২. সুর কাঠামোর পরিকল্পনায় এ গানে স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। গানের বাণী ও মূলভাবের সাথে পূর্ণসঙ্গতি রেখেই নজরুলের আধুনিক গানের সুর ও তাল প্রবর্তিত।

৩. হৃদয়ানুগ যথার্থ শব্দ ব্যবহারে ভাবের প্রকাশ। গানে সরলভাবে অনুভূতির প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের জীবনবোধ ও প্রেম গানের কাব্যভাগে স্পষ্ট।

৪. নজরুলের আধুনিক গানে সুর ও বাণী সমভাবে প্রকাশিত এবং পরস্পরকে ছাপিয়ে না যাওয়ার প্রত্যয়ে প্রতিজ্ঞ। সুবিবেচিত সুর ও বাণী ভাবপ্রকাশে পরস্পরের পরিপূরক এই গানে।

৫. সার্থক গীতিময়তার এক আশ্চর্য উদাহরণ নজরুলের আধুনিক গান। এক ধরনের শ্রুতি সুখকর সাঙ্গীতিক রস অতি বিশিষ্ট বাণীর সাথে মিশ্রিত হয়ে এ গানের রূপ পরিগ্রহ করে।

৬. তীব্রভাবে গানের কাব্যিক মূল্যকে সুরের অনুষঙ্গে প্রকাশ করা নজরুলের আধুনিক গানের মূল উদ্দেশ্য। সুরবিচ্ছিন্ন অবস্থায়ও আধুনিক গান স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনাবাহী অর্থ প্রকাশ করে।

৭. ব্যক্তিগত অনুভূতির নিবিড় প্রকাশে ও অপূর্ব প্রাণাবেগে মূল্যবান নজরুলের আধুনিক গান। বিপুল প্রাণোল্লাস ও প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ নজরুলের আধুনিক গান।

৮. নজরুলের আধুনিক গানে অমরত্বের অপেক্ষা সৌন্দর্যের সন্ধান ও প্রকাশই প্রধান অভীষ্ট। রাগসঙ্গীতের কঠোর নিয়ম না মেনে এই গান রচিত ও পরিবেশিত।

৯. গভীরভাবে জনচিত্তের সঙ্গে সহমর্মিতা ও শ্রোতৃচিত্তসচেতনতা এ গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। খুব অনায়াসে শ্রোতাদের মনের দাবি রূপায়িত হয়েছে নজরুলের এ গানে।

১০. শ্রমবিভাজন নজরুলের আধুনিক সঙ্গীত রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নর-নারীর দুঃখ-বেদনা, কামনা-বাসনা, মিলন-বিরহের স্পর্শে দীপ্তিময় ও জ্যোতির্ময় এ গান।

কাজী নজরুল ইসলামের রচিত আধুনিক গান পূর্বের গীতধারার অন্ধ অনুকরণকামিতা, মধ্যযুগের প্রথাবদ্ধতা, ধর্মের প্রশ্নহীন আনুগত্যের ধারা অতিক্রম করে নবরূপে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে রূপদান করেছেন। মানুষই প্রধান হয়ে উঠেছে তাঁর এ ধারার গানে। আধুনিক শিল্প ও সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো মানুষ ও মানুষের রকমের-রংবেরঙের অনুভূতির প্রতিষ্ঠা করা, কল্যাণ করা। সেই বিচারে নজরুলের গান আধুনিক পর্যায়ভুক্ত। বাংলা গানের বিকাশের স্তরে মানুষ এবং মনুষ্যত্ববোধ গান রচনার প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। মানুষের কান্না হাসি, নরনারীদের প্রেমের গান হৃদয়সঙ্গীতরূপে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ফুটে উঠেছে এখানে। নিধুবাবুর টপ্পা গানের পথ ধরেই নজরুলের আধুনিক ধারার গানে আধ্যাত্মিকতার সকল আবরণ ভেদ করে, রূপক প্রতীকের আড়াল অতিক্রম করে, প্রণয় অনুভূতির প্রত্যক্ষ আবেদন প্রতিষ্ঠিত হলো। "আশ্চর্য উৎকর্ষ নজরুলের প্রেমের গানগুলোর। শুধু বুলবুল নয় অন্যান্য গ্রন্থেও এই শ্রেণির গান ছড়িয়ে আছে। কবিতায় নজরুল ইসলামের প্রেমের যে অনুভূতি, যে অস্থিরাবেগ, দেহচেতনার যে চঞ্চলতা, গানে কিন্তু তা একটু প্রশান্ত কোমল- সেজন্য আরো হৃদয়গ্রাহী। তনুকে তিনি বলেছেন তীর্থ– 'বলেছিলে তুমি তীর্থে আসিবে আমার তনুর তীরে'–প্রেমের গানে এই আবেগোষ্ণতাই সে যুগে একটি নতুন আস্বাদ। ... নজরুল ছিলেন বাংলা সঙ্গীত ঐতিহ্যের সর্বশেষ নায়ক। তাঁর পরে দ্বিতীয় কোনো প্রতিভাবান কবি সঙ্গীতকার এ ভাষায় জন্মান নি।"[১০]

কথা ও সুরের অনুপম সমন্বয়সাধনে বাংলা গানের ভুবনে নজরুলের আধুনিক গান ছিল বহুলাংশে দীপ্তিমান সঙ্গীতধারা। দীর্ঘ মনোরঞ্জনের দাবি নিয়ে যে গান বাঙালি শ্রোতার অন্তরে গভীর দাগ কেটেছে। হৃদয়ছেঁড়া অন্তহীন বেদনাসিক্ত সুররেখা- নজরুলের আধুনিক গানের সুরনির্মাণে সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক গানে যে জীবন ও জগৎচিত্র রূপায়িত হয়েছিল তাতে যৌবনস্পন্দিত নর-নারীর অনুভূতিমালা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। আত্তীকরণের অসাধারণ নৈপুণ্যে নিজের আধুনিক গানে দ্রবীভূত করেছেন রাগসুর বিদেশি সুর, লোকসুর প্রভৃতি। "নজরুলের নিপুণ বুনন ও পরিচর্যায় তাঁর আধুনিক গান শাশ্বত মানবাত্মার শিল্পিত অনুভব হয়ে উঠেছে। প্রচলিত রাগরাগিণীকে আশ্রয় করে আধুনিক গানের সুর নির্মিত হলেও সংগীতের প্রত্যেকটি সুর ও শ্রুতিকে অপূর্ব মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে বাণীকে দিয়েছেন নতুন আবেগ ও নতুন গতি। এ জন্যে তাঁর আধুনিক গান বাংলা গানের ভাণ্ডারে নতুন স্বাদ ও গন্ধে সুচিহ্নিত। তাঁর আধুনিক গান শুনতে শুনতে আমাদের মনে একটা অনবদ্য সৌন্দর্যের পরিমণ্ডল তৈরি হয়।"[১১] কথা ও সুরের সহাবস্থান বাংলা গানের প্রারম্ভিক ঐতিহ্যের অংশ। হাজার বছরের বাংলা গানের যে বৈচিত্র্যময় শতেক ধারা, তাতে নিধুবাবুর রচনাকাল থেকে আরম্ভ করে নজরুল পর্যন্ত আধুনিক শ্রেণির গানেরই শ্রোতাপ্রিয়তা অন্যান্য গানের চেয়ে বেশি। দেশি সঙ্গীতের ধারায় কথা ও সুর মিলেমিশে একাকার হয়ে রচিত ও বিকশিত হয়েছে বাংলা গান। সুরকে কথার অনুগামী করে বাণীবাহিত ভাবের সার্বভৌম রূপ প্রকাশিত

হয়েছে বাংলা গানে। সুর দ্বারা বাণীর ভাবকে প্রকাশ করে তোলাই বাঙালি সঙ্গীত রচয়িতাদের মূল উদ্দেশ্য। আঠারো শতকের শেষভাগে রামনিধি গুপ্তের হাতে সূচনা হয়েছিল, মর্তবাসী নর-নারীর মিলন- বিরহের প্রেমানুষঙ্গ নিয়ে রচিত আধুনিক গান। পরবর্তীতে বাংলা গানের সর্বাধিক বিস্তার ঘটেছিল কাব্যসঙ্গীতের এই আধুনিক ধারায়ই। বাংলা গানের বহু প্রাচীন ঐতিহ্য, রূপ ও রীতিকে স্মরণে রেখে, বাংলা গান নতুন সম্ভাবনার ঐশ্বর্যে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে বিভিন্ন সময়ে। 'আধুনিক গান' বাংলা গানের তেমনই চিত্তনন্দিত আর ঐশ্বর্যশীল গীতধারা, যার মাধ্যমে বাংলা গানের বহুল বিকাশ ঘটেছে বিশ্বময়। নিধুবাবুর টপ্পাগান দিয়েই বাংলা গানের মানবিকতার দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। সকল প্রকার দৈবিকতা ও আধ্যাত্মিকতামুক্ত গীত রচনার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন রামনিধি গুপ্ত। বাংলা গানকে তিনি সাধনসঙ্গীতের পর্যায় থেকে নরনারীর ভালোবাসার গানে পর্যবসিত করেছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল প্রসাদ সেন, কাজী নজরুল ইসলামসহ সমকালীন বহু গীতিকার এই ধারায় গান লিখেছেন। কিন্তু সৃজন সফলতায় তুঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের আধুনিক গান। বাংলা গানের এমন জননন্দিত ধারা নজরুলের যথার্থ জীবনানুভূতি, মধুময় বাণী আর সুরম্য সুর রচনায় এক গৌরবময় সঙ্গীতধারায় উপনীত ও বিকশিত হয়েছে। সমকালীন বিশিষ্ট সঙ্গীতকারদের মধ্যে, আধুনিক ধারার প্রধান সঙ্গীতকার নজরুলের আধুনিক গানের সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, মূলভাব, বৈচিত্র্য, কৌশলে স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ স্থায়ী। কাজী নজরুল ইসলামের সামগ্রিক সাঙ্গীতিক অর্জনের মধ্যে আধুনিক গান অন্যতম। বাংলা গানের সুদীর্ঘ পথচলায় আধুনিক গানের সৃজনে কাজী নজরুল ইসলাম আলোকোজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছেন।

আধুনিক গানে সুরের সঙ্গতিতে তাল ও ছন্দ প্রয়োগের বিষয়ে অসাধারণ কুশলতা অবলম্বন করেছেন নজরুল যা এ গানকে আরও হৃদয়গ্রাহী করেছে। এ গানের সুর ও ছন্দ চিত্তকে দোলা দিয়ে চঞ্চল করে তোলে। জনআকাঙ্খা হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করতেন বলেই বিপুলতা পেয়েছে নজরুলের গান। আধুনিকতাই সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য কাজী নজরুল ইসলামের গানের। গ্রামোফোন, বেতার, মঞ্চনাটক, চলচ্চিত্র সকল মাধ্যমেই গান রচনার যে ধারা প্রবর্তিত হয়েছে, সে ধারায় নজরুলের অংশগ্রহণ সম্মুখগামী। "আধুনিক বাংলা গান নামে খ্যাত সঙ্গীতরীতির প্রবর্তনে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান অতীব উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে এই গীতিধারা প্রতিষ্ঠায় প্রধান প্রেরণা তাঁর রচনা থেকেই এসেছিল। জনরুচির পরিপ্রেক্ষিতে জনবোধ্য, জননন্দন সঙ্গীত রচনাই ছিল আধুনিক গীতধারার প্রধান প্রবণতা। নজরুল-প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জনচিত্তমনস্কতা। জনহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে অতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে রূপায়িত করতে জানতেন বলেই নজরুলের গান এমন বিপুলভাবে শ্রোতৃচিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। এই অর্থে আধুনিকতাই কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীত প্রতিভার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফলে বেতার, গ্রামোফোন রেকর্ড, সবাক চিত্র প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে জননন্দন সঙ্গীত রচনার এই ধারা যখন গড়ে উঠতে থাকল,

তখন অতি অনায়াসে তিনি তাঁর নেতৃত্ব দিতে পারলেন। বাংলা প্রেমের গানের একটি অসাধারণ পর্ব নজরুলের আধুনিক গান শ্রেণির রচনাকে কেন্দ্র করে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল।

নজরুল বাংলা প্রীতিগীতিকে যৌবনস্পৃষ্ট মানুষের হৃৎস্পন্দনে আকুল করে তুলেছিলেন। এ গান যথার্থই সাধারণ মানুষের হৃদয়সঙ্গীতে পরিণত হয়েছিল। ... নজরুলের প্রেমের গান যথার্থই মানুষের যৌবন বেদনার গান। উচ্ছ্বাসে, অনুরাগে, বিফলতায় যে গান গৃহবাসী মানুষের অনুভব ও স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি। এর সুর দ্রুতগতিতে শ্রোতৃচিত্তকে চঞ্চল করে তোলে, তালছন্দে হৃদয় দোলে। সার্বজনীন হৃদয়সঙ্গীত হওয়ার সকল উপাদানই এই সঙ্গীতে বর্তমান। এই জন্যেই বিশেষ করে সবাক বাণীচিত্র ও রেকর্ড কোম্পানি সমূহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাংলা আধুনিক গান বা আধুনিক প্রেমের গানের সুবর্ণপ্রস্থ ধারাটির প্রতিষ্ঠাকালীন নেতৃত্ব নজরুলের কাছ থেকে আসা সহজ হয়েছিল।"[১২] কাজী নজরুল কালের প্রয়োজন মিটিয়েছেন বলেই তাঁর গান কালোত্তর হয়েছে। সে কারণেই কাজী-নজরুল-ইসলাম হয়েছিলেন বাঙালির কাছে অসামান্য লোকপ্রিয় সঙ্গীতকার। সুরসমৃদ্ধ কালপ্রবাহের উৎসসলিলে নজরুল অবগাহন করেছিলেন। সেই কারণেই সময়ের উপযোগী আধুনিক চেতনাযুক্ত কথা ও সুর তাঁর গানের মধ্যে তীব্রভাবে স্পন্দিত হয়েছিল এবং কাম্য শ্রোতাপ্রীতি অর্জন করেছিল সে গান। নজরুলের আধুনিক গান রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা গানের সীমানা সম্প্রসারিত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *আধুনিক বাংলা গান*, প্রতিভাস, কলকাতা, আগস্ট ২০১৫; পৃষ্ঠা ২৩

২. সুধীর চক্রবর্তী, *শতশত গীত মুখরিত*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, মে ২০১৮; পৃষ্ঠা ২১৪, ২১৫

৩. সুধীর চক্রবর্তী, *বাংলা গানের সন্ধানে*, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩; পৃষ্ঠা ৬৭

৪. সুধীর চক্রবর্তী, *শত শত গীত মুখরিত*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ২২২

৫. সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *আধুনিক বাংলা গান*, পাগুক্ত; পৃষ্ঠা ১৯

৬. সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *আধুনিক বাংলা গান*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ২০

৭. সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *আধুনিক বাংলা গান*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ১৯

৮. সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *আধুনিক বাংলা গান*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ১৭, ১৮

৯. স্বপ্না বন্দোপাধ্যায়, *সমকালের বাংলা গান: রবীন্দ্র সংগীত*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২; পৃষ্ঠা ২৫৫, ২৫৬, ২৫৮

১০. হায়াৎ মামুদ ও জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত সম্পাদিত, *তোমার সাম্রাজ্যে, যুবরাজ, আধুনিকতা: বাংলা গান: নজরুল ইসলাম : করুণাময়গোস্বামী*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯; পৃষ্ঠা ৫২৭, ৫২৮

১১. মোহাম্মদ আবুল খায়ের, *নজরুল সংগীতে নান্দনিকতা*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৪; পৃষ্ঠা ৮৫

১২. করুণাময় গোস্বামী, *শতবর্ষের বাংলা গানে নজরুলের স্বাতন্ত্র, নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা*, ঢাকা, এপ্রিল ২০০১; পৃষ্ঠা ৮২৪ ।

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক বাংলা গানের অমর রূপকারগণ ও তাঁদের গান

বহু জনাদরধন্য গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী তাঁদের সৃজনসুষমায় বেদনাবিলাসী গীতপ্রয়াসে বাঙালির অন্তরকে ঝরা কুসুমের মতো রিক্ত করেছে আবার সুখঅনুভবে জীবনতরণীতে মহাগীতে মহানন্দের পালও তুলে দিয়েছেন। যেমন- সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া স্মরণীয় গান– জানি একদিন আমার জীবনী লেখা হবে, তালাত মাহমুদের মন রাঙানো গান– ঘুমের ছায়া চাঁদের চোখে এ মধুরাত নাহি বাকি, নির্মলা মিশ্রের বিখ্যাত হৃদয়ভাঙা গান– এমন একটা ঝিনুক খুঁজে পেলাম না যাতে মুক্তো আছে, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুরেলা গান– বনে নয় মনে মোর পাখি আজ গান গায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া চিরদিনের প্রেমের গান– একটা গান লিখ আমার জন্য, প্রতিভাবান শিল্পী অখিলবন্ধু ঘোষের বিরহের গান– তোমার ভুবনে ফুলের মেলা প্রভৃতি। সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী, গীতিকার, সুরকার, অভিনয়শিল্পী, চিত্রশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী, কবি, সাহিত্যিকসহ শিল্পকলার সকল সংস্কৃতিগুণসম্পন্ন সুকুমার শিল্পীকে পরম রসপুরের অধিবাসী বলে অভিহিত করেছেন। রসলোকের তিয়াসা লয়েই তাঁদের আগমন সে দেশে। সেই রসরাজ্যের যাঁরা শিল্পী, তাঁরা চিরঅমৃত পিয়াসী। সেই রসিক ভুবনে কোনো বর্ণভেদ, জাতিভেদ নেই। চিরশ্যামল সেই বসুন্ধরায় বাতাসে গীতিগন্ধভরা, নীল আকাশে চিরজ্যোৎস্নাশোভিত। সেথা অমৃত রসস্নাত সকলের তনু মন প্রাণ। রসলোকের তৃষ্ণা প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বলেছেন: "এখানে অনেক কবি এসেছেন যাঁদের আছে রসলোকের তৃষ্ণা! যিনি চিত্রকর, যিনি কবি তিনি এই রসে রসায়িত। এই রসলোকে কোন জাতিভেদ নাই–অভেদ, পরমলোক। কোরান শরিফে বলে : রওশন। এই রসালোকে একমাত্র যেতে পারেন শিল্পী, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ–যাঁরা সুকুমার শিল্পের চর্চা করেন, যাঁদের সৃষ্টি সবার ঘরে ঘরে।"[১]

সমকালের সকল রচয়িতাদের মধ্যে নজরুল প্রেমের গান রচনায় শ্রেষ্ঠতম হিসেবে তুল্য। একটি সম্পূর্ণ গান উপহার দেবার জন্য আধুনিক গানের যুগে এসে তিন বিশেষজ্ঞ প্রয়াসের সমবায় ধারা প্রবর্তিত হলো। খ্যাতিমান বাঙালি কবিরা সঙ্গীত রচয়িতারূপে পূর্বাপর প্রচলিত ধারা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করলেন। গীতরচনার প্রধান বিশেষজ্ঞ হিসেবে আবির্ভূত হলেন প্রধান বাঙালি কবিরা। কাব্যরচনা দুটি পৃথক ধারায় বিচ্ছিন্ন হলো; কবি ও গীতিকবি। গীতরচনায় আবির্ভাব ঘটল গীতিকবির। গীতরচনায় স্বাভাবিক প্রেরণা নিয়ে এ সব কবিদের আগমন ঘটেনি বাংলা গানে বরং চিত্তাকর্ষক বাণী রচনার দক্ষতা, শব্দচয়নের ও উপমা ব্যবহারের নৈপুণ্য, সুখশ্রাব্যতা সর্বোপরি গানের রচনা সম্পর্কে বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। নজরুলের

সমকালীন প্রতিভাবান সঙ্গীত রচয়িতারা বহুকালের প্রথাবদ্ধ সঙ্গীত রচনার কৌশল থেকে ফিরে নজরুল প্রবর্তিত শ্রমবিভাজন নীতি গ্রহণ করলেন। ফলে একই রচয়িতার হাতে একই গানের গীতরচনা, সুরযোজনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কণ্ঠে গীতের রূপদানের রীতি পর্যন্ত থমকে গেল। সুরসৃষ্টিতে এগিয়ে এলেন প্রশিক্ষিত এবং ক্রিয়াত্মক সঙ্গীতের রহস্যাবলী যাঁদের অধিগম্য, পেশাদারী কুশলতা আয়ত্তসম্পন্ন তেমন সুরকারগণ। আধুনিক বাংলা গানের কথা ও সুরের ভুবনে ব্যতিক্রম ঢংয়ের অবতারণা করেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল। বাংলা গানের ইতিহাসের প্রতিভাবান গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পীর বর্ণিল সমাহারে এক সুবর্ণপ্রসূকাল অতিবাহিত হয়েছে কয়েক দশক। পরবর্তীকালের সেই শৈলী অবলম্বন করে ত্রিশ থেকে ষাটের দশকের গীতিকার হিসেবে খ্যাতিমান হয়েছিলেন– হেমেন্দ্রকুমার রায়, হীরেন বসু, সুবোধ পুরকায়স্থ, অজয় ভট্টাচার্য, সুধীন দাশগুপ্ত, অনিল ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, বাণীকুমার, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মোহিনী চৌধুরী, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, প্রণব রায়, পবিত্র মিত্র, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল দত্ত, শ্যামল গুপ্ত, নিশিকান্ত প্রমূখ।

সুরকারদের মধ্যে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন– তুলসী লাহিড়ী, কমল দাশগুপ্ত, অনুপম ঘটক, অনিল বাগচী, সুবল দাশগুপ্ত, দিলীপ কুমার রায়, সুধীরলাল চক্রবর্তী, হিমাংশু দত্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিনয় গোস্বামী, নিতাই মতিলাল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, রাইচাঁদ বড়াল, নচিকেতা ঘোষ, অনিল বিশ্বাস, সুকৃতি সেন, রাহুল দেব বর্মন, সলিল চৌধুরী, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, প্রবীর মজুমদার, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিন চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপম ঘটক প্রমুখ। বাংলা আধুনিক গানের ইতিহাসে যাঁদের অবদান অক্ষয় স্থানলাভ করেছে, সেইসব শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিলীপ কুমার রায়, কানন দেবী, যুথিকা রায়, কে মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ইন্দুবালা দেবী, শৈল দেবী, আঙুরবালা দেবী, হরিমতি, কমলা ঝরিয়া, রাধারানী দেবী, সত্য চৌধুরী, রবীন মজুমদার, শচীন দেব বর্মণ, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, মৃণাল কান্তি ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, কে.এল সায়গল, সুপ্রভা সরকার, জগন্ময় মিত্র, সন্তোষ সেনগুপ্ত, দিপালী নাগ, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, গৌরীকেদার ভট্টাচার্য, বেচু দত্ত, ধীরেন বসু, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, প্রতিভা বসু, ফিরোজা বেগম, ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, পুরবী দত্ত প্রমুখ। এছাড়া সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, অখিল বন্ধু ঘোষ, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, শচীন দেব বর্মণ, মোহাম্মদ রফি, তালাত মাহমুদ, কিশোর কুমার, আরতি মুখোপাধ্যায়, সুবীর সেন, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য, উৎপলা সেন, ভূপেন হাজারিকা, সুমন কল্যাণপুর, শিপ্রা বসু, নির্মলা মিশ্র, ইলা বসু, হৈমন্তী শুক্লা, গীতা দত্ত, অজয় চক্রবর্তী, অনুপ ঘোষাল, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

সুরকার কমল দাশগুপ্তের গান (১৯১২-১৯৭৪)

বাংলা গানের অসামান্য প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব কমল দাশগুপ্ত। তাঁর নাম মনে এলেই অজস্র গান ভিড় করে আমাদের স্মৃতিতে। প্রযুক্তির প্রবল দাপটে এবং বিরামহীন ব্যস্ততার অবসরেও যে গান আমরা ভুলতে পারিনি আজও- এমনই বরষা ছিল সেদিন, দুটি পাখি দুটি তীরে, হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে, গভীর নিশিথে ঘুম ভেঙে যায়, এই কিগো শেষ দান, ভীরু এ মনের কলি, মেনেছি গো হার মেনেছি, কত দিন দেখিনি তোমায়সহ অসংখ্য গান। এমন হাজার কালজয়ী গানের মাঝে জেগে আছে সুরকার কমল দাশগুপ্তের মতো, গীতিকার এবং কণ্ঠশিল্পীদের সুগভীর সঙ্গীতপ্রেম, গান তৈরীর অগণিত স্মৃতি আর সে গানে শ্রোতাদের মন উদাস করা অনুভূতি আর অপরিমেয় ভালোবাসা। কমল দাশগুপ্তের জন্মস্থান, পড়াশুনা, শৈশব কৈশোর ও পেশাগত জীবনে প্রবেশের আগপর্যন্ত কোন জায়গায় কী করেছেন এসব বিষয় নিয়ে একদম নিখুঁত তথ্য নেই তেমন।

প্রসিদ্ধ সুরকার কমল দাশগুপ্তের জন্ম ১৯১২ সালের ২৮ জুলাই। আদিনিবাস তৎকালীন যশোর জেলায় এবং বর্তমান নড়াইলের কালিয়া থানার বেন্দা গ্রামে। আবার কোথাও পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহারে জন্মের কথা উল্লেখ আছে। পিতার নাম তারা প্রসন্ন দাশগুপ্ত, মাতার নাম প্রমোদিনী দাশগুপ্ত। যতটুকু জানা যায় বাবা তারা প্রসন্ন দাশগুপ্ত ব্যবসার সূত্রে এক সময় কুচবিহার ও পরে কুমিল্লা শহরে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। কমল দাশগুপ্তের পুরো নাম কমল প্রসন্ন দাশগুপ্ত। কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র ছিলেন কমল দাশগুপ্ত এবং এ প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন। এরপর দাশগুপ্ত পরিবার কলকাতায় চলে আসেন কুমিল্লা ছেড়ে। "ওই সময়ই তারা সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন এবং কমল দাশগুপ্ত আমহার্স্টস্ট্রিটের 'ক্যালকাটা একাডেমী'তে ভর্তি হয়েছিলেন। ওই স্কুল থেকেই ১৯২৮ সালে কমলপ্রসন্ন (সঙ্গীত জীবনে 'প্রসন্ন' ব্যবহার করেননি) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।"[২] তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রথিতযশা সুরকার হিসেবেই সমধিক বিখ্যাত ও পরিচিত। একাধারে কমল দাশগুপ্ত ছিলেন গায়ক, সুরকার, যন্ত্রী, সংগীত পরিচালক, সঙ্গীত প্রশিক্ষক। সঙ্গীত জগতে প্রবেশের ইতিহাস তাঁর যতদূর জানা যায়– পিতা তারা প্রসন্ন দাশগুপ্তের কাছে সঙ্গীতে হাতেখড়ি এবং পরে অগ্রজ বিমল দাশগুপ্ত তাঁকে গান শেখান। কলকাতায় গিয়ে হাতে নাড়া বেঁধে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম নেন তখনকার সময়ের বিখ্যাত ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁর কাছে। কমল দাশগুপ্ত সুর প্রয়োগের কৌশল এবং সংগীতের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাঁর প্রিয় কাজীদার (কাজী নজরুল ইসলাম) কাছে। "কমল দাশগুপ্ত কিছুদিন ঠুংরীর বাদশাহ উস্তাদ জমিরউদ্দিন খাঁন সাহেবের কাছে গান শেখার সুযোগলাভ করেন এবং ওস্তাদের একান্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। একই সাথে ওস্তাদ জমির উদ্দিন ও কবি নজরুলের সান্নিধ্যলাভ করায়

আরবি, ফার্সি ও অন্যান্য শব্দের উচ্চারণের নানা মুসলমান কায়দা কানুনগুলো বেশ রপ্ত করে নেন কমল দাশগুপ্ত। তাঁর এসব বিশেষ গুণাবলী ও দক্ষতা লক্ষ্য করে, কবি নজরুল ইসলাম তাঁর কিছু ইসলামি গান বিনা দ্বিধায় সুর করার জন্য কমল দাশগুপ্তের হাতে তুল দেন। নিম্নে উদ্ধৃত গান দুখানির শিল্পী রওশন আরা বেগম। রওশন আরা বেগম নামটি আসলে কোনো হিন্দু শিল্পীর ছদ্মনাম। হে প্রিয়নবী রসূল আমার / পরেছি আভরণ নামেরি তোমার এবং হেরেমের বন্দিনী কাঁদিয়া ডাকে তুমি শুনিতে কি পাও। গান দু'খানার শিল্পী রওশন আরা কমল দাশগুপ্তের পরিচালনায় রেকর্ড করেন। রেকর্ড নম্বর ৯৭৯৩।"[৩]

কমল দাশগুপ্ত খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী ও গজলের তালিম নিয়েছেন বিখ্যাত সঙ্গীতকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপ কুমার রায়, প্রখ্যাত শিল্পী মান্না দে'র কাকা অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের কাছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীত এবং অর্কেস্ট্রার মিউজিক রচনা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন এইচ.এম.ভির অর্কেস্ট্রা পরিচালক নিউম্যানের কাছে। কমল দাশগুপ্ত ও সুবল দাশগুপ্ত দুই ভাই কৈশোরে গ্রামোফোন কোম্পানিতে আসা-যাওয়া শুরু করেন অগ্রজ বিমল দাশগুপ্তের সহকারী হিসেবে। কুড়ি বছর বয়সে গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হন পাকাপাকিভাবে। কমল দাশগুপ্ত নজরুলের সহযোগীও ছিলেন কিছুকাল। বড়ভাই বিমল দাশগুপ্তের অনুপস্থিতিতে গানের সুর দেয়া আরম্ভ করেন গানে। সঙ্গীত জগৎ তথা বাংলা গানের জগতে কমল দাশগুপ্তের প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতির পেছনে কাজী নজরুল ইসলাম ইসলামের অবদান ছিল সবচেয়ে বড়। "কমল দাশগুপ্ত নিজপ্রতিভা বলে ও অধ্যবসায়ের ফলে কবি নজরুলের স্নেহস্পর্শে ধন্য হয়েছিলেন। কবি বিনাদ্বিধায় এই প্রতিভাবান সুরকারকে তাঁর লেখা নানা ধরনের গান দিয়েছেন সুর করার জন্য। নজরুলের লেখা আধুনিক ভজন কীর্তন ইত্যাদি গান ছাড়াও ইসলামী গানের সুরারোপ করে সমান সুনাম অর্জন করেন কমল দাশগুপ্ত।"[৪] নজরুলের সাহচর্য, পরামর্শ, সাঙ্গীতিক নির্দেশনা, সহযোগিতা কমল দাশগুপ্তের খ্যাতির পেছনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল সে কালে। মাত্র ২৩ বছর বয়সে এইচ.এম.ভির সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালকরূপে যোগদান করেন। এছাড়াও কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানিসহ অন্যান্য গ্রামোফোন কোম্পানিতে কাজ করেছেন। ব্যক্তিজীবনে অনেক যন্ত্র বাজাতে পারতেন তিনি। যেমন: ম্যান্ডোলিন, জাইলোফোন, পিয়ানো, তবলা প্রভৃতি। ১৯৩৪ সালে প্রথম স্বাধীনভাবে নজরুলের গানে সুরারোপ করা শুরু করেন কমল দাশগুপ্ত। একবার গ্রামোফোন কোম্পানিতে এক মাসে ৫৩ টি গানের সুরারোপ করে সবাইকে অবাক করে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য রচিত রণসঙ্গীত– 'কদম কদম বারহায়ে যা'র সুর কমল দাশগুপ্তেরই করা। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি উর্দু ভাষায় কাওয়ালী গান গেয়েছেন বলে জানা যায়।

কাজী নজরুল ইসলামের রচিত তিনশ (৩০০) গানেরও অধিক গানে সুর দিয়েছেন কমল দাশগুপ্ত। কমল দাশগুপ্তের আপন প্রতিভা ও নিষ্ঠার ফলে অল্পদিনেই তাঁর সুনাম বাংলা অঞ্চল ছাড়িয়ে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। কমল দাশগুপ্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু গীতিকার প্রণব রায় কমলের প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির পেছনে নজরুলের ভূমিকার কথা তুলে ধরেছেন এইভাবে– "কমল দাশগুপ্তের সুরের ওপর কাজীদার খুবই একটা ভাল ধারণা শুধু বলবো না, কমলের সুরকে কাজীদা আদর করতেন। সেই জন্য অনেক ভাল ভাল গান লিখে কমলকে দিতেন। তার মধ্যে মনে আছে যূথিকা রায়ের রেকর্ড করা গান তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম"[৫] গ্রামোফোন কোম্পানিতে কমল দাশগুপ্তের সুর করা গানের ডিস্কের সংখ্যা আট হাজার। ১৯৫৮ সালে সে কারণে এইচ.এম.ভিতে কমল দাশগুপ্তের সুর করা গানের সিলভার গোল্ডেন জুবিলী পালিত হয়েছে। পরবর্তীতে কলকাতায় রেডিও অডিশন বোর্ডের প্রধান ছিলেন কমল দাশগুপ্ত। স্বরলিপির শর্টহ্যান্ড পদ্ধতির প্রবর্তক ছিলেন তিনি এবং আকার মাত্রিক স্বরলিপির উপরেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিরিশ এবং চল্লিশের দশকে গ্রামোফোন কোম্পানির ডিস্কে তাঁর সুরে গাওয়া অসংখ্য গান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল যা তৎকালীন মানুষের মনের মধ্যে এক ধরনের আলোড়ন তুলেছিল। গ্রামোফোন কোম্পানি, বেতার ও চলচ্চিত্র তিনটি মাধ্যমেই জড়িত থেকে তিনি তাঁর প্রতিভার সুষ্ঠু পরিচয় দেন। "হিজ মাস্টার্স ভয়েস এর হিসেব অনুযায়ী তাঁর সুরারোপিত গানের ডিস্কের সংখ্যা প্রায় ৮০০০। তিনি রেডিওর অডিশন বোর্ডের প্রধান ছিলেন। ১৯৩৪ সাল থেকে তিনি স্বাধীনভাবে কাজী নজরুল ইসলামের গানের সুর করতে থাকেন। তিনি প্রায় ৩০০ নজরুল সংগীতের সুর দিয়েছেন।"[৬] ব্যক্তিগত জীবনে পরিপূর্ণভাবে সঙ্গীতমগ্ন এক সাধক ছিলেন কমল দাশগুপ্ত। সংগীতের জগতে কমল দাশগুপ্তের আবির্ভাব প্রথমে জনপ্রিয় গায়ক হিসেবে, সুরকারের ভূমিকায় আসেন পরে। বহুদিন নিষ্ঠার সঙ্গে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখেছেন। নিজের কণ্ঠে অনেক গানের রেকর্ডও প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর। খেয়াল, ঠুমরি ও গজলে কমল দাশগুপ্তের বিশেষ দখল ছিল। একক ও দ্বৈত কণ্ঠে অনেক বাংলা ও হিন্দি গান রেকর্ড করেন। নজরুলসঙ্গীত, আধুনিক, কীর্তন, গজল, ভজন এসব গানের মধ্যে অন্যতম। যূথিকা রায়ের সঙ্গে তাঁর সব থেকে বেশি গাওয়া দ্বৈত গান। অনাদি দস্তিদার ও ব্রজেন গাঙ্গুলির কাছে রবীন্দ্র সংগীতও নিষ্ঠার সাথে শিখেছিলেন। সুর সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের গান শেখা তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে। দিলীপ কুমার রায়ের কাছে পাশ্চাত্য সংগীতের শিক্ষালাভ করেছিলেন। তখনকার সময় বাংলা গানের খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছিলেন শচীন দেব বর্মণ, পঙ্কজ কুমারার মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, তুলসী লাহিড়ী, হিরেন বসু, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, অনুপম ঘটক, দুর্গা সেন, রাইচাঁদ বড়াল, সুরসাগর হিমাংশু দত্তের মতো দিকপাল সুরস্রষ্টাগণ, ফলে শ্রী দাশগুপ্তের জন্য প্রতিষ্ঠা পাওয়া একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। জমির উদ্দিন খাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত শ্রী দাশগুপ্ত তাঁর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়। গ্রামোফোন কোম্পানির ব্যস্ততম দিনে যখন একটুও অবসর ছিল না কমল

দাশগুপ্তের, তখনও তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নিয়েছেন বিভিন্ন গুরুদের কাছে। বহুরাত নির্ঘুমও কাটিয়েছেন শুধুমাত্র রেওয়াজের জন্য, সুরসাধনার জন্য, সেজন্যই সুর তাঁর চিরআপন হয়েছে। সঙ্গীতের প্রতি এমন ভক্তিপূর্ণ সাধনা ছিল বলেই প্রতিভাবান এই সুরস্রষ্টা গানের অসংখ্য রতনহার নির্মাণে সমর্থ হয়েছিলেন। হেমচন্দ্র সোম ছিলেন তখনকার গ্রামোফোন কোম্পানির অধিকর্তা। তিনি কমল দাশগুপ্ত সম্পর্কে গবেষক কল্যাণ বন্ধু ভট্টাচার্যকে বলেছিলেন এবং পরবর্তীতে তাঁর 'সুরকার কমল দাশগুপ্ত' প্রবন্ধেও লিখেছিলেন এভাবে–"গ্রামোফোন কোম্পানিতে যাঁরা গান করেছেন তাঁরা সবাই জমির উদ্দিন খাঁর ছাত্র। কিন্তু জমিরউদ্দিন খাঁনের একমাত্র ছাত্র কমল দাশগুপ্ত। এই বক্তব্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য তাঁর লেখা 'সুরকার কমল দাশগুপ্ত' প্রবন্ধে লিখেছেন- অর্থাৎ গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য বা তার বাইরেও অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠিত শিল্পীই জমির উদ্দিন খাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেছেন। কণ্ঠসংগীতে কমল দাশগুপ্তের অপেক্ষা অনেক পারদর্শিতাও লাভ করেছেন কিন্তু এই 'ঠুংরী রাজা'র সুরসম্পদ থেকে এত বেশি আহরণ করেননি এবং তাঁকে আত্তীকরণ করে বাংলা এবং হিন্দি সংগীতে প্রয়োগ করেননি।"[৭]

পূর্বপুরুষের পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারায় দাশগুপ্ত পরিবারে আগে থেকেই সঙ্গীতচর্চা ছিল। পিতামহ কামিনী রঞ্জন দাশগুপ্ত এবং তারাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা করতেন, বিশেষ করে ধ্রুপদের চর্চা। তাঁর তিন বোন, তিন ভাই গানবাজনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। কমল দাশগুপ্তের ভাইদের নাম বিমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত। বোনদের নাম ইন্দিরা সেন, সুধীরা সেনগুপ্তা। কনিষ্ঠ বোনের নাম পাওয়া যায়নি। কমল দাশগুপ্তের অগ্রজ বিমল দাশগুপ্ত সঙ্গীত ও জাদুবিদ্যায় খুবই পারদর্শী মানুষ ছিলেন এবং জাদুবিদ্যা ইউরোপ এবং আমেরিকাতে গিয়ে ভালোভাবে রপ্ত করে এসেছিলেন বলে, স্বীকৃতি ও সম্মানসূচক উপাধি পান। জাদুবিদ্যার জন্য তিনি 'প্রফেসর' উপাধি পেয়েছিলেন। সবাই তাঁকে প্রফেসর বিমল দাশগুপ্ত নামে জানতেন। এই বিমল দাশগুপ্ত নজরুলের বহু হাসির গান রেকর্ড করেছিলেন। হাসির গান ও ভোজনরসিকতার জন্যও তিনি বিখ্যাত ছিলেন। এইচ.এম.ভির অঙ্গপ্রতিষ্ঠান টুইনের প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন বেশ কিছুকাল বিমল দাশগুপ্ত। তিনি গানের সুর করা বিষয়ে ভাইকে অভিজ্ঞতা অর্জন করানোর জন্য চিৎপুর রোডে অবস্থিত বিষ্ণু ভবনের রিহার্সেল রুমে মাঝেমধ্যে নিয়ে যেতেন। "সে সময় সারাবছর রেকর্ডিং হতো না। কয়েক মাস একনাগাড়ে অনেক গান রেকর্ড হওয়ার পর, কয়েক মাস আবার রেকর্ডিং বন্ধ থাকত। বিমল দাশ গুপ্ত সে সময়ে জাদুবিদ্যা প্রদর্শনের জন্য সারা ভারতের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়াতেন। এমনকি অনেক সময় রেকডর্ডিং চলাকালীনও তাঁকে জাদু খেলা দেখানোর জন্য যেতে হতো। বলাবাহুল্য যৌথ পরিবার চালানোর বিরাট দায়িত্ব তাঁর কাঁধে ছিল বলে তাঁকে অর্থোপার্জনে বিশেষ আগ্রহী হতে হয়েছিল। দাদার অনুপস্থিতিতে শুধু রেকর্ডিংয়ের সময়ই কমল দাশগুপ্ত দেখাশুনা করতেন না,

অনেক সময় দাদার হয়ে তিনি গানে সুরও দিতেন এবং শিল্পীদেরও সেইসব গান তুলে দিতেন। প্রথম সেশনেই তিনি দাদার জন্য নির্দিষ্ট প্রায় একশোটি গানের মধ্যে তিরিশ-চল্লিশটি গানে সুর দিয়েছিলেন, দাদার চাকরি বজায় রাখতে। কমল দাশগুপ্তের সুরে প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩২ সালে এপ্রিল মাসে, সত্যবতীর (পটল) কণ্ঠে। সেই প্রথম রেকর্ডের (এফ.টি .৯২৬) গান দুটি ছিল গানের মালা গেঁথে গেঁথে এবং কতকাল আছি চেয়ে চেয়ে।"[৮]

বড়ভাই বিমল দাশগুপ্তের অনুপস্থিতিতে প্রায়ই তাঁর গানে সুর করে দিতেন কমল দাশগুপ্ত। সুবল দাশগুপ্ত, কমল দাশগুপ্তের অনুজ ভ্রাতা। তিনিও ছিলেন কমল দাশগুপ্তের মতো বিরাট সুরস্রষ্টা। তাঁর সুরে গান করেছেন জগন্ময় মিত্র, রবীন মজুমদার, গৌরীকেদার ভট্টাচার্য, বেচু দত্ত, কুন্দনলাল সায়গলসহ আরো অনেক বিখ্যাত শিল্পীরা। সুবল দাশগুপ্তের সুরারোপিত সায়গলের গান- এখনি উঠিবে চাঁদ আধো আলো আধো ছায়াতে, নাইবা ঘুমালে প্রিয় রজনী এখনো বাকি। জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে গান-সাতটি বছর আগে, সাতটি বছর পরে ও চিঠি। রবিন মজুমদারের -চাঁদের আলোর দেশে গো। নজরুলের খুব স্নেহধন্য ছিলেন কমল দাশগুপ্তের দুই বোন ইন্দিরা ও সুধীরা। শুধু ভালো গান গাইতেন বলে। নজরুলের রচিত দশ হাতে ওই দশদিকে মা, প্রেম নূপুর বাঁধি, মা এসেছে মা এসেছে, সুন্দর নন্দদুলাল গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন তিন ভাই বোন- কমল, সুবল ও সুধীরা। কাজী নজরুল ইসলামের পরে কমল দাশগুপ্ত সবচেয়ে বেশি গান রেকর্ড করেছেন, তাঁর প্রিয় বন্ধু প্রণব রায়ের কথায়। কমল দাশগুপ্তের সুর আর প্রণব রায়ের কথা-- এই দুই'য়ে মিলে বাংলা গান গভীর আবেদনময় ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সে কালে। কাজী নজরুল, প্রণব রায়, মোহিনী চৌধুরী, সুবোধ পুরকায়স্থ প্রমুখ গীতিকারদের কথায়, কমল দাশগুপ্তের সুরে যেসব গান তৈরী হয়েছে সেসব গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

"রেকর্ড নম্বর-- এন ২৭৩৩১,স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর, গীতিকার- কাজী নজরুল ইসলাম, সুরকার কমল দাশগুপ্ত, শিল্পী- যুথিকা রায়, মডার্ন/ ধীরে ধীরে বউ কথা কও, গীতিকার- প্রণব রায়, সুরকার- কমল দাশগুপ্ত, শিল্পী- যুথিকা রায়, মডার্ন।"[৯]

এছাড়াও কমল দাশগুপ্তের সুরে গভীর নিশিথে ঘুম ভেঙে যায়, রেকর্ড নম্বর– এইচ.এম.ভি এন ৩১৩১২, গীতিকার- কাজী নজরুল ইসলাম, সুরকার- কমল দাশগুপ্ত, শিল্পী- জগন্ময় মিত্র, আধুনিক/ আধখানা চাঁদ, গীতিকার- কাজী নজরুল ইসলাম, সুরকার- কমল দাশগুপ্ত, শিল্পী- জগন্ময় মিত্র, আধুনিক।

চরণ ফেলিও, গীতিকার- প্রণব রায়, রেকর্ড নম্বর– এইচ.এম.ভি এন ২৭০০৫, সুরকার- কমল দাশগুপ্ত, শিল্পী- যুথিকা রায়, মডার্ন। বনের তাপস কুমারী আমি গো, গীতিকার- কাজী নজরুল ইসলাম, সুরকার- কমল দাশগুপ্ত, শিল্পী-যুথিকা রায়, মডার্ন প্রভৃতি।

শিল্পী যূথিকা রায়ের সুরের গুরু ছিলেন কমল দাশগুপ্ত। একসঙ্গে অনেক হিন্দি ও বাংলা গীত গজল ভজনে কণ্ঠ দিয়েছেন। মিছে তুই আসার কুহকে ভুলে, ওগো সুন্দর দেবতা ইত্যাদি। উর্দুর পাশাপাশি তামিল ভাষার গানও দুজনে একসঙ্গে রেকর্ড করেছেন বহুসংখ্যক। বিখ্যাত মীরার ভজন কমল দাশগুপ্ত ও যূথিকা রায়ের কণ্ঠে এক অসামান্য আবেদন সৃষ্টি করেছিল তখনকার সময়ে। "৪৭ বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ও প্রখ্যাত নজরুল ইসলাম গীতি শিল্পী ফিরোজা বেগমের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বাংলাদেশের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসের প্রধান সঙ্গীত পরিচালক। প্রায় আশিটি ছায়াছবির সঙ্গীত পরিচালক। হিন্দি আধুনিক সঙ্গীত 'গীত' প্রচারে অবদান অপরিসীম। ভজন গানে বিশেষ দক্ষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মি.এলিস জনসন নামে এক আমেরিকান চিত্র পরিচালক কর্তৃক তাঁর 'ওয়ার প্রাপাগান্ডা' ছবির জন্য কমল দাশগুপ্তের কাছ থেকে ব্যাগরাউন্ড মিউজিক গ্রহণ। বাংলা-হিন্দি-উর্দু গজল, ভজন, উচ্চাঙ্গ সংগীত, হামদ, নাত, নজরুল ইসলাম গীতি সহ সংগীতের সকল শাখায় সমান দক্ষতার অধিকারী।"[১০] কাজী নজরুল ইসলামের সান্নিধ্যে তাঁর জীবনের সংগীতজ্ঞান পরিপূর্ণ ও মসৃণ হয়েছে সেজন্যই তিনি শুধু জনপ্রিয়ই হননি, বাংলা গানে আলাদা এক ধারা তৈরী করেছেন। ৪৩ বছর বয়সে ১৯৫৫ সালে ভালোবেসে বিয়ে করেন উপমহাদেশের কিংবদন্তি নজরুল সঙ্গীতশিল্পী ফিরোজা বেগমকে এবং বিয়ের ৪ বছর পরে ৪৭ বছর বয়সে ধর্মান্তরিত হন। ১৯৬৭ সালে ঢাকায় চলে আসেন কমল দাশগুপ্ত। কলকাতায় থাকাকালীন যে কমল দাশগুপ্ত ৩৭ হাজার টাকা আয়কর দিয়েছেন ১৯৪৭ সালের দিকে, সেই মানুষই জীবনের শেষবেলায় অর্থের অভাবে ঢাকার হাতিরপুলে (সেন্ট্রাল রোড) 'পথিকার' নামে একটি মুদিখানার দোকান দিয়েছিলেন। 'নাথ ব্যাংক' নামের একটি ব্যাংকের দেউলিয়ার কারণে নিজের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নিঃস্ব হয়েছিলেন। পারিবারিক সংকট এবং অর্থ হারানো তাঁর এমন নিদারুণ দুর্দশার কারণ বলে জানা যায়। মীরার ভজনে সুরকরার স্বীকৃতিস্বরূপ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যাল তাঁকে ১৯৪৩ সালে সম্মানসূচক 'ডক্টর অফ মিউজিক' ডিগ্রী প্রদান করে। ১৯৭৪ সালের ২০ জুলাই চরম অযত্ন ও অবহেলায় ঢাকার পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভীষণ অভিমান বুকে নিয়ে করুণভাবে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যান কমল দাশগুপ্ত। স্বকণ্ঠে কমল দাশগুপ্ত অনেক গান রেকর্ড করেছিলেন কিন্তু গায়কখ্যাতি তাঁর ভাগ্যে জোটেনি, অতুলনীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন বাংলা গানের সুরস্রষ্টা হিসেবে। কমল দাশগুপ্তের সুরে কিছু বাংলা গান–

বিভিন্ন গীতিকারের রচিত গানে কমল দাশগুপ্তের সুর করা কিছু গান

পৃথিবী আমারে চায় রেখো না বেঁধে আমায়

ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে

কত দিন দেখিনি তোমায়

এমনই বরষা ছিল সেদিন

দুটি পাখি দুটি তীরে

আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড়

চরণ ফেলিও ধীরে ধীরে প্রিয়

আমি বনফুল গো

ওগো মোর গীতিময়

ঘুমের ছায়া চাঁদের চোখে

মেনেছি গো হার মেনেছি

মন নিয়ে প্রিয় যেও না ফিরে

যেথা গান থেমে যায়

জানি বাহিরে আমার তুমি

যদি আপনার মনে মাধুরী মিশায়ে

তুমি কি এখন দেখিছো স্বপন

শোনো গো সোনার মেয়ে শোনো গো

শুধু জাগিতে এসেছি রাতি

জানি জানি গো মোর শূণ্য হৃদয় দেবে

ভুলি নাই ভুলি নাই

আমি ভুলে গেছি তব পরিচয়

মোর হাতে ছিল বাঁশি

শতেক বরষ পরে

নিওনা গো অপরাধ

আশা দিয়ে চলে যায়

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গানে কমল দাশগুপ্তের সুরকরা কিছু গান

গভীর নিশিথে ঘুম ভেঙে যায়

ভীরু এ মনের কলি ফোটালে না

প্রভাত বীণা তব বাজে

আরো কতদিন বাকি

আয় বনফুল ডাকিছে মলয়

রুমুঝুম রুমুঝুম ঝুমঝুম নূপুর বাজে

মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে

মুসাফির মোছরে আঁখিজল

তুমি শুনিতে চেয়ো না আমার মনের কথা

আমি যার নূপুরের ছন্দ

আধো আধো বোল লাজে

আঁধখানা চাঁদ হাসিছে আকাশে

স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর

ওরে নীল যমুনার জল

মনে রাখার দিন গিয়েছে

মুখে কেন নাহি বলো

মোর না মিটিতে আশা ভাঙিল খেলা

বঁধু তোমার আমার এই যে বিরহ

আমার হাতে কালি মুখে কালি

জগতের নাথ কর পার

জাগো অমৃতপিয়াসী চিত

সখি আমি না হয় মান করেছিনু

আনারকলি আনারকলি

দেশে দেশে গেয়ে বেড়াই

শঙ্কাশূন্য লক্ষ কণ্ঠে

শ্যামা নামের লাগলো আগুন

প্রিয় এমন রাত যেন যায় না বৃথাই

প্রভাত বীণা তব বাজে

তব গানের ভাষায় সুরে

তুমি বেণুকা বাজাও কার নাম লয়ে

তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরি গো

জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর

চম্পা পারুল যূথি টগর চামেলা

খোদার প্রেমে শরাব পিয়ে

খেলা শেষ হলো শেষ হয় নাই

বিশ্ব দুলালী নবী নন্দীনি

হে প্রিয় তোমার আমার মাঝে বিরহের পারাবার

কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও

এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল

এখনো ওঠেনি চাঁদ

দীপ নিভিয়াছে ঝড়ে

এ কোন মধুর শরাব দিলে

আমি যদি আরব হতাম

আমার ভুবন কান পেতে রয়

আমি গিরিধারী সাথে

হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে

বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ

জানি জানি প্রিয় এ জীবনে

মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি

বলরে জবা বল

কেন আন ফুলডোর

আসে বসন্ত ফুলবনে

পথ চলিতে যদি চকিতে

লাইলী তোমার এসেছে ফিরিয়া

তুমি আমার সকাল বেলার সুর

বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে

আমি চাঁদ নহি অভিশাপ প্রভৃতি গান।

গীতিকার প্রণব রায়ের গান (১৯১১-১৯৭৫)

এই কি গো শেষ দান বিরহ দিয়ে গেলে

মোর আরো কথা ছিল বাকি, আরো প্রেম আরো গান ॥

এমন বাঙালি বিরল যে প্রণব রায়ের লেখা এ গান শুনে বিরহ অনুভবে আচ্ছন্ন হয়নি। এই গান বাঙালির প্রাণের গান। বাংলা গানে প্রণব রায়ের মতো প্রতিভাবান ও জনপ্রিয় গীতিকার ক্ষণজন্মা। এমন কোনো খ্যাতিমান শিল্পী খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি প্রণব রায়ের লেখা গানে কণ্ঠ দেন নি। সেইসব গান এখনো মানুষকে মোহাবিষ্ট আর স্মৃতিকাতর করে রাখে প্রতিনিয়ত। একটা গানের পিছনে থাকে দীর্ঘ ইতিহাস। গীত রচনা, সুরযোজনা, শিল্পীর গায়কী, যন্ত্রের সহযোগ ইত্যাদি। পরবর্তীতে একটি গান, একটি যৌথ কর্মের ফসল হিসেবে বিবেচিত হয় কিন্তু শ্রোতার কাছে শিল্পী ব্যতীত গীতিকার, সুরকার যন্ত্রী সবই অন্তরালের বিষয় হিসেবে আড়ালে রয়ে যায়। সে সময় গ্রামোফোন কোম্পানির বদৌলতে বাংলা গান, বিকাশের একটা পথ খুঁজে পায় এবং নতুন করে প্রাণ পায়। গ্রামোফোন রেকর্ড লেভেলে একসময় শিল্পী ছাড়া গীতিকারের নাম, সুরকারের নাম কিছুই ছাপা হতো না। পরবর্তীতে এ প্রথা বাতিল হয়ে যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম গীতরচয়িতা, যাঁর নাম গীতিকার হিসেবে গ্রামোফোনে ছাপা হয়। তবে গ্রামোফোন কোম্পানির গীতিকার হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামই ছিলেন প্রধানতম পুরুষ তখনকার সময়ে। তার কারণ নজরুলের জীবনের একটা দীর্ঘ সময় তিনি গ্রামোফোন কোম্পানিতে কাটিয়েছেন। সকাল হতে রাত, বছরের পর বছর আড্ডা আর গান। বলা হয়ে থাকে- নজরুলের জীবনের সৃষ্টিশীল সময় অতিবাহিত করেছেন গ্রামোফোন ও বেতারজীবনে। পরবর্তীতে প্রণব রায়ও সে পথে হাঁটা শুরু করলেন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে।

১৯৩৪ সালটি প্রণব রায়ের জন্য স্মরণীয় ছিল। সর্বপ্রথম প্রণব রায়ের গানের রেকর্ড তুলসী লাহিড়ীর সুরে ১৯৩৪ সালে পূজায় (রেকর্ড নম্বর এন ৭২৬৯) বের হয়। শিল্পী ছিলেন তখনকার স্বনামধন্য কণ্ঠশিল্পী কমলা ঝরিয়া। বিপুল খ্যাতি এনে দিয়েছিল প্রণব রায়কে এই রেকর্ডের গান। গান দুটি ছিল- 'ও বিদেশী বন্ধু' এবং 'আমি একলা ঘাটে বসে যে রই ভাসায়ে গাগরী'। মূলত গান দুটি ছিল গীতিকবিতা। কে তুমি অতিথি আজি এলে বলো না এবং মাধবী দূতী বকুল বনে গান দুটি ঐ বছরই মিঃ রায়ের লেখা দ্বিতীয় গানের রেকর্ড (এন ৭২২০)। গানের শিল্পী ছিলেন শ্রীমতি মাণিক-মালা। গানের সুরকার ছিলেন কমল দাশগুপ্ত। প্রণব রায়ের বাল্যবন্ধু কমল দাশগুপ্তের সুরে এবং অনুপ্রেরণায় যূথিকা রায়ের প্রথম গানের রেকর্ড বের হয়। এমন প্রতিভাবান শিল্পীর প্রথম

রেকর্ডকে স্মরণীয় করবার জন্য প্রণব রায় বিশেষ ব্যতিক্রমী কথায় লিখলেন- আমি ভোরের যুথিকা, রাতের শেষে সাজিয়ে রাখি কানন বীথিকা এবং এসেছি ভুলে মাটির প্রদীপ হয়ে তুলসী মূলে। এ গান তখন বাঙালির ঘরে ঘরে, মুখে মুখে ফিরত। সুরের প্রাচীন কাঠামো ভেঙে দিয়েছিলেন কমল দাশগুপ্ত এ গানের মাধ্যমে। গীতিকার হিসেবে প্রণব রায়ের গানের জগতে আসার অনুপ্রেরণা, কাজী নজরুল ইসলাম। গল্প, কবিতা, উপন্যাস লেখক এবং প্রবন্ধকার প্রণব রায় গীতিকার হিসেবে কী ভাবে প্রতিষ্ঠা পেলেন তার একটি উদাহরণ এমন- "প্রণব রায় একদিন চিৎপুর ট্রাম লাইনের ধারে বিডন স্কোয়ারের কাছে 'বিষ্ণুভবন' নামের বাড়িটিতে গিয়েছিলেন। ওই বাড়িটিতে তখন গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সাল রুম ছিল। বন্ধু কমল দাশগুপ্ত তখন সেখানে সুরকার ও ট্রেনার হিসেবে কাজ করতেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে প্রণব রায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল পূর্বপরিচিত ও অন্তরঙ্গ কাজী নজরুল ইসলামের। স্নেহভাজন প্রণব রায়ের সব খবর সম্ভবত তাঁর কাজীদা রাখতেন। দেখা হতেই তিনি জানতে চেয়েছিলেন --'এখন কি করছিস'- প্রণব রায় উত্তরে জানিয়েছিলেন --'আমার ত' লেখাপড়া ভেস্তে গেল তা বিশেষ কিছু করছি না।'-- তিনি প্রণব রায়কে রেকর্ড এর জন্য কয়েকটি গান লিখে দিতে বলেন। তাঁর প্রিয় কাজীদার অনুরোধ শুনে বিস্মিত প্রণব রায় বলেছিলেন--'গান আমি কি লিখবো! গান ত' আমি গাই, গান ত' আমি লিখিনি কখনো।' কাজী নজরুল ইসলাম সে কথা শুনে বলেছিলেন ---তুই দেখ না, লেখ না। গান লেখাটা কি হাতি-ঘোড়া আছে? তুই কবিতা লিখতে পারিস ভাল, আর গান লিখতে পারবি না নিজে গাইয়ে হয়ে? প্রণব রায়ের সেই দুঃসময়ে, জীবনের দুস্তর পারাবার অতিক্রম করার জন্য সদাশয় নজরুল ইসলাম সেদিন কাণ্ডারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামের অনুরাগী প্রণব রায় বিমুখ করতে পারেননি তাঁর প্রিয় কাজী দাকে। তাঁর কথা অনুসারে আটখানি গান লিখে প্রণব রায় কাজীদার হাতে দিয়ে আসেন। --তারপর মাস ২/৩ আর দেখাসাক্ষাৎ নেই। মাস ২/৩ বাদে যখন আবার রিহার্সাল রুমে গেছি, কাজীদা তখন খুবই ক্রুদ্ধ আমার ওপর। 'গানগুলো যে দিয়ে চলে গেলি, আর খবর নিলি না। তোর সব গান রেকর্ড হয়ে গিয়েছে। আর তোর টাকা পাওনা রয়েছে' টাকা পাওনা রয়েছে শুনে আমি অবাক, পুলকিতও বটে। পেমেন্ট পাওয়া গেল, সালটা হচ্ছে ১৯৩৪ এর শেষ। গান পিছু পাঁচ আষ্টে চল্লিশ টাকা। তাতেই মনে হলো প্রায় একটা রাজত্ব আমার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। কমল বললে তুমি নিয়মিত এখানে এসে কাজ করো। 'সেই' আমার গান লেখা শুরু হয়ে গেল।"[১১]

প্রণব রায়ের ১৯১১ সালের ৫ ডিসেম্বর কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে জন্ম। পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বরিশার বিখ্যাত সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের সন্তান প্রণব রায়। পিতা দেবকুমার রায় চৌধুরী মাতা সুকৃতি দেবী। ছয় বছর বয়সে ১৯১৭ সালে মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। মাতৃহারা প্রণব ছোটবেলায় পিসেমশাই ডাক্তার ঈশান চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও পিসিমা প্রফুলবালা দেবীর কাছে মানুষ হন। কৃতিত্বের সাথে লেটার মার্কস পেয়ে উত্তর

কলকাতার ব্রাহ্ম কলেজ হতে ম্যাট্রিক পাস করেন। কবিতার প্রতি ভালোলাগা ছোটবেলা থেকেই তাঁর। পিসেমশাই ঈশান চন্দ্রের বিপুল উৎসাহের কারণে প্রণব রায় লেখালেখির জগতে আসতে পেরেছেন বলে জানা যায়। ছোটবেলা থেকেই গানের গলা ভালো প্রণব রায়ের। পিতাও ছিলেন সুগায়ক। প্রণব রায় 'বর্ষামঙ্গল' নামে একটি অনুষ্ঠানে গান গেয়ে মাত্র নয় বছর বয়সে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। অরগ্যান ও পিয়ানো যন্ত্র ভালো বাজাতেন প্রণব রায়। ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাস। প্রণব রায়ের কথা এবং কমল দাশগুপ্তের সুরে শ্রীমতি উষা রানীর একটি গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেল। যার রেকর্ড নম্বর (এন ৭২৯৯)। গানটি ছিল---

চরণ ফেলিও ধীরে ধীরে প্রিয়, আমার সমাধি পরে

দেখো মোর ঘুম ভেঙে যায় নাকো যেন, যেন ক্ষণিকের তরে ॥

ফুল যদি কভু নাহি থাকে হায়, শুধু আঁখি বারি ফেলিও সেথায়

উতলা হাওয়ার পরশে যেমন বন শেফালীকা ঝরে ॥

আকাশে তখন ছায়া নামে যদি, সন্ধ্যা ঘনায় বনে

মনে করো দোঁহে দেখা হয়েছিলো সে কোন গোধূলী ক্ষণে।

আমার আঁধার সমাধিতে প্রিয়, তোমার প্রেমের দীপ জ্বেলে দিও

ঝরা মালিকার পরিমল যেন থাকে, থাকে তব হিয়া ভরে ॥

১৯৪০ সালে একই গান আরো জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল কুমারী যুথিকা রায়ের কণ্ঠে পুনরায় রেকর্ড করার পর (এন ২৭০০৫)। পরবর্তীকালে কালজয়ী এই গানটি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে পুনরায় রেকর্ড হয় এবং বিপুল শ্রোতাপ্রিয় হয়। এমন আরও একটি গানের কথা না বললে অপূর্ণ রয়ে যাবে প্রণব রায়ের গানের ইতিহাস–

এমনি বরষা ছিল সেদিন

শিয়রে প্রদীপ ছিল মলিন

তব হাতে ছিল অলস বীণ, মনে কি পড়ে প্রিয় ॥

প্রণব রায়ের কথায় এবং কমল দাশগুপ্তের সুরে, রানী সেনগুপ্তের কণ্ঠে রেকর্ড হয় গানটি ১৯৪১ সালে। রেকর্ড নম্বর (এন ২৭১৬৫)। পরবর্তীতে ১৯৫০ সালে যূথিকা রায় গানটি আবার তাঁর কণ্ঠে রেকর্ড করেন এবং পরে ফিরোজা বেগমের কণ্ঠেও রেকর্ড হয়। বাংলা গানের ভুবনে এমন কালজয়ী গানগুলি ক্ষণে ক্ষণে মনে করিয়ে দেয়, বাংলা গানের তখনকার সময়ের গীতিকার ও সুরকারের যৌথ প্রয়াসের গুরুত্ব ও বর্ণিল ইতিহাসের কথা। প্রণব রায়ের লেখা কথার ঐশ্বর্য্যে বাংলা গানের ভুবন একদিন আলোকিত হয়ে উঠেছিল এবং আজও সে আলোর আভায় বাংলা গানের ভুবন আলোকিত। ধীরেন বসু, তুলসী লাহিড়ী ছিলেন তখনকার সময়ে বিখ্যাত গীতিকার। এঁরা দুজন নজরুলের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। আর উল্লেখযোগ্য গীতিকারদের মধ্যে ছিলেন প্রণব রায়সহ সুবোধ পুরকায়স্থ, অজয় ভট্টাচার্য, অনিল বাগচী, শৈলেন রায়, বাণী কুমার প্রমুখ।

প্রণব রায়ের ছোটবেলায় গানের থেকে সাহিত্যের দিকেই বেশি ঝোঁক ছিল বলে জানা যায়। লেখালেখির সূত্র ধরে এক সময় প্রণব রায় সাংবাদিকতায় জড়িয়ে যান। নিজের সম্পাদনায় 'নাগরিক' নামে একটি পত্রিকা বের করেন ১৯৩৬ সালে। রোমাঞ্চ নামে একটি 'গোয়েন্দা' পত্রিকাও বের করেন। প্রণব রায় স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন নজরুলের প্রেরণা এবং বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী সান্নিধ্যে এসে। কাজী নজরুলের সম্পাদনায় ধুমকেতু ও লাঙল নামে যে পত্রিকা বের হয়েছিল সে সময় সেগুলি পাঠ করেই মনের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ বপন করেছিলেন তিনি। সাপ্তাহিক বিশ্বদূত পত্রিকায় কমরেড নামে একটি কবিতা লিখে ১৯৩১ সালে রাজরোষে পড়েন এবং যার ফলে কারাবরণ করেছিলেন বেশকিছুদিন। তবে প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, গল্পকার, কবি সব পরিচয়ের শেষ পরিচয় হিসেবে দাঁড়ায় গীতরচয়িতার পরিচয়। এই গীতিকার পরিচয়ের নেপথ্যে গ্রামোফোনের উমাপদ বাবুরও অবদান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আবুল আহসান চৌধুরী লিখেছেন– "কবি-গাল্পিক-প্রাবন্ধিক-সাংবাদিক-সাময়িকপত্র সম্পাদক-এইসব পরিচয় ছাপিয়ে শেষপর্যন্ত প্রণব রায়ের গীত- রচয়িতার পরিচয়টিই স্থায়ী হয়েছে– তাঁকে এনে দিয়েছে খ্যাতি ও পরিচিতি, সম্মান ও সমাদর। গ্রামোফোন ও চলচ্চিত্রের জগতে এ বিষয়ে নজরুলের পরে এক অজয় ভট্টাচার্য ছাড়া আর কারো সঙ্গে প্রণব রায়ের তুলনা করা যায় না। কী করে প্রণব রায় গানের জগতে এলেন– গান লিখতে শুরু করলেন, সে কথা তিনি এক স্মতিচারণায় বলেছেন– তা থেকে জানা যায় সেকালের এক বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ও সুরস্রষ্টা ছিলেন উমাপদ ভট্টাচার্য। তিনি যুক্ত ছিলেন চণ্ডীচরণ সাহার হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে। এই উমাপদ ভট্টাচার্যের উৎসাহেই প্রণবের গান লেখা শুরু। প্রণব বলছেন: 'তিনি আমাকে মাঝে মাঝেই বলতেন যে, দু-চারটে গান লিখে দে ত'। এমনি খেয়ালের বশে আমি দু-চারটে গান তাঁকে লিখে দিয়েছিলাম।"[১২] প্রণব রায় কাজী নজরুল ইসলামকে যে ৮ টি গান লিখে দিয়ে এসেছিলেন, সেখান থেকে বাছাই করে কমলা ঝরিয়ার কণ্ঠে প্রণব রায়ের লেখা গানের প্রথম রেকর্ড বের হয় ১৯৩৪ সালের পূজায়। গানের কথা ছিল ও বিদেশী

বন্ধু এবং যেথায় দূরে গাঙের চরে এবং একই সাথে এই গানের মাধ্যমেই প্রণব রায়ের জীবনে ব্যাপক খ্যাতি সুনাম চলে এলো। গানের ভুবনে এবং গ্রামোফোন কোম্পানিতে আসন পাকাপোক্ত হয়ে গেল। যূথিকা রায়ের প্রথম রেকর্ড বের হয় ১৯৩৪ সালের শেষে গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে– আমি ভোরের যুথিকা ও সাঁঝের তারকা আমি শিরোনামে। এ গানের গীতিকার ছিলেন প্রণব রায় এবং সুরকার কমল দাশগুপ্ত। জগন্ময় মিত্রেরও প্রকাশিত প্রথম গানের রেকর্ড বের হয় প্রণব রায়ের কথায়। গানের কথা ছিলো– প্রিয় হতে প্রিয়তর ও তোমার মতন কত না নয়ন গান দুটি। এ গান ১৯৩৯ সালের ২৫ জুলাই ধারণ করা হয়েছিল স্টুডিওতে। যদিও জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে প্রথম গান রেকর্ড হওয়ার কথা ছিল নজরুলের লেখা– শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে। এই তিন শিল্পীর কণ্ঠের প্রথম গানের কথা লিখেছিলেন প্রণব রায় এবং সুর দিয়েছিলেন তাঁরই বন্ধু–কমল দাশগুপ্ত।

১৯৩৪ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় গ্রামোফোন এবং চলচ্চিত্রে প্রণব রায়ের লেখা গানের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজারের ওপরে। গানের বাণীর সরলতা প্রণব রায়ের লেখার সবচেয়ে বড় গুণ। খুব সহজেই শ্রোতারা কথার প্রেমে পড়ে যেত। দীর্ঘ ৪১ বছর গ্রামোফোন ও চলচ্চিত্রে গান রচনা করেছেন প্রণব রায়। গীত রচয়িতার এ দীর্ঘ জীবনে এমন কোনো শিল্পী খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি প্রণব রায়ের লেখা কথায়, গান গাননি এবং এমন সুরকারও নেই যিনি তাঁর লেখা গানে সুর করেননি। রাইচাঁদ বড়াল, সুবল দাশগুপ্ত, দুর্গা সেন, কমল দাশগুপ্ত, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, সুধীরলাল চক্রবর্তী, অনুপম ঘটক, নচিকেতা ঘোষ, অনিল বাগচী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়সহ বহু খ্যাতিমান সুরস্রষ্টারা তাঁর গানে সুর দিয়েছেন। শচীন দেব বর্মন, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কুন্দনলাল সায়গল, কমলা ঝরিয়া, কানন দেবী, সুধীরলাল চক্রবর্তী, সত্য চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, গৌরীকেদার ভট্টাচার্য, যুথিকা রায়, সুপ্রভা সরকার, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বেচু দত্ত, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, মোহাম্মদ রফি, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন কুমার (তালাত মাহমুদ), আশা ভোঁসলে, লতা মঙ্গেশকার, শ্যামল মিত্র, মান্নাদে, সবাই তাঁর কথায় গান গেয়েছেন। প্রণব রায়ের যেসব গান আজও মানুষকে স্মৃতিকাতর করে তোলে, তার মধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য কুন্দনলাল সায়গলের কণ্ঠে গাওয়া– নাইবা ঘুমালে প্রিয় রজনী এখনো বাকী, যখন রব না আমি দিন হলে অবসান/ আমারে ভুলিয়া যেও মনে রেখো মোর গান, এখনি উঠিবে চাঁদ/ আধো আলো আধো ছায়াতে। সুধীরলাল চক্রবর্তীর গাওয়া প্রণব রায়ের লেখা এই গানটি গানের রাজ্যে চিরকালের স্মরণীয় গান– মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে/ মাকে মনে পড়ে আমার/ মাকে মনে পড়ে। যূথিকা রায়ের গাওয়া– চরণ ফেলিও ধীরে ধীরে প্রিয়/ আমার সমাধি পরে, প্রদীপ জাগিয়া রহো, এমনি বরষা ছিল সেদিন, যমুনার জলে ফুল হয়ে ভেসে যাই, গত জনমের যত কথা, সে কোন বনের পাখি। জগন্ময় মিত্রের গাওয়া বিখ্যাত গান– তুমি কি এখন দেখিছ স্বপন আমারে, আমার দেশে ফুরিয়ে গেছে ফাগুন,

আমি ভুলে গেছি তব নাম, তুমি পথ ভুলে করে। কানন দেবীর কণ্ঠে গাওয়া 'শেষ উত্তর' ছবির গান– আমি বনফুল গো/ ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সত্য চৌধুরীর কণ্ঠে গাওয়া জনপ্রিয়গান– যেথা গান থেমে যায়/ দীপ নেভে হায়, কত যে ব্যথা ভুলালে, ঝরে গেছে ফুল আধারে, রহিয়া রহিয়া কে ডাকে আমায়। জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে গাওয়া এবং সুবল দাশগুপ্তের সুরে–'সাতটি বছর আগে '৩ 'সাতটি বছর পরে' এবং 'চিঠি' অতুলনীয় সাড়া পেয়েছিল বাংলা আধুনিক গানের ভুবনে।

প্রণব রায়ের লেখা এবং সন্তোষ সেনগুপ্তের কণ্ঠে গাওয়া–জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা / মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল বিখ্যাত গান। যেসব ছায়াছবিতে মি. রায় গান লিখেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য– পরিচয়, গরমিল, মন্দির, বিধিলিপি, জীবন সৈকত, সাগরিকা, সাহেব বিবি গোলাম, পৃথিবী আমারে চায়, দীপ নেভে নাই, এন্টনি ফিরিঙ্গি, নায়িকার ভূমিকায়, কবি, বেগম, বিরাজ বৌ, আরোগ্য নিকেতন, কমললতা, গৃহদাহ প্রভৃতি। চলচ্চিত্রের কাহিনীকার হিসেবে প্রণব রায়ের উল্লেখযোগ্য ছবি– প্রার্থনা, মানরক্ষা, হারজিৎ, কে তুমি, ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট, বহুরূপী, সাত নম্বর বাড়ি, মন্দির, রাঙামাটি, জবানবন্দি, নিরুদ্দেশ। প্রণব রায়ের গান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম রেকর্ড পরিচিতির একটি সংখ্যায় লিখেছিলেন এভাবে–"আমরা এবার এক তরুণ সঙ্গীত রচয়িতাকে পেয়েছি যিনি এসেছেন নবনক্ষত্র উদয়ের বিস্ময় নিয়ে, তিনি প্রণব রায়। এঁর লেখা গান যেকোনো শ্রেষ্ঠ গীতরচয়িতার পাশে সসম্মানে সমান আসন দাবি করতে পারে। এঁর গানের এক একটি কথা যেন এক একটি টাটকা তোলা ফুল। গন্ধে রূপে রসে ভরপুর।"[১৩] প্রণব রায় ব্যক্তিগত জীবনে বিনয়ী, নিরহংকার, ভীষণ সরল সহজ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। দুঃখে-সুখে উদাসীন ও নির্লিপ্ত মানুষ ছিলেন তিনি। কিছুদিন রোগ ভোগের পরে (২২ শে শ্রাবণ ১৩৮২) ৮ আগস্ট ১৯৭৫ সালে অনন্তলোকে যাত্রা করেন মর্তের সকল মায়া ছিন্ন করে। যাবার বেলায় এ মহান কবির স্ত্রী শ্রীমতি রমা দেবীর প্রতি শেষ উক্তি– 'রমা সব শেষ হয়ে গেল' এবং এর আগে জানতে চেয়েছিলেন আজ ২২ শে শ্রাবণ কবিগুরুর তিরোধান দিবস কি না। বাস্তবিক অর্থে প্রণব রায় তো শেষ হয়নি। তাঁর লেখা কতশত গান এ ধরণীতে সুরের দোলায় বহমান আজ এবং আগামীর পথে।

প্রণব রায়ের লেখা কিছু বিখ্যাত গান

মধু মালতী ডাকে আয়

আর ডেকো না সেই মধু নামে

নাইবা ঘুমালে প্রিয় রজনী এখনো বাকী

নতুন সূর্য আলো দাও আলো দাও

তীরবেঁধা পাখি আর গাইবে না গান

আর জনমে হয় যেন গো তোমায় ফিরে পাওয়া

তুমি ফিরাবে কি শূন্য হাতে

যখন রব না আমি দিন হলে অবসান

এখনি উঠিবে চাঁদ আধো আলো আধো ছায়াতে

মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে

চরণ ফেলিও ধীরে ধীরে প্রিয় আমার সমাধি পরে

এমনি বরষা ছিল সেদিন

জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা

শুধু জাগিতে এসেছি রাতি জাগাতে আসিনি গো

ঘুমের ছায়া চাঁদের চোখে

শোন গো সোনার মেয়ে

তুমি কি এখন দেখিছ স্বপন আমারে

আমি বনফুল গো ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে

যেথা গান থেমে যায় দীপ নেভে হায়

কুসুম দোলায় দোলে শ্যাম রায়

তুমি যে আমার এ ভুবনে তাই, নূপুরের গুঞ্জনে বনবিথী উতলা প্রভৃতি।

সুরকার শৈলেশ দত্তগুপ্তের গান (১৯০৫-১৯৬০)

জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা

মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল

মুখপানে যার কভু চাওনি ফিরে

কেন তারই লাগি আঁখি অশ্রু আকুল ॥

গীতিকার প্রণব রায়ের অসাধারণ কথামালায় এবং শৈলেশ দত্তগুপ্তের হৃদয় ছোঁয়া মধুর সুরযোজনায় বাংলা গানের একটি কালজয়ী গান এটি। ১৯৪২ সালে প্রকাশিত সন্তোষ সেনগুপ্তের গাওয়া এ গান। সুর করার ঘটনা প্রসঙ্গে সন্তোষ সেনগুপ্ত জানিয়েছেন– "সুরকার শৈলেশ দত্তগুপ্ত থাকতেন তখন টালিগঞ্জের চারু এভিনিউয়ে। একদিন কি একটা জরুরী প্রয়োজনে বেলা বারোটায় প্রখর রৌদ্রে তাঁর বাড়িত গিয়েছি। তাঁর সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসছি। তিনি আমাকে ট্রাম পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। পথে নেমে আমাকে বললেন 'কাল প্রণব রায় আমাকে একটি গান দিয়ে গিয়েছে, 'মিলনে যারে তুমি দাওনি মালা বিরহে কেন তারে দিতে এলে ফুল'। গানটির সুর হলে তুমিই গাইবে।' গানটির কথা আমার অত্যন্ত ভালো লাগলো। বললাম, 'এক্ষুণি সুর করে ফেলুন।' ওই দুপুর রৌদ্রে রাস্তায় চলতে চলতে যেন অনিবার্যভাবে দরবারী কানাড়ায় গানটির প্রথম পঙক্তির সুর সংযোজন করলেন। আমি বললাম, 'বাকি সুর আপনা থেকেই হয়ে যাবে। শুধু 'মিলন বিরহ' কথাটা একটু হালকা লাগছে। সে জায়গায় 'জীবন-মরণ' ব্যবহার করলে ওজন অনেক বাড়ে এবং গাইতে ভালো লাগবে।' শৈলেশ দা বললেন, 'তাই হোক ওটা তো সাময়িক আর মরণ চিরকালের।"[১৪]

শিল্পী, গীতিকার, সুরকার প্রত্যেকের মধ্যে গান তৈরি করার জন্য প্রাণের টান অনুভূত হতে হয় তার প্রমাণ উপরে উল্লেখিত কথোপকথোন। অবিচ্ছেদ্য আন্তরিকতায় ভরপুর ছিল সুরস্রষ্টা, গীতরচয়িতা এবং গায়কের। একটি গানকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও বোঝাপড়া ছিল প্রত্যেকের মধ্যে। একজন গীতিকার জানতেন তাঁর কোন গীতিকবিতাটি কোন সুরকার যথার্থ সুর দিতে পারবেন এবং একজন সুরকারও যথার্থই জানতেন তাঁর সুর করা গান কোন শিল্পী পরিশীলিতভাবে কণ্ঠে রূপ দিতে পারবেন। এই আন্তরিক ও সম্মিলিত প্রয়াসের জন্য আমরা পেয়েছি যুগজয়ী এবং হৃদয়গ্রাহী বহু গান।

শৈলেশ দত্তগুপ্তের পিতা যোগেশ দত্ত গুপ্ত এবং মাতা প্রবালিনী দত্তগুপ্ত। ১৯০৫ সালে ত্রিপুরার কালিকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শৈলেশ দত্তগুপ্ত। চার বোন তিন ভাইয়ের মধ্যে দত্তগুপ্ত ছিল সকলের বড়। সিলেটের হবিগঞ্জে পিতামহ উমেশ দত্তগুপ্তের বিশাল জমিদারী ছিল বলে জানা যায়। সঙ্গীত তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্যের একটি বিষয় ছিল। আগে থেকেই গান-বাজনার চর্চা ছিল বাড়িতে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব তাঁর আবিষ্কৃত রাগ 'দীপিকা' শ্রী দত্তকে তালিম দিয়েছিলেন। দীপিকা রাগটি ছিল কল্যাণ ঠাটের অন্তর্ভুক্ত। কুমিল্লা কলেজ থেকে বিএ পাস করে কলকাতায় গিয়েছিলেন পড়াশুনা করবার জন্য। কলকাতায় অবস্থানকালে প্রথমেই তালিম নিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের। এর কিছুদিন পরই প্রখ্যাত ওস্তাদ খলিফা বাদল খাঁন সাহেবের সান্নিধ্যলাভ করেন। বাদল খাঁন সাহেবের কাছে শৈলেশ দত্ত গুপ্ত গান্ডা বেঁধে উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা আরম্ভ করেন। ১৯৩৭ সালে ওস্তাদ খলিফা বাদল খানের মৃত্যুর পর তিনি দবীর খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তখনকার সময় পৃথিবী বিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছেও তালিম নেয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল শৈলেশ দত্তগুপ্তের। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, তাঁর কন্যা অন্নপূর্ণা এবং জামাতা রবি শংকর তাঁদের কালিকচ্ছ গ্রামের বাড়িতে যেতেন মাঝেমধ্যে। বিখ্যাত কীর্তন গায়ক এবং শিক্ষক হরিদাস করের কাছে কীর্তন বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন শৈলেশ বাবু। কলকাতার হাতিবাগানে ১৯২৮ সালে 'বাসন্তী বিদ্যাবীথি' নামে মেয়েদের জন্য একটি গানের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মনোরঞ্জন সেন। এই স্কুলেরই আধুনিক গানের শিক্ষক ছিল শৈলেশ দত্তগুপ্ত, হিমাংশু দত্ত এবং অনিল বাগচী। অন্যান্যের মধ্যে আর যাঁরা গান শেখাতেন– রবীন্দ্র সঙ্গীতে অনাদি কুমার দস্তিদার, ভজনে প্রকাশ কালী ঘোষাল। নজরুলগীতির শিক্ষক ছিলেন উমাপদ ভট্টাচার্য্য, জগত ঘটক, নিতাই ঘটক। কীর্তন শেখাতেন হরিদাস কর, রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ভূপেন বসু প্রমুখ। প্রখ্যাত হীরেন বসুর বম্বে চলে যাওয়ার কারণে, কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানির রেকডিং রুমের দায়িত্বভার ১৯৩৪ সালে শৈলেশ দত্তগুপ্তকে দিয়ে যান। অন্যদিকে ১৯৩৫ সালে সেনোলা মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুরকার ও প্রশিক্ষক হিসেবে শৈলেশ দত্তগুপ্ত সেনোলাতেও যোগদেন। ১৯৩৫ সালে আবার পাইওনিয়ার কোম্পানিতেও যোগদেন শৈলেশ দত্তগুপ্ত। জানি গো প্রিয় জানি এবং শুকিয়ে গেছে মালার কুসুমগুলি; বাংলা গানের শ্রোতাদের আজও মুগ্ধ করে এই দুটি জনপ্রিয় গান। যার শিল্পী ছিলেন বেচু দত্ত। ১৯৪০ সালে গান দুটি প্রকাশ পেয়েছিল। গানের কথা লিখেছিলেন নিহার বিন্দু সেন এবং সুর করেছিলেন শৈলেশ দত্তগুপ্ত। বেঁচু দত্তের স্বকণ্ঠে বিখ্যাত হওয়া কিছু অসাধারণ গান, যে গানের নাম উল্লেখ না করলে বাংলা গানের শ্রোতারা ব্যথিত হবেন বলে মনে হয় এমনই কিছু গান নিম্নরূপ– সুবোধ পুরকায়স্থর কথায়– জাগিয়া তোমারে ভুলি বারে বারে, হৃদয় কাহারে যেন চেয়েছিল।

প্রণব রায়ের কথায়– তুমি যদি এলে ফিরে এবং যে গান হলো না গাওয়া। অজয় ভট্টাচার্যের কথায়– প্রথম যেদিন বাঁশি গাহিল এ গান। এমন সব কালজয়ী গানের সুরকার ছিলেন শ্রদ্ধেয় শৈলেশ দত্তগুপ্ত।

প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শচীন দেব বর্মনের কণ্ঠে যে গান বেশ বিখ্যাত হয়েছিল; অজয় ভট্টাচার্যের কথায় 'গোধূলির ছায়াপথে' এবং 'প্রিয় আজও নয়' তারও সুর করছিলেন শৈলেশ দত্তগুপ্ত। (এইচ ৮৮৯ নম্বর) ১৯৪১ সালে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি থেকে বের হয় গান দুটি। এ গান প্রসঙ্গে জয়তী গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন; "শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে গাওয়া কালজয়ী এই গান দুটি শুনলে বোঝা যায় মর্মস্পর্শী সুরের জন্ম শুধু জ্ঞানসমুদ্র সিঞ্চন করে হয় না, তার সঙ্গে প্রয়োজন সৃজনশীল প্রতিভার। প্রতিভার পরশমানিক তো সকলের থাকে না-- যাঁদর থাকে তাঁরাই শুধু পারেন মাটির পৃথিবীতে গানের সোনার ফসল ফলাতে। বাংলা গানের স্বর্ণযুগে এমন সব সোনার মানুষ জন্মেছিলেন বলেই তো সেই সোনার ফসলে আমাদের গানের গোলা পূর্ণ।"[১৫] শৈলেশ দত্তগুপ্ত কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানির দায়িত্ব নেয়ার পর নিজ কণ্ঠে দুটি গান রেকর্ড করেছিলেন। পরবর্তীকালে সে রেকর্ডের আর কোনো সন্ধান মেলেনি। ১৯৩৪ এর শেষের দিকে শৈলেশ দত্তগুপ্ত দুটি গান লিখেছিলেন সুর করার পাশাপাশি। কুমারী ভারতী মজুমদারের কণ্ঠে সে গান রেকর্ড হয়েছিল। গান দুটি ছিল– 'আজ জীবনের সন্ধ্যা পথে এসো এসো তুমি প্রিয়' এবং 'আমায় ডাক দিলে কে দিন শেষে সুদূর পারে' (জি.ই. ২১৯২)।

সেকালের বহু শিল্পীর গানের প্রথম রেকর্ড বের হয়েছিল শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে ও সঙ্গীত পরিচালনায়। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত গায়ক সন্তোষ সেনগুপ্তের প্রথম রেকর্ডের সুরকার ও প্রশিক্ষক ছিলেন শ্রী দত্ত বাবু। গান দুটি ছিল– আজি শাওন ঝরে এবং আজও পড়ে মনে। গান দুটির গীতিকার ছিল যথাক্রমে বিখ্যাত লেখিকা ও চিত্রশিল্পী হাসি রাশি দেবী এবং কবি নরেশ্বর ভট্টাচার্য। এ বছরই আরেক বিখ্যাত শিল্পী কুমারী সুপ্রীতি মজুমদারের প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল দুটি কাব্যসঙ্গীত নিয়ে। অজয় ভট্টাচার্য এবং নরেশ্বর ভট্টাচার্য গানের কথা লিখেছিলেন। গান দুটি ছিল–আবার আমি আসবো ফিরে এবং আজো কি যমুনা তীরে। চল্লিশের দশকের বেতার রেকর্ড এবং ছায়াছবির বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী সুধীন চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম রেকর্ড বের হয় দত্তগুপ্তের সুরে গান দুটি ছিল– চামেলীর বুকে পরশ ছোঁয়ালো, তোমার মিলন লাগি। "স্বতঃস্ফূর্ত সুরসৃষ্টির ক্ষমতা থাকার জন্য শৈলেশ দত্তগুপ্ত সে যুগের সমস্ত বিখ্যাত গীতিকবির লেখা গানে অনায়াসে সুর দিতে পারতেন। সংবেদনশীল মানুষটি গীতিকবিতার ভাবটি হৃদয় দিয়ে অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে অচিনলোক থেকে সুর এসে ধরা দিত তাঁকে। সুগভীর অনুশীলন ও সৃজন ক্ষমতার জন্যই এবং সংগীতে লীন হয়েছিলেন বলেই সপ্তসুর পোষা পাখির মতো অনুগত ছিল

তাঁর।"[১৬] বাংলা গানের মৌলিক সুরস্রষ্টাদের মধ্যে ব্যতিক্রমী উদাহরণ শ্রী শৈলেশ দত্তগুপ্ত। ত্রিশের দশকে বাংলা গানের সুর যোজনায় যাঁরা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ও মহিমায় উজ্জ্বল তাঁদের মধ্যে শৈলেশ দত্তগুপ্ত অন্যতম।

আপন প্রতিভা বলে এবং নিষ্ঠার কারণে বিখ্যাত সুরস্রষ্টা সঙ্গীতকার কাজী নজরুল ইসলামের স্নেহধন্য হয়েছিলেন শৈলেশ দত্তগুপ্ত। জীবনের একটা পর্যায়ে এসে চারদিক থেকে দুর্ভাগ্য- দারিদ্র্য এবং অসহায়তা একসঙ্গে জাপটে ধরেছিল তাঁকে। এ প্রসঙ্গে নিজেই নজরুল গবেষক আসাদুল হক এর কাছে আলাপচারিতায় বলেছেন–"জানেন, এখন আর কেউ আমার সাথে দেখা পর্যন্ত করতে আসে না, এমনকি আমার কৃতিছাত্ররাও নয়, কিন্তু এমন একদিন---। শ্রী দত্তগুপ্ত আর কোনো কথা বলতে পারলেন না। চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস যেন গুমড়ে মরছে তাঁর বুকের মধ্যে। নিজের হাতখানা মুখের সামনে বিছিয়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে রেখাগুলো দেখতে লাগলেন। আমার মুখে আর কোনো কথা সরলো না।"[১৭] কাজী নজরুল ইসলামের অসংখ্য গানের সুরকার দত্তগুপ্ত। যে গানগুলো শুনলে হয়তো শ্রোতাদের মনেই হবে না, এমন গান এর সুর নজরুল ইসলাম নিজে করেননি। উদাহরণস্বরূপ: যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পারো নাই কেন মনে রাখ তারে, আকাশে ভোরের তারা, মোরে ভালোবাসায় ভুলিও না, চৈতি চাঁদের আলো, সেদিন বলেছিলে সেই সে ফুলবনে, ভোরের স্বপনে কে তুমি, আমি জানি তব মন বুঝি তব ভাষা, গানগুলি মোর আহত পাখির সম, আমায় নহে গো ভালোবাস শুধু, উপল নুড়ির কাঁকন চুড়ি বাজে ইত্যাদি। কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে শৈলেশ বাবুর ঘনিষ্ঠতা প্রসঙ্গে আসাদুল হক জানিয়েছেন– "আরে কাজীদার কথা, অমন লোক হয় না। আমার এ বয়সে কত লোকের সাথেই না আলাপ হলো কিন্তু কাজীদার মতো অমন মহৎ, উদারচেতা ব্যক্তিত্ব ও জাঁদরেল সংগীতশিল্পী আর দ্বিতীয়টি দেখলাম না।"[১৮] একটি গান জীবনের শেষ বেলায় এসেও সুরকার দত্তগুপ্তের খুব প্রিয় ছিল। কারণ এ গানটি কাজী নজরুল নিজে হাতে শিখিয়ে ছিলেন শ্রী দত্তগুপ্তকে। সুরকার ছিলেন নজরুল নিজেই। গানটির কথা এমন ছিল–

সন্ধ্যা নেমেছে আমার বিজন ঘরে তব গৃহে জ্বলে বাতি

হাসিয়া ফুরায় তব উৎসব নিশি প্রিয় পোহায় না মোর রাতি।

শৈলেশ দত্তগুপ্তের জীবনসায়াহ্নের প্রতিটি বাস্তবতার সাথে এ গান যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলো সুরে আর কথায়। সেকালের ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের আজকের এই হেমন্ত হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার পেছনে যে মানুষটির অশেষ অবদান, তিনি আর কেউ নন– সুরকার শৈলেশ দত্তগুপ্ত। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী বেলা মুখোপাধ্যায়ের লেখা বইয়ের থেকে। জীবনের

শেষ বেলায়, নিরঙ্কুশচিত্তে সঙ্গীতশিল্পী হয়ে ওঠা, স্বামীর (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়) জীবনের পেছনের ইতিহাস প্রকাশ করেছেন কৃতজ্ঞচিত্তে। তিনি লিখেছেন এভাবে– "শৈলেশ বাবু স্বাস্থ্যবান মানুষ। ব্যাকব্রাশ চুল। গোল ফ্রেমের চশমা চোখে। মুখখানি দেখলেই একনজরে মনে হয় স্নেহশীল মানুষ। ...ওই প্রথম দিনিই আমার স্বামীর কণ্ঠ মনে ধরেছিল শৈলবাবুর। শুধু কণ্ঠ কেন, আমার তো মনে হয় কণ্ঠের অধিকারী তরুণটির ওপর দুর্বলতা জন্মে গিয়েছিল শৈলবাবুর। নইলে পরবর্তীকালে গান শেখানো, রবীন্দ্রসঙ্গীতের হাজারো বৈচিত্র্যময় জগতের দরজাটা ওর সামনে উনি খুলে দিতে যাবেন বা কেন!... এদিকে একের পর এক রেকর্ড বেরয়। রেডিওর দিকে ঘেঁষে না। সুরকার শৈলেশ দত্তগুপ্তের ছত্রছায়ায় সে সময়ে ধীরে ধীরে সুনাম ছড়াচ্ছে ওর। একদিন শৈলেশদাই ওকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন রেডিওতে। বাণীদার সঙ্গে শৈলেশদার সম্পর্ক ছিল মধুর। সোজাসুজি অনুরোধ করলেন– ছেলেটাকে দেখিস। ভালো গায়। ...তারপর আর পিছন ফিরতে হয় নি। রেডিও দু'হাত ধরে টেনে নিল ওকে। শৈলেশদার ঋণ কখনও শোধের নয়। অমন একটা বড় মানুষের প্রেরণা, সক্রিয় সাহায্য না পেলে কি হেমন্ত কোনোদিনও অত বড় গায়ক হয়ে উঠতে পারত ? শুধু প্রথম রেকর্ডে সুযোগ করে দিয়েছিলেন বলেই নয়, রেডিওতে বাণীদার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে নতুন গান গাওয়ার পথ তৈরি করে দিলেন বলেই নয়-- এমনও দিন গেছে, পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন। ...এই শৈলেশদাই ওর মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি ভালবাসা-আকর্ষণ জাগিয়ে তুলেছিলেন। স্বরলিপি দেখে হেমন্তের গান তোলা শেখাও প্রথম ওঁর কাছে।"[১৯] বাংলা গানের ধারায় এমন অসামান্য সুরস্রষ্টা সত্যিই বিরল। অন্তরকে সহজে স্পর্শ করার মতো তাঁর সুরের সাবলীলতা ছিল চিরকাল। রাগসংগীতের অগাধ জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিল তাঁর সুরলোক। জীবনের প্রথম বেলায় সঙ্গীত শিক্ষাগ্রহণ করেছেন ভারতের তথা বিশ্বের বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছে, যার জন্যে বৈচিত্র্যধর্মী সুর করা তাঁর পক্ষে অনেকটা সহজসাধ্য ছিল। এই বিশাল সঙ্গীতগুণী ১৯৬৩ সালের ২৪ মে ভোর পাঁচটায় কলকাতার গড়িয়া হাটের বাসায় ইহজগতের সব মায়া ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন। সুরকার শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে নজরুলের কিছু কালজয়ী বাংলা গান–

শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কিছু গান

চৈতী চাঁদের আলো আজ নাহি ভালো লাগে

আমি জানি তব মন, বুঝি তব ভাষা

সেদিন বলেছিলে সেই সে ফুলবনে

গানগুলি মোর আহত পাখির সম

যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই

মোরে ভালোবাসায় ভুলিও না

আকাশে ভোরের তারা

অনেক কথা বলার মাঝে

ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে

আমায় নহে গো ভালোবাস শুধু

পরজনমে যদি আসি এ ধরায়

তুমি আমার সকাল বেলার সুর

শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে বিভিন্ন গীতিকার রচিত কিছু গান

এনেছি আমার শত জনমের প্রেম

জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা

রজনীগন্ধা ঘুমাও ঘুমাও

তোমারে চাহিয়া প্রিয়

মোর সুন্দরের অভিসারে

তুমি যদি এলে ফিরে

হৃদয় কাহারে যেন চেয়েছিল

প্রথম যে দিন বাঁশি গাহিল

আজিও বুঝিলে না

মিলনে তুমি নাহি

তোমার মিলন লাগি

চামেলীর বুকে পরশ ছোঁয়াল

কত মধুরাতি এলো

আজি মিলন নিশি ভোরে

সমাধিতে মোর ফুল ছড়াতে

তোমার আকাশে এসেছিনু হায় প্রভৃতি গান।

গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গান (১৯২৪-১৯৮৬)

এ শুধু গানের দিন এ লগন গান শোনাবার

এ তিথি শুধু গো যেন দখিন হাওয়ার ॥

এ লগনে দুটি পাখি মুখোমুখি নীড়ে জেগে রয়

কানে কানে রূপকথা কয়

এ তিথি শপথ আনে হৃদয় চাওয়ার ॥

বাংলা গান লিখে ভারতীয় বাঙালি গীতিকারদের মধ্যে যাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সুদীর্ঘ সঙ্গীতজীবনে গীতিকবি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার উপহার দিয়েছেন অসংখ্য কালজয়ী গান। সময়টা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ যদি একটু সহজ করে বলি তাহলে বলা যায় বাংলা ছায়াছবির একেবারে স্বর্ণযুগ। এ সময় ছায়াছবিগুলো অতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এসবের পেছনে একটি কারণ হলো স্বর্ণযুগের ছায়াছবির অসাধারণ গান। সে সব গান আজও আমাদের মুখে মুখে ফিরছে। শুধু তাই কেন আমাদের মনের কোণে আলাদা একটা অনুভূতি রয়েছে বাংলা ছায়াছবির এসব স্বর্ণযুগের গান নিয়ে। সেই স্বর্ণযুগের গানের উজ্জ্বল ও প্রতিভাধর গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। তাঁর লেখা একটি গান বাঙালির কাছে বন্ধুত্বের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে পরিচিত। গানটি বিখ্যাত শিল্পী মান্নাদের গাওয়া:

কফি হাউজের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই

কোথায় হারিয়ে গেল সোনালী বিকেলগুলো সেই-আজ আর নেই ॥

স্বর্ণযুগের গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথা বলতে গেলে, মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রসঙ্গ এসে যায়। উত্তম কুমারের খুব কাছের মানুষদের মধ্যে একজন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। মহানায়কের সঙ্গে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের পারিবারিক বন্ধন ছিল খুবই দৃঢ়। একথা স্বীকার করেছেন মহানায়কের কাছে থাকা বেশ কিছু মানুষ। তার মধ্যে একজন অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবী। তিনি এক স্মৃতিচারণে জানিয়ে ছিলেন- তাঁর বাড়িতে যেকোনো অনুষ্ঠান একদমই অসম্পূর্ণ ছিল গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে ছাড়া। মহানায়ক তাঁর বাড়িতে অনুষ্ঠান শুরু করার আগে খোঁজ করতেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় সেই অনুষ্ঠানে এসেছেন কিনা অথবা তিনি আর কত দূরে রয়েছেন।

সুপ্রিয়া দেবী ছিলেন খুব রন্ধনপটিয়সী, আর ঠিক সেকারণেই তিনি স্মৃতিচারণায় জানিয়েছিলেন যে, রান্না করে তিনি যাঁদের খাওয়ানোর পরে ভীষণ তৃপ্তি পেতেন তাঁদের মধ্যে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার একজন। আমরা সকলেই জানি মহানায়ক উত্তম কুমার যখন কোনো গানে লিপ দিতেন তখন খুবই স্বাভাবিক ও সাবলীল মনে হতো তাঁকে, যেন মনে হতো এ গানগুলি তাঁরই গাওয়া। এসবের কারণ অভিনয়ের পাশাপাশি গানেও পারদর্শী ছিলেন উত্তম কুমার। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের বন্ধু মহানায়ক উত্তম কুমার নিদান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কঠোর গানের তালিম নিয়েছিলেন জীবনের একটা সময়ে। উত্তম কুমারের প্রিয় গীতিকার ছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা এবং আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গাওয়া একটি গান মহানায়কের ভীষণ প্রিয় ছিল।

এই মোম জোছনায় অঙ্গ ভিজিয়ে

এসো না গল্প করি

দেখ ওই ঝিলিমিলি চাঁদ

সারারাত আকাশে শলমা জরি ॥

ঘরোয়া কোনো আড্ডায় যখনই উত্তম কুমারকে গান গাওয়ার জন্য অনুরোধ করত বন্ধুরা, নির্দ্বিধায় তাঁর প্রিয় গীতিকার বন্ধু গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা এ গানটি গাইতেন। উত্তম কুমার নিজে প্রায়ই বলতেন– গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এমন সুন্দর করে গান লেখেন যে, সে গান না গেয়ে পারা যায় না। গীতিকার হিসেবে খুবই বৈচিত্র্যধর্মী ছিলেন শ্রী মজুমদার মহাশয়। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জীবনে শচীন দেব বর্মণের ভূমিকা কয়েকটি গানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এস.ডি বর্মণ যে নিবিড় সম্পর্ক মজুমদারের সঙ্গে ঘটিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে সে সম্পর্ক আর.ডি বর্মণও অনেকদূর টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। কলেজে পড়াকালীন অবস্থায় গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার শচীনকর্তার কাছাকাছি আসবেন বলে, এমন বাসনা মনে নিয়ে ঘুরতেন। কিন্তু ভাগ্য যে এমনভাবে সহায় হবে তিনি তা ভাবতে পারেননি মোটেও। সবেমাত্র তিনি তখন দু-একটি গান লেখা শুরু করেছেন। মি.মজুমদারের এক বন্ধু মারফত একটি গান চলে যায় শচীনকর্তার কাছে। তিনি জানতে চান গানটি কার লেখা? সেই গানটি তিনি পরে রেকর্ড করেন। নিজে ডেকে নেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে।

এ্যালবামের গান হোক কিংবা চলচ্চিত্রের গানই হোক। তাঁর গানে যে শুধুমাত্র দর্শক-শ্রোতারা শ্রুতিমধুরতা খুঁজে পেতেন তা নয় বরং গানের কথাগুলোর মাঝে জীবনের গল্পের অসাধারণ পরিণতি বিরাজমান থাকতো। গান দিয়ে যেকোনো সিনেমায় উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করা একেবারে নখদর্পণে হয়ে গিয়েছিল গৌরীপ্রসন্ন

বাবুর। বাঙালি শ্রোতার একান্ত প্রেমময় গান গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুর করা। লতা মঙ্গেশকারের কণ্ঠের সেই স্মৃতি জাগানিয়া বিখ্যাত গান:

প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে আমার এ দুয়ার প্রান্তে

সেতো হায় মৃদু পায় এসেছিল পারিনি তা জানতে ॥

সে যে এসেছিল বাতাস তো বলেনি

হায় সেই রাতে দীপ মোর জ্বলেনি

তারে সে আঁধারে চিনিতে যে পারিনি আমি পারিনি ফিরায়ে তারে আনতে ॥

যে আলো হয়ে এসেছিল কাছে মোর তারে আজ আলেয়া যে মনে হয়

এ আঁধারে একাকী এ মন আজ আঁধারেরই সাথে শুধু কথা কয়।

আজ কাছে তারে এত আমি ডাকি গো

সে যে মরীচিকা হয়ে দেয় ফাঁকি গো

ভাগ্যে যা আছে লেখা হায়রে তারে চিরদিনই হবে জানি মানতে ॥

এ গানটির সঙ্গে দারুণ গল্প জুড়ে রয়েছে। অন্যসব বাঙালির মতো গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জীবনে গীতিকার হয়ে ওঠার পেছনে অদৃশ্য অনুপ্রেরণা রয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। কবিগুরুর বহু লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বাংলা গান লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বিখ্যাত একটি গান:

প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে

তাই স্বপ্ন মনে হলো তারে–দিই নি তাহারে আসন

বিদায় নিল যবে, শব্দ পেয়ে গেনু ধেয়ে

সে তখন স্বপ্ন কায়াবিহীন নিশীথ তিমিরে বিলীন ॥

দূরপথে দীপশিখা, রক্তিম মরীচিকা। এই গানের সাথে 'প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে' গানের গভীর মিল রয়েছে এবং কবিগুরুর এ গানের বাণীতে মুগ্ধ হয়ে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে গানটি রচনা করেছিলেন। এমন আরও বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখায়।

গীতা দত্তের গাওয়া, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুর করা বিখ্যাত একটি গান বাঙালি নর-নারীর গভীর প্রেমের চিরকালীন উদাহরণ হয়ে বাংলা গানের ভুবনে ভাস্বর হয়ে রবে, বাংলা গানে যতদিন রোমান্টিক গান বলে কিছু থাকবে। গানটির কথা–

তুমি যে আমার ওগো তুমি যে আমার

কানে কানে শুধু একবার বলো তুমি যে আমার ॥

আমার পরাণে আসি, তুমি যে বাজাবে বাঁশি

সেই তো আমারি সাধনা চাই নাতো কিছু আর ॥

স্বর্ণযুগের গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৫৭ সালে তাঁর প্রথম হিন্দি ছায়াছবিতে গান লেখার জন্য বম্বেতে পাড়ি জমান। গুরুদত্ত সাব একটি ছবির পরিচালনা করবেন বলে ভেবেছেন। ছবির নাম 'তেরা নাম্বার'। বাছাই হয়ে গেছে নায়িকা এবং গায়িকা। এ দুটির ভূমিকাতেই রয়েছেন গীতা দত্ত। তাঁর জন্য গান লেখার সুযোগ পেলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। দুর্ভাগ্যক্রমে ছবিটির মুক্তি কোনো এক অজানা কারণে আটকে যায়। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন এস.ডি বর্মণ। তাঁর সুরে এবং গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় এর আগে একটি গান গেয়েও ছিলেন গীতা দত্ত। কিন্তু যেহেতু ছবিটি মুক্তি পায়নি সেহেতু গানটি প্রকাশিত হচ্ছে না। তার কিছু পরবর্তী সময়ে এস.ডি বর্মণ সেই গানটি নিজেই গেয়ে রেকর্ড করেন। আর সেই গানটি প্রকাশিত হয়, সেই বছরের পূজোর অ্যালবামে। গানটি ছিল:

ও জানে ভ্রমরা কেন কথা কয় না

জানে মহুয়া কেন মাতাল হয় না

জানি আমি শুধু জানি ॥

এমন স্বর্ণযুগের গানের আরও একটি সোনাঝরা গানের গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, গানটির শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরকারও ছিলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল:

জীবনে যদি দ্বীপ জ্বালাতে নাহি পারো

সমাধি পরে মোর জ্বেলে দিও

এখনো কাছে আছি তাইতো বোঝো না

আমি যে তোমার কত প্রিয় ॥

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় আরো কয়েকটি মনভরানো গানের মধ্যে উল্লেযোগ্য গান শ্রোতাদের নিশ্চয়ই মনে আছে শ্যামল মিত্র এবং মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত গান:

দোলে দোদুল দোলে ঝুলনা

দোলে কৃষ্ণ দোলে ঝুলনা

দোলে রাই দোলে ঝুলনা ॥

কিশোর কুমারের কণ্ঠে বিখ্যাত হওয়া গান:

কি আশায় বাঁধি খেলাঘর, বেদনার বালুচরে

নিয়তি আমার ভাগ্য লয়ে যে, নিশি দিন খেলা করে ॥

বিখ্যাত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে, নচিকেতা ঘোষের সুরে, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা একটি বিখ্যাত গান হল:

আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে

পান্থ পাখির কূজন কাকলী ঘিরে

আগামী পৃথিবী কান পেতে তুমি শোনো

আমি যদি আর নাই আসি হেথা ফিরে ॥

বাংলা গানের অমর সুরকার ও শিল্পী শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা বিখ্যাত একটি গান, যে গান শুনলে বাঙালি শ্রোতার মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে আজও, আজও আনমনে দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ঝড় তোলে বুকে। এই গানটির সুরকার ছিলেন সুধীন দাশগুপ্ত:

তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা

কে বলে আজ তুমি নাই

তুমি আছো মন বলে তাই ॥

তোমারই অমর নাম জয় গৌরবে,

স্মরণে যে চিরদিন জানি লেখা রবে

মরণে হারায়ে তোমারে খুঁজে পাই ॥

১৯২৪ সালের ৫ ডিসেম্বর গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলকাতায়। গৌরীপ্রসন্নের পিতা অধ্যাপক গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার ছিলেন ভারতবিখ্যাত উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের বাবা। পারিবারিকভাবেই গৌরীপ্রসন্ন বাবুরা ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী। এই সম্ভ্রান্ত মজুমদার পরিবারটির আদিবাড়ি ছিল বাংলাদেশের পাবনায়। গৌরীপ্রসন্ন বাবুর জন্মের বহুবছর আগেই তাঁদের পরিবার কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। কলকাতার জগদ্বন্ধু স্কুলের মেধাবী ছাত্র ছিলো গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। গৌরীপ্রসন্ন বাবুর পিতার ইচ্ছে ছিল তাঁর মতো পুত্র একদিন উদ্ভিদবিজ্ঞানী হবেন, কিন্তু বাবার সে সাধ সফল হলো না। পুত্র হলেন ভারতবিখ্যাত গীতিকবি। যাঁর লেখা গান– বাঙালি শ্রোতার মনে বহুবার বসন্ত এনেছে– আবার শ্রাবণও ঘনিয়েছে। বাড়িতে মায়ের কাছে থাকা উপহার হিসেবে পাওয়া গ্রামোফোনে গান শুনে শুনে ছোটবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি অনুরাগ জন্মেছিল গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের। সঙ্গীতসাধক গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে গান শিখেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন। বেহালা শেখেন মিহির কিরণ ভট্টাচার্যের কাছে ছোটবেলায়। গৌরীপ্রসন্ন কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে অবস্থিত সঙ্গীত সম্মিলনীতেও গান-বাজনা শিখেছিলেন কিছুদিন। বাবার বন্ধু প্রিয়রঞ্জন সেনের পরামর্শে তাঁর বাবাই তাঁকে ঐ সঙ্গীত সম্মিলনীতে ভর্তি করিয়ে ছিলেন। বয়সে একটু বড় হওয়ার পর সাহিত্যপ্রীতি এসে ভিড় করেছিল মনের কোণে, তাই গান-বাজনা বেশিদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়নি। সংগীতের চেয়ে সাহিত্যের

দিকেই তাঁর বেশি ঝোঁক ছিল। জানা যায় ১০-১২ বছর বয়স থেকেই বাংলায় কবিতা লেখা আরম্ভ করেন গৌরীপ্রসন্ন। পারিবারিকভাবেই মজুমদার পরিবার সাহিত্য- সঙ্গীত, জ্ঞান- বিজ্ঞান, শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল সে সময়। শৈশবে পরিবারের সূত্র ধরেই গৌরীপ্রসন্নের মনে সেই আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছিল প্রবলভাবে। সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে পরিবার থেকে যাঁরা অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম তাঁর বাবার বন্ধু ড.সুরেন্দ্রনাথ সেন ও জেঠতুতো ভাই গল্পকার ও প্রখ্যাত শিল্পনির্দেশক ভূমেন মজুমদার। ছোটবেলায় বড় আশা নিয়ে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার তখনকার একটি সাময়িক পত্রিকাতে একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই কবিতা ছাপার অযোগ্য বলে ফেরত আসায় মনে মনে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। অভিমানে তিনি ইংরেজি কবিতা লেখা শুরু করলেন তখন থেকেই। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা ইংরেজি কবিতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন মেসো মশাই তারাদাস বাগচী। পরবর্তীকালে বিলেত ও আমেরিকার পত্রিকায় গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা ইংরেজি কবিতা ছাপা হয়েছিল তারাদাস বাগচীর তৎপরতায়। গৌরীপ্রসন্নের বাবা তাঁর এই ইংরেজি ভাষায় কবিতা লেখা বিষয়টি খুব পছন্দ করেননি এবং তারই ফলশ্রুতিতে একদিন ছেলেকে মাতৃভাষায় কবিতা লিখতে নির্দেশ দিলেন। পিতৃবাক্য শিরে ধারণ করে বাংলা ভাষায় কবিতা লেখা শুরু করার পরে, কলকাতার বহু পত্রপত্রিকায়, তখনকার সময়ের কিশোর ও সম্ভাবনাময় কবি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কবিতা সগৌরবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৫ বছর বয়সে মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। গৌরীপ্রসন্নের জীবনে এই সময়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এজন্য যে, শান্তিনিকেতনের পড়ুয়া এক ছাত্রের সাথে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের পরিচয় হয় যার নাম অরূপ মিত্র। মেধাবী অরূপ মিত্র গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের একটি লেখা পড়ে সে সময় স্পষ্ট বুঝে ছিলেন যে ভবিষ্যতে ভুবনবিখ্যাত গীতিকার হওয়ার সম্ভাবনা ও প্রতিভা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের মধ্যে বিদ্যমান। এই অরূপ মিত্রের অনুপ্রেরণায় গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার গান লেখা শুরু করেন।

এই প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার সময়ই গৌরীপ্রসনেন্ন পরিচয় হয় বিমল ভূষণ নামের একজন সঙ্গীতশিল্পীর সাথে যিনি তখনকার সময়ে 'জজ সাহেবের নাতনি' ছবিতে শচীন দেব বর্মণের সুরে গান গেয়ে ব্যাপকভাবে বিখ্যাত হয়েছেন। সে জন্যে কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানিরও বিশেষ আগ্রহ ছিল বিমল ভূষণের নতুন রেকর্ড বের করার ব্যাপারে। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের প্রথম লেখা গানে, বিমল ভূষণেরও সেবার প্রথম গানের রেকর্ড বের হয় কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানি থেকে। সুর করেছিলেন শিল্পী নিজেই। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা গান দুটি ছিল: 'আমি বুঝতে পারি না কী আছে তোমার মনে' এবং 'শুধু পত্র ঝরায় অলস চৈত্রবেলা' (রেকর্ড নম্বর জি. ই ২৯৪৬)। প্রথম গ্রামোফোনে প্রকাশিত গান তেমন জনপ্রিয় না হলেও,

পরবর্তীতে লেখা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের– 'ভালোবাসা যদি অপরাধ হয় তবে অপরাধী আমি' গানটি বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় হওয়ায় গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার বিখ্যাত হয়ে যান। ১৯৪৭ সালের পূজায় বিখ্যাত হওয়া এ গানটির সুরকার ছিলেন গায়ক সুধীরলাল চক্রবর্তী। গানটির শিল্পী ছিলেন- অপরেশ লাহিড়ী। মেগাফোন কোম্পানি থেকে বের হয়েছিল গানটি। যার রেকর্ড নম্বর (জে.এন.জি-৫৮৮৭)। এ গানটিই প্রথম খ্যাতি এনে দিয়েছিল গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে।

জীবনে প্রথম গান লেখার সুযোগ পান পশুপতি ঘোষ মহাশয়ের 'অক্ষরণীয়া' (১৯৪৮) এবং 'প্রিয়তমা' (১৯৪৮) ছায়াছবিতে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায় 'পদ্মা প্রমত্তা নদী 'এবং 'স্বামী' ছায়াছবির জন্য গান লেখেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। ১৯৫৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মুক্তিপ্রাপ্ত 'অগ্নিপরীক্ষা' ছায়াছবির বিপুল সঙ্গীত সাফল্যে ছবির সঙ্গীত পরিচালক অনুপম ঘটক এবং গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার স্মরণযোগ্য গানের বিরল ইতিহাস সৃষ্টি করেন সেকালে জনমানসে। এই অগ্নিপরীক্ষা ছবির আকাশছোঁয়া সাফল্যের পর চিত্রজগতের সকল পরিচালক, সঙ্গীত পরিচালক এবং সুরকারগণ একটা বিষয় বুঝেছিলেন যে, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার বাংলা গানে প্রবেশ করেছেন গানের বাণীর কুসুমহার শ্রোতাদের গলায় পরাতে এবং গানের গৌরব বাড়ানোর নিমিত্তে। এরপরে অসংখ্য ছবিতে গান লেখার জন্য ডাক আসতে থাকে মি. মজুমদারের কাছে। অগ্নিপরীক্ষা ছবির গানের মধ্যে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় হয়েছিল যে গানগুলো–

গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু,

কে তুমি আমারে ডাকো অলখে লুকায়ে রাখো,

ফুলের কানে ভ্রমর আনে স্বপ্নভরা সম্ভাষণ ,

যদি ভুল করে ভুল মধুর হলো

এমন গানের সুরের জাদুতে ও গানের বাণীর কাব্যময়তা মানুষের বুকে ঝড় তুলেছিল কথায় ও সুরে। সাথে সাথে ছিল ছন্দের দোলা ও রোমান্টিকতায় পরিপূর্ণ এসব গান। উপরের গানগুলি সব সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া ছিল। আরও কালজয়ী হয়ে আছে 'ভালোবাসা' ছায়াছবির সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া: তুমি যে আমার প্রথম রাতের, পথ চেয়ে থাকা দীপের ভাতি। 'সবার উপরে' ছায়াছবির: জানি না ফুরাবে কবে এই পথ চাওয়া, ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা এই মাধবী রাত। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া: জীবন নদীর জোয়ারভাটায় কত ঢেউ ওঠে পড়ে/ সে হিসাব কভু রাখে না কালের খেয়া– এ গানটিও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা অবিস্মরণীয় একটি গান।

মানবজীবনের পরম সত্যকে, শুধু উপলব্ধির মধ্যে না রেখে গানের বাণীতে রূপ দিয়েছিলেন এ গানের মাধ্যমে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। যেসব বাণীচিত্রে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার গান লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন সেগুলো: শ্রী তুলসী দাস, সমর, জিঘাংসা, রাজমোহনের বউ, নতুন পাঠশালা, শুভদা, বৌদির বোন, শুভযাত্রা, প্রতিধ্বনি, মায়াকানন, সাত নম্বর কয়েদি, হরিলক্ষ্মী প্রভৃতি। ১৯৫৫ সালে গান লেখেন: অনুপমা, দত্তক, জয় মা কালী, বিধিলিপি, ঝড়ের পরে, পথের শেষে, সাজঘর, ছোট বউ, দেবত্র, দেবী মালিনী, রাতভর, পরেশ, জয় মা কালী বোর্ডিং, উপহার, গোধূলি, সবার উপরে, অর্ধাঙ্গিনী, দুজনায়, অসমাপ্ত, সূর্যমুখী ইত্যাদি। ১৯৫৭ সালের দিকেও বিখ্যাত অনেক ছবিতে গান লিখেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। এসব ছবির মধ্যে উল্লেখ করার মতো: পৃথিবী আমারে চায়, হারানো সুর, জীবন তৃষ্ণা, বসন্ত বাহার, চন্দ্রনাথ, পথে হল দেরী প্রভৃতি।

১৯৫৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি: ভানু পেল লটারি, লুকোচুরি, শিকার, ইন্দ্রাণী, যৌতুক, সূর্য্যতোরণ, বন্ধু ছবিতেও সঙ্গীতের সাফল্য অক্ষুন্ন রেখেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। ১৯৫৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত যেসকল ছবিতে গান লিখেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: নীল আকাশের নীচে, মরুতীর্থ হিংলাজ, চাওয়া-পাওয়া, জন্মান্তর, গলি থেকে রাজপথ, সোনার হরিণ, খেলাঘর, দীপ জ্বেলে যাই, অবাক পৃথিবী, পার্সোনাল এসিস্টেন্ট, প্রভৃতি। ১৯৬০ সালে বিখ্যাত হওয়া যেসকল ছায়াছবিতে গান লিখেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, তার মধ্যে অন্যতম: উত্তর মেঘ, বাইশে শ্রাবণ, চুপি চুপি আসে, রাজা সাজা, কুহক, স্মৃতিটুকু থাক, কোনো একদিন, হসপিটাল, শেষ পর্যন্ত, শহরের ইতিকথা, বিয়ের খাতা, অপরাধ, শুন বরনারী।

১৯৬১ সালে মুক্তি পাওয়া ছায়াছবির গানের মধ্যে গৌরীপ্রসন্নের লেখা গান রয়েছে: আশায় বাঁধিনু ঘর, সপ্তপদী, দুই ভাই, স্বরলিপি, অগ্নিসংস্কার, সাথীহারা, কেরী সাহেবের মুন্সী, পঙ্কতিলক, কঠিন মায়া, দুই ভাই ছবিতে। ১৯৬২ সালে গান লিখেছিলেন: বিপাশা, বন্ধন, কাজল, আগুন, নবদিগন্ত, ধূপছায়া, স্যরি ম্যাডাম, দাদা ঠাকুর প্রভৃতি ছায়াচিত্রে। ১৯৬৫ সালে যেসব ছবিতে গান লিখেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার তার মধ্যে অন্যতম– আলোর পিপাসা, তৃষ্ণা, অন্তরাল, মহালগ্ন, সূর্যতপা প্রভৃতি।

১৯৬৬ সালে গান লেখেন রাজদ্রোহী, শুধু একটি বছর, সুশান্ত শা, হারানো প্রেম, লবকুশ ছবিতে। এছাড়া এন্টনি ফিরিঙ্গি, দুষ্ট প্রজাপতি, পথে হলো দেখা, ছোট্ট জিজ্ঞাসা, বিবাহ বিভ্রাট, দুরন্ত চড়াই, শেষ থেকে শুরু, চেনা অচেনা, চিরদিনের, সমান্তরাল, পদ্ম-গোলাপ, রাজকুমারী, রূপসী, স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গনে, নিশিপদ্ম, কুহেলী, স্ত্রী, সন্ন্যাসী রাজা, অমানুষ, মৌচাক, বনপলাশীর পদাবলী, দেয়া নেয়া, জঙ্গল পাহাড়ি, বাবা তারকনাথ, অনুরাগের ছোঁয়া প্রভৃতি। গীতরচয়িতা হিসেবে সাফল্যের একমাত্র কারণ ছিল ছবির কাহিনী এবং দৃশ্যের প্রয়োজনে গৌরীপ্রসন্ন বাবু

এমন গান লিখতেন, যা হয়ে উঠত ছায়াছবির চরিত্র ও গল্পের জন্য অনিবার্য। মানুষের গহন মনের অনুভূতি ধরা দিত তাঁর অনুভবে ও গানে। গীতিকবিতায় ফুলের মতো ফুটিয়ে তুলতেন সে সব অনুভূতিগুলি। ছবি না দেখে যদি কেউ ঐ ছবির গান শুনে তাতেও গানের আবেদনে একটুও ঘাটতি পড়বে না, মূলত এখানেই গীতিকবির, সুরকারের এবং গায়কের যথার্থ সাফল্য নিহিত। 'হারানো সুর' ছবির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত ছবিতে গীতা দত্তের গাওয়া:

তুমি যে আমার ওগো তুমি যে আমার

এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া:

আজ দু'জনার দুটি পথ ওগো দুটি দিকে গেছে বেঁকে

আজও কালের সাক্ষী হয়ে আছে বাংলা গানের ভুবনে। রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায় ১৯৫৭ সালে মুক্তি পেয়েছিল: 'পথে হল দেরি' ছায়াছবি। উত্তমকুমার এবং সুচিত্রা সেন অভিনীত জনপ্রিয় এ চলচ্চিত্রের সঙ্গীতসাফল্য সে সময়ে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছিল শিল্পী-গীতিকার-সুরকার এবং চলচ্চিত্র পরিচালককে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া এই ছবিরই কয়েকটি গান:

পলাশ আর কৃষ্ণ চুড়ায় আগুন জ্বেলে,

তুমি না হয় রহিতে কাছে

এ শুধু গানের দিন এ লগন গান শোনাবার

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায় 'সূর্যমুখী' ছায়াছবিতে:

আকাশের অন্তরাগে আমারই স্বপ্ন জাগে এবং

আমার সূর্যমুখী তোমার মুখের পানে শুধু চেয়ে থাকে।

গান দু'টি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। এ গান তখন মানুষের মুখে মুখে ফিরত। "প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে বাঙালি তখনও ভালোবাসার ক্ষেত্রে লাজুক ছিলেন এবং প্রেমের ক্ষেত্রে মন আশা-নিরাশায় আন্দোলিত হতো। আর সেই উথাল পাতাল করা মনের খবর তো মুখে সোজাসুজি বলা সম্ভব ছিল না, তাই গানের আড়াল খোঁজা।"[২০]

উত্তম এবং সুচিত্রা সেন অভিনীত ছবি 'সাগরিকা' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বিখ্যাত সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। চলচ্চিত্র অঙ্গনে, এ ছবি তখন সুপারহিট হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে গানগুলিও হয়েছিল ব্যাপক জনপ্রিয়। শ্রোতাদের দর্শকদের নিশ্চয়ই মনে আছে এই ছবির বিখ্যাত গান, উত্তম কুমারের লিপে এবং শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে গাওয়া: 'আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে সাত সাগর আর তের নদীর পারে'। আরও বিখ্যাত গান সুচিত্রা সেনের লিপে এবং সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গাওয়া: এইতো আমার প্রথম ফাগুন বেলা, পাখি জানে ফুল কেন ফুট গো উজানে পাখি কেন গান গায়। নচিকেতা ঘোষের সঙ্গীত পরিচালনায় 'ভানু পেল লটারি' ছবির: পুতুল নেবে গো পুতুল, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায়, 'লুকোচুরি' ছবির: মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে, এই তো হেথায় কুঞ্জ ছায়ায়, এক পলকের একটু দেখা, শিং নেই তবু নাম তার সিংহ। 'ইন্দ্রানী' চলচ্চিত্রে নচিকেতা ঘোষের সঙ্গীত পরিচালনায়: নীড় ছোট ক্ষতি নেই, সূর্য ডোবার পালা আসে যদি আসুক বেশ তো প্রভৃতি গানের মাধ্যমে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার বাংলা ছায়াছবির গানের জগতে পাকাপোক্ত এবং সম্মানের জায়গা করে নিয়েছেন। মৌ বনে আজ মৌ জমেছে এবং মালতি ভ্রমরে করে ঐ কানাকানি- হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া এই ছায়াছবির গানে, আবিষ্ট হয়নি এমন শ্রোতা বোধহয় কমই আছে। এ গান দুটি ১৯৫৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'বন্ধু' ছবির। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন নচিকেতা ঘোষ। গানের কথা লিখেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। বাংলা গানের ভুবনে দু'টি অমূল্য রত্নখচিত গান হলো বিখ্যাত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া: পথের ক্লান্তি ভুলে স্নেহ ভরা কোলে তব / মাগো বল কবে শীতল হব / কত দূর আর কত দূর বল মা এবং তোমার ভুবনে মাগো এত পাপ/ একি অভিশাপ নাই প্রতিকার এই অবিস্মরণীয় ও অনুসরণীয় গানের বাণী লিখেছিলেন গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। গান দু'টি ছিল 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ছবির। গানের সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নিজেই। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার মানুষের সকল অনুভূতিকে রূপ দিতে পারতেন গীতিকবিতার মাধ্যমে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের অনুভূতি সর্বগামী এবং তাঁর লেখনি সর্বব্যাপী ছিল। তার উদাহরণ– ১৯৫৯ সালে মুক্তি পাওয়া 'নীল আকাশের নীচে' ছায়াছবিতে গাওয়া হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের শ্রুতিসুখকর গান:

নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী

আর পৃথিবীর পরে ঐ নীল আকাশ

তুমি দেখেছো কি।

এছাড়াও ছিল আরেকটি বিখ্যাত গান:

ও নদীরে একটি কথাই শুধাই শুধু তোমারে

বল কোথায় তোমার দেশ প্রভৃতি।

'দীপ জ্বেলে যাই' ১৯৫৯ সালের আরেকটি ব্যবসাসফল ছায়াছবি। এখানে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার-হেমন্ত মুখোপাধ্যায় জুটি বিপুল সাফল্যলাভ করেছিল। লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে গাওয়া: আর যেন নেই কোনো ভাবনা এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া: এই রাত তোমার আমার বিপুল জনপ্রিয় হয়। ১৯৬০ সালে বিখ্যাত হওয়া সিনেমার গানের মধ্যে 'হসপিটাল' ছবির: এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় এ কী বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু এবং 'শেষপর্যন্ত' ছবির গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া: কেন দূরে থাকো শুধু আড়াল রাখো, এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে, এই বালুকা বেলায় আমি লিখেছিনু দর্শক, শ্রোতাদের আজও স্মৃতিকাতর ও উজ্জীবিত করে তোলে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের বাংলা সফল গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'দুই ভাই' ছবির:

ওগো যা পেয়েছি সেই টুকুতেই খুশি আমার মন,

আমার জীবনের এত হাসি এত খুশি কোথায় গেল এবং

তারে বলে দিও সে যেন আসে না আমার কাছে।

১৯৬২ সালের 'বিপাশা' ছবির জন্য লেখা একটি গান সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গীত:

'আমি স্বপ্নে তোমায় দেখেছি' আজও বিখ্যাত হয়ে আছে। ১৯৬৫ সালের 'অন্তরাল' ছায়াছবিতে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা এবং শ্যামল মিত্রের গাওয়া:

তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা কে বলে আজ তুমি নাই,

তুমি কি এমনি করেই থাকবে দূরে আমার এ মন মানে না।

এসব গানের কথা ও সুর আজও বাঙালি শ্রোতাদের নিবিড় অনুভবে ডেকে আনে গানের পানে।

'এন্টনি ফিরিঙ্গি' ছায়াছবির জন্য গান লেখেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও প্রণব রায়। এ ছবিতে অনিল বাগচী সঙ্গীত পরিচালনা করেন। এ ছবির গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা বিখ্যাত গান:

আমি যে জলসা ঘরে বেলোয়ারী ঝাড়

নিশি ফুরালে কেহ চায়না আমায় জানি গো আর।

গানটি মান্না দে এবং সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় দু'জনেই আলাদা করে গেয়েছিলেন। সেকালে এবং একালে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা লাভকরেছে এ গান। এ ছবির আরেকটি বিখ্যাত গান গেয়েছেন মান্না দে:

আমি যামিনী তুমি শশী হে ভাতিছো গগন মাঝে

মম শরশীতে তব উজল প্রভা বিম্বিত যেন লাজে।

উল্লেখ্য আমি যে জলসাঘরে এবং আমি যামিনী তুমি শশী হে গান দু'টি শুধু জনপ্রিয় হয়নি, বাংলা গানের ভুবনে কালজয়ী গানের ধারায় অমূল্য সম্পদের উপমা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ১৯৮৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'অনুরাগের ছোঁয়া' ছায়াছবির গান জীবনের শেষবেলায়ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন অজয় দাশ। এ ছবিতে লতা মঙ্গেশকারের গাওয়া:

আমি যে কে তোমার তুমি তা বুঝে নাও, অমিত কুমারের গাওয়া: যা পেয়েছি আমি তা চাই না এবং কিশোর কুমারের গাওয়া: আমি যে কে তোমার গান ছায়াছবিকে সঙ্গীতসাফল্য এনে দিয়েছিলো। বাংলা ছায়াছবির মতো আধুনিক বাংলা গানের গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের অবদান অপরিসীম। জানা যায় বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ছায়াছবিতে সব থেকে বেশি গান গেয়েছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায়। বেসিক ডিস্কেও তিনি গান করেছিলেন সব থেকে বেশি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য গান– পথ ছাড়ো ওগো শ্যাম, হয়তো কিছুই নাহি পাবো, গানে তোমায় আজি ভোলাবো, অনেক দূরের ওই যে আকাশ। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় আধুনিক বাংলা গান মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া সেই: বনে নয় মনে মোর পাখি আজ গান গায় গানটি আজও শ্রোতার মনে দোলা দিয়ে যায়।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের শচীন দেব বর্মণের সুরে গান: আমি পথ চেয়ে রবো, বাজে না বাঁশি গো, মালা খানি ছিল হাতে, আজো আকাশের পথ, খুলিয়া কুসুম সাজো শ্রীমতী যে কাঁদে, ও জানি ভ্রমরা কেন কথা কয় না, বাঁশি শুনে আর কাজ নাই প্রভৃতি অসংখ্য গান। গৌরীবাবুর লেখা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া: মেঘ কালো আঁধার কালো, অলির কথা শুনে বকুল হাসে, মাগো ভাবনা কেন। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া, গৌরীপ্রসন্ন

মজুমদারের লেখা গান– জীবনে যদি দীপ জ্বালাতে নাহি পার, জানি একদিন আমার জীবনী লেখা হবে, বালুকাবেলায় কুড়াই ঝিনুক প্রভৃতি।

১৯৫৩ সালে বাংলা গানের প্রবাদপুরুষ মান্না দের কণ্ঠের প্রথম রেকর্ডকৃত দুটি গান: কত দূরে আর নিয়ে যাবে বল এবং হায় হায়গো রাত যায় যায় গো। এছাড়া মান্নাদের গাওয়া বিখ্যাত আরো যেসব গান গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা সেগুলি হলো– তীর ভাঙ্গা ঢেউ আর নীড় ভাঙা ঝড়, ওগো বর্ষা তুমি ঝরো না গো অমন করে, যদি কাগজে লেখ নাম, তুমি আর ডেকো না পিছু ডেকো না, কফি হাউজের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই/ কোথায় হারিয়ে গেল সোনালী বিকেলগুলো সেই। এসব গানে সমস্ত বাঙালির মনপ্রাণ স্মৃতি বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। শ্যামল মিত্রের সেই বিখ্যাত গান সেটিও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা:

এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে মন যেতে নাহি চায়। সুরকার অনুপম ঘটকের মৃত্যুর পরে কবি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার যাঁদের সঙ্গে হৃদয় উজাড় করে দিয়ে গান রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুরকার হচ্ছেন– রবীন চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ এবং শ্যামল মিত্র এবং তাঁদের মধ্যে মেলবন্ধন গড়ে উঠেছিল দৃঢ়ভাবে।

১৯৫১ সালে মীরা দেবীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। পারিবারিক জীবনে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ছিলেন নিঃসন্তান। 'দেয়া নেয়া' ছবিতে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা গান– জীবন খাতার প্রতি পাতায়/ যতই কর হিসাব-নিকাশ কিছুই রবে না। এ গানের বাণী কবির জীবনে বাস্তবে রূপ পেয়েছিল শেষবেলায়। বাংলা গানে এত অপরিমেয় যাঁর সৃষ্টি, তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল গভীর দুঃখযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে, যা তাঁর সঙ্গে পুরোপুরি বেমানান। মূলত কিছুই থাকে না এ পৃথিবীতে থাকে শুধু মানুষের কালজয়ী সৃষ্টি। সৃষ্টির মাধ্যমে অমর হয়ে থাকেন স্রষ্টা। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার তেমনই গীতিকার ছিলেন। তিনি ১৯৮৬ সালের ২০ আগস্ট দুঃসহ যন্ত্রণায় দিন কাটিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বম্বের একটি হাসপাতালে। তিনি ক্যান্সারে মারা যান বলে জানা যায়। কত বড় শক্তিমান গীতিকবি হলে মৃত্যুর পরেও ১৭ টি ছায়াছবিতে তাঁর লেখা গান ব্যবহার হয়েছিল। এই ধারাবাহিকতার শেষ ছবির নাম– 'জঙ্গল পাহাড়ী'। যা মুক্তি পেয়েছিল ১৯৯১ সালে। একবার শ্যামল মিত্র গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে বলেছিলেন যে– এমন গান লিখে দেন যা জনপ্রিয় হবেই। শ্যামল মিত্রের কথার উপর ভিত্তি করে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার গান লিখলেন:

এমনও দিন আসতে পারে

যখন তুমি দেখবে আমি নাই

আমায় তুমি ভুল বুঝ না যেন

তোমার আগে যদি আমি যাই।

গানের সুর করেছেন শ্যামল মিত্র নিজেই এবং ১৯৫৪ সালের জুন মাসে এ গান প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পী শ্যামল মিত্র বিখ্যাত হয়ে যান। একই সাথে সুরকার শ্যামল মিত্রকেও সকল বাঙালি শ্রোতারা আদর করে বরণ করেছিল মনের মাঝে। এই গানগুলি এত উঁচুমানের যে, এসকল গান যখন বোদ্ধা শ্রোতা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন, শ্রবণ করেন ঠিক তখনই একটা অনুভবের সৃষ্টি হয়। মনে হয় যেন, পৃথিবীর মহান সৃষ্টিকর্মের তথা স্বর্গীয় সুখের, পরম শান্তি ও তৃপ্তির তিনিও একজন ভাগীদার হলেন।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা বিখ্যাত কিছু আধুনিক গান

আমি যে কে তোমার তুমি তা বঝে নাও

যা পেয়েছি আমি তা চাই না

আমি যামিনী তুমি শশী হে

আমি যে জলসাঘরে

তুমি কি এমনি করেই থাকবে দূরে

ও নদীরে একটি কথাই শুধাই শুধু তোমারে

নীল আকাশের নিচে এই পৃথিবী

মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে

এই তো হেথায় কুঞ্জ ছায়ায়

এক পলকের একটু দেখা

নীড় ছোট ক্ষতি নেই

সূর্য ডোবার পালা আসে যদি

মৌ বনে আজ মৌ জমেছে

মালতি ভ্রমরে করে ঐ কানাকানি

পথের ক্লান্তি ভুলে স্নেহ ভরা কোলে তব

তোমার ভুবনে মাগো এত পাপ

আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে

এইতো আমার প্রথম ফাগুনবেলা

পাখি জানে ফুল কেন ফুটে গো

ও জানি ভ্রমরা কেন কথা কয় না

বাঁশি শুনে আর কাজ নাই

তীর ভাঙ্গা ঢেউ আর নীড় ভাঙা ঝড়

ওগো বর্ষা তুমি ঝরো না গো অমন করে

যদি কাগজে লেখো নাম

তুমি আর ডেকো না পিছু ডেকো না

কফি হাউজের সেই আড্ডাটা আজ

এমনও দিন আসতে পারে

জীবনখাতার প্রতি পাতায়

এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে মন যেতে নাহি চায়

বালুকাবেলায় কুড়াই ঝিনুক

জানি একদিন আমার জীবনী লেখা হবে

জীবনে যদি দীপ জ্বালাতে নাহি পারো

বিদায় নিও না হায়

এখনো আকাশে চাঁদ ঐ জেগে আছে

তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা

আমি স্বপ্নে তোমায় দেখেছি

ওগো যা পেয়েছি সেই টুকুতেই

কেন দূরে থাকো শুধু আড়াল রাখো

এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে

এই বালুকাবেলায় আমি লিখেছিনু

এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়

আর যেন নেই কোনো ভাবনা

মেঘ কালো আঁধার কালো

অলির কথা শুনে বকুল হাসে

মাগো ভাবনা কেন

আকাশের অন্তরাগে আমারই স্বপ্ন জাগে

আমার সূর্যমুখী তোমার মুখের পানে

পলাশ আর কৃষ্ণ চুড়ায় আগুন জ্বেলে

তুমি না হয় রহিতে কাছে

এ এই মোম জোছনায় অঙ্গ ভিজিয়ে

শুধু গানের দিন এ লগন গান শোনাবার

আজ দু'জনার দুটি পথ ওগো

তুমি যে আমার ওগো তুমি যে আমার

জানি না ফুরাবে কবে এই পথ চাওয়া

ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা এই মাধবীরাত

গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু

কে তুমি আমারে ডাকো অলখে লুকায়ে রাখো

ফুলের কানে ভ্রমর আনে স্বপ্নভরা সম্ভাষণ

যদি ভুল করে ভুল মধুর হলো

তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা

আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে

কী আশায় বাঁধি খেলাঘর

দোলে দোদুল দোলে ঝুলনা

প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে

গীতিকার পবিত্র মিত্রের গান (১৯১৮-১৯৭৫)

সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যায়
আর এমনি মায়াবী রাত মিলে
দুজনে শুধাই যদি তোমারে কী দিয়েছি
আমারেই তুমি কিবা দিলে।

সোনাঝরা সন্ধ্যা আর মায়াবি রাতে সত্যিই পবিত্র মিত্রের মতো এমন গুণী গীতিকারের লেখাগানের কথা শ্রোতাদের আজও অন্যমনস্ক করে দেয় ক্ষণিকের তরে। ১৯৫৭ সালে রেকর্ডকৃত শিল্পী শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে গাওয়া এ আধুনিক গানটির সুরকার ছিলেন শ্যামল মিত্র এবং কথা লিখেছিলেন বাংলা গানের অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন গীতরচয়িতা পবিত্র মিত্র। এমন অসংখ্য গানের কথার জাদুতে বাংলা গানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করেছেন পবিত্র মিত্র। শ্রোতাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ১৯৫৮ সালে রেকর্ড হওয়া বিনোদ চট্টোপাধ্যায়ের সুরে, পাঞ্জাবে জন্মনেয়া বিখ্যাত শিল্পী মোহাম্মদ রফির কণ্ঠে গাওয়া:

এ জীবনে যদি আর কোনোদিন দেখা হয় দু'জনার
এই তুমি আর এই আমি ওগো নেইতো সেদিন আর।

এমন স্মরণীয় বাংলা গানের গীতিকার পবিত্র মিত্র। স্বর্ণযুগের শ্রুতিমধুর এই গান শুনে আজও আপ্লুত হয় ও মুগ্ধ হয় মানুষ, কারণ গানের শক্তি অনিঃশেষ। একটি গান শুধু গান নয়, গানের আড়ালে বহু গল্প গাঁথা হয়ে থাকে। এক একটি গানকে ঘিরে কত স্মরণীয় মুহূর্ত, কত হৃদয় আকুল করা স্মৃতি। এক-একজন মহান গীতিকার, সুরকার, শিল্পী পৃথিবীতে আসে আর হাজারো হৃদয়হরণ করা গান দিয়ে, পূর্ণিমা রাতের জ্যোৎস্নালোকের মতো, চিত্ত গীতসুধারসে ভরে দিয়ে আবার শূন্যে মিলিয়ে যায়। সেইসব অমর সঙ্গীতকারের জীবন ও কর্মের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এবারে আমরা জানবো পবিত্র মিত্রের জীবন ও গান সম্পর্কে।

সমকালীন বাংলা গানের ধারায় পবিত্র মিত্র একজন অতি আধুনিক গীতরচয়িতার নাম। কাজী নজরুল ইসলামের সমসাময়িক গীতিকার পবিত্র মিত্র। ১৯১৮ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন পবিত্র মিত্র। বাবা প্রফুল কুমার মিত্র ঢাকার একজন বিখ্যাত আইনজীবি ছিলেন এবং পাশাপাশি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। পিতার অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে খুব ছোটবেলা থেকেই সংগীতের দিকে মনোনিবেশ করেন পবিত্র মিত্র। সঙ্গীত উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার ফলে এবং বাড়িতে সাঙ্গীতিক পরিবেশ বিরাজমান থাকার কারণে খুব অল্পবয়সেই পবিত্র

মিত্র সংগীতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ১৯৩৯ সালে ঢাকা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৪০ সালে পবিত্র মিত্র ২২ বছর বয়সে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে যোগদান করেন প্রযোজক, নির্দেশক, ঘোষক এবং নাট্যকর্মী (অভিনেতা) হিসেবে। ঢাকা বেতার কেন্দ্রে পবিত্র মিত্রের সঙ্গে পরিচয় হয় সুরকার সঙ্গীতশিল্পী সঙ্গীতজ্ঞ সুধীরলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে। মি.চক্রবর্তী ১৯৪২ সালে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে সঙ্গীত প্রযোজক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। তাঁরা দুজন সমবয়সী হওয়ায়, সম্পর্কটা খুব আন্তরিক হয়ে উঠেছিল অল্পদিনের মধ্যেই, তাছাড়া দু'জনই সঙ্গীতজ্ঞ হওয়ার কারণে সম্পর্কটা আরো নিবিড় হয়। পবিত্র মিত্রের গান লেখার শুরু হয় গুণগ্রাহী সুধীরলাল চক্রবর্তীর প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায়। ১৯৪৫ সালে প্রথম দুইটি গানের রেকর্ড বের হয় কুমারী নিতা বর্ধনের কণ্ঠে। গানের সুর করেছেন পবিত্র মিত্রের বন্ধু সুধীরলাল চক্রবর্তী। ওদিকে গানের শিল্পী কুমারী নিতা বর্ধন সুধীরলাল চক্রবর্তী এবং অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্যা। গান দুটির কথা ছিলো: 'ওগো নয়নে আবীর দিও না গো শ্যাম রায়' এবং 'বাজে গো বাঁশরি' (রেকর্ড নম্বর: এস সি- ৭৫)। নিতা বর্ধনের চর্চিত কণ্ঠে গান দুটি শ্রোতাদের ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছিল সে সময়। পবিত্র মিত্রের প্রকাশিত এ প্রথম রেকর্ডের বাণিজ্যিক সাফল্যের কারণে তাঁর নাম সঙ্গীত জগতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভবিষ্যৎ চলার পথ আরো সুগম হয়। ১৯৪৫ সালে বন্ধু সুধীরলাল চক্রবর্তী কলকাতায় ফিরে যান এবং তার দু'বছর পর ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় সপরিবারে পবিত্র মিত্র কলকাতায় চলে যান। সুধীরলাল চক্রবর্তীর সহায়তায় কলকাতার কলম্বিয়া ও হিজ মাস্টার্স ভয়েস (এইচ.এম.ভি) গ্রামোফোন কোম্পানিতে গীতিকার হিসেবে যোগদান করেন। গীতিকার পবিত্র মিত্রের প্রথম জীবনে গান রচনার বেশিরভাগ গানের সুর করেছেন বন্ধু সুধীরলাল চক্রবর্তী। এমন কয়েকটি গান:

যেদিন রবো না আমি দিন হলে অবসান, এ জীবনে মোর যত কিছু ব্যথা যত কিছু পরাজয়, শুধু অবহেলা দিয়ে বিদায় করেছ যারে, ওগো নয়নে আবির দিও না গো শ্যামরায়, তোমারে পারি না ভুলিতে, কেন জাগে শুকতারা আজও ঐ দূর নভে, স্মৃতি তুমি বেদনার, আঁখি দিয়ে গেল ডাকি আমারে, মালাখানি ফিরে দাও গো, ওগো মোর গানের পাখি প্রভৃতি গান। ১৯৪৮ সালে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের নাট্যবিভাগে অভিনয়শিল্পী হিসেবেও যোগদান করেন। গান লিখে পবিত্র মিত্র বিখ্যাত হয়ে ছিলেন ১৯৫২ সালে পূজার প্রকাশিত একটি রেকর্ডের জন্য। রেকর্ডকৃত সে গানটি ছিল–

স্মৃতি তুমি বেদনার

আজিও কাঁদিছে হারানো স্বপন হৃদয়ের বেদিকায়।

এই গানটি শুনে দর্শক শ্রোতা অভিভূত হয়ে যান। গানের সুর করেছিলেন সুধীরলাল চক্রবর্তী। অভাবনীয় জনপ্রিয়তালাভ করেছিল শ্যামল মিত্রের গাওয়া পূজায় প্রকাশিত এই গানটি। পূজার সময় সকল ধরনের শ্রোতারা

এককথায় উন্মুখ হয়ে থাকতো পূজার রেকর্ডের জন্য অধীর আগ্রহে। এ ধারা অবশ্য বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে বিশেষকরে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলন রয়েছে। এমনই এক পরিস্থিতিতে এ গানে সেসময়ে একই সাথে জনপ্রিয় হয়ে যান গীতিকার পবিত্র মিত্র, সুরকার সুধীরলাল চক্রবর্তী এবং শিল্পী শ্যামল মিত্র। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এ বছরই অর্থাৎ ১৯৫২ সালের ২০ এপ্রিল মাত্র ৩২ বছর বয়সে অকালে সুধীরলাল চক্রবর্তী প্রয়াত হয়েছিলেন। পবিত্র মিত্রের গান লেখার স্বপ্নসারথি ও প্রেরণাদাতা সুধীরলাল চক্রবর্তীর অকালপ্রয়াণে পবিত্র মিত্রের মন ভেঙেছিল এবং অনেকটা ভাষাহীন হয়ে পড়েছিলেন। যার ফলে কিছুদিন গান লেখাও থেমে গিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে গ্রামোফোন কোম্পানির অধিকর্তা পি.কে সেনের অনুরোধে পবিত্র মিত্র আবার কলম ধরলেন। শুরু হল আবারও মন দিয়ে গান লেখা–

যে মালা শুকায় যে খেলা ফুরায়, নেই তার কোনো দাম
তাইতো তোমার খেলাঘর হতে, বিদায় নিয়ে গেলাম।
শ্রাবণের কোনো সাঁঝে, যদি ব্যথার বাঁশিটি বাজে
তুমি একবার শুধু মনে মনে ডেক, ভুলে যাওয়া মোর নাম।
তোমার আকাশে পূর্ণিমা, চাঁদ ঝলমল যত তারা
তারই এক কোণে বহুদূরে, আমি রয়েছি তন্দ্রাহারা।
তোমার ফাগুনবেলা, জানি আনে শুধু অবহেলা
তাই কি হবে বলো না হিসাব মিলায়ে,পাইনি কী যে পেলাম।

১৯৫৬ সালে রেকর্ডকৃত গানটির সুর করেছিলেন- শ্যামল মিত্র। শিল্পী তপন কুমার (তালাত মাহমুদ)। রেকর্ড নম্বর- (এন ৮২৬৯১/১৯৫৬ ফেব্রু)। এমন মূল্যবান বিরহ কথনের আধুনিক গান সমকালীন বাংলা গানের ধারায় বিরল বললে অত্যুক্তি হবে না। গানটি শুনলে প্রকৃতপক্ষে যে কেউ অনুধাবন করতে পারবেন কী ব্যথাতুর সুরে কথাগুলো জড়ানো! শ্যামল মিত্রের মতো স্বনামধন্য শিল্পী যদি সুরকার হয় সেক্ষেত্রে গানে এমন সুরযোজনা স্বাভাবিক ও সাবলীল। এই গানটির গায়ক তালাত মাহমুদ যেভাবে তাঁর গায়কি উপস্থাপন করেছেন গানটিতে তা এককথায়- মধুময় রূপ নিয়েছে। যিনি ইতিপূর্বে হিন্দি ও বাংলা গান গেয়ে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অবস্থান করছিলেন সে সময়ে। শিল্পী শ্যামল মিত্রের সম্মোহনী সুরের জাদুতে, পবিত্র মিত্রের কথায় আরও বেশকিছু গান সেকালে এবং একালে সমান জনপ্রিয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গান:

রাতের আকাশ তারায় রয়েছে ঘিরে

তুমি শুধু ওগো এই পথে আর

আস নাই কভু ফিরে।

(শিল্পী- সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৯৫৭ সাল।)

কাজল নদীর জলে

ভরা ঢেউ ছলছলে

প্রদীপ ভাসাও কারে স্মরিয়া।

(শিল্পী- তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৫৬ সাল)

তরীখানি ভাসিয়ে দিলাম ঐ কূলে

ওগো যখন তুমি এলে আবার সব ভুলে।

(শিল্পী- শ্যামল মিত্র। ১৯৫৯ সাল)

এই আঁধারে আমি চলে গেলে

জ্বলবে কি দীপ তোমার ঘরে।

(শিল্পী- শ্যামল মিত্র। ১৯৬০ সাল।)

কেন ডাকো তুমি মোরে

দিশাহীন আমি পথ খুঁজে

হারায়ে গিয়েছি আঁধারে।

(শিল্পী -শ্যামল মিত্র। ১৯৬৪ সাল।)

আমি তো তোমারই কাছে রয়েছি

যদি কোনোদিন কোনো শ্রাবণের নিশিথে

ঘুম ভেঙ্গে মনে পরে আমারে

যেন আমি তো তোমারই কাছে রয়েছি

(শিল্পী- সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সাল ১৯৬০)

ভারতবর্ষের বিখ্যাত কিন্নরকণ্ঠী কণ্ঠশিল্পী লতা মঙ্গেশকারের প্রথম বাংলা আধুনিক গানের রেকর্ড বের হয় গীতিকার পবিত্র মিত্রের কথায় এবং সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুরে ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে। রেকর্ড নম্বর (জিই ২৪৮১৩ / ১৯৫৬ নভে)। গান দুটির কথা ছিল এমন:

আকাশ প্রদীপ জ্বলে

দূরের তারার পানে চেয়ে

আমার নয়ন দুটি শুধুই তোমারে চাহে

ব্যথার বাদলে যায় ছেয়ে। এই রেকর্ডের অন্য গানটি ছিল:

কত নিশি গেছে নিদহারা ওগো

কত ফুল গেছে ঝড়ে

বুঝিগো আমার সে কথাটি বলা

হয়নি তেমন করে।

এমন ইতিহাস সৃষ্টিকরা, কালকে অতিক্রম করা গানের জন্য, বাংলা গান অদ্যাবধি সমৃদ্ধি ও গৌরবের শীর্ষে। আধুনিক বাংলা গানের আরেক দিকপাল শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের আরেকটা পরিচয় ছিল সুরকার হিসেবে। গীতিকবি পবিত্র মিত্রের অনেক গান নিজের কণ্ঠে গেয়েছেন এবং সুর করেছেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। পবিত্র মিত্রের তেমন কিছু গানের উল্লেখ করছি যা সতীনাথ মুখোপাধ্যায় সুর করেছেন:

তুমি আর আমি শুধু জীবনের খেলাঘর

হাসি আর গানে ভরে তুলবো

এবং

এত আলো আর এত হাসি গান

(শিল্পী -শ্যামল মিত্র। ১৯৫৭ সাল।)

মরমিয়া তুমি চলে গেলে

দরদী আমার কোথা পাব

(শিল্পী- সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। সাল ১৯৫৯।)

তুমি ফিরায়ে দিয়েছো বলে

ফিরে চলে যাই চলে যাই

এবং

ভুলে গেছি কবে এই পথে যেতে

(শিল্পী-মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সাল ১৯৬১।)

সেদিন বুঝিতে আমি পারিনি

কত যে আমায় তুমি দিয়েছ

(শিল্পী- সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। সাল ১৯৬১।)

আমার এ গানে স্বপ্ন যদি আনে

আঁখি পল্লব ছায়

(শিল্পী- সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। সাল ১৯৫৭।)

তোমার ভুবন হতে

আমার এ নাম যদি

(শিল্পী -উৎপলা সেন। সাল ১৯৫৭।)

এমন আরও অসংখ্য গানের সুর দিয়েছেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। সুধীরলাল চক্রবর্তীর মৃত্যুর পরে পবিত্র মিত্র তাঁর গানে সুর সংযোজনার জন্য বেশকয়েকজন গুণী সুরকারের সঙ্গে একসাথে কাজ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যাঁরা: শ্যামল মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্ত রায়, ভূপেন হাজারিকা, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, বিনোদ চট্টোপাধ্যায়, সুধীন দাশগুপ্ত, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্তী, চিন্ময় লাহিড়ী প্রমূখ। বেতার কেন্দ্রের সরকারি কর্মকর্তা বিধায় গ্রামোফোন কোম্পানিতে গান লেখার বিষয়ে একসময় সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি হয় পবিত্র মিত্রের উপর। পরে একসময় 'শংকর' ছদ্মনামে গান লেখা শুরু করেন। কিছুদিন পরে অবশ্য সে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায় এবং নিজের নামে গান লেখা শুরু করেন আবার। "চিরকুমার পবিত্র মিত্রর জীবনে গান ছিল ভরকেন্দ্র। সে ভরকেন্দ্র থেকে কখনও তিনি বিচ্যুত হননি । গান তাঁর রক্তের গহন থেকে উদ্দীপনার সঞ্চার করত। তাঁর সঙ্গীতজ্ঞান তাঁকে

শিল্পী নির্বাচনের ক্ষেত্রে জহুরীর মর্যাদা দিয়েছিল। আর অন্তরের অতল থেকে গীতিময় বানী উঠে আসত তাঁর কলমে। তাঁর লেখা গানে গীতিকবিতার রোমান্টিকতা সেকালের বহমান গানের ধারাকে পুষ্ট করেছিল।"[২১] গীতিকার পবিত্র মিত্রসহ সমকালীন প্রায় সকল আধুনিক গানের রচয়িতাগন তাঁদের গানের বাণীতে মানবিক প্রেমের পরিচ্ছন্ন প্রকাশ করেছেন নৈপুণ্যের সাথে। গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য, গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, প্রণব রায়, পুলক বন্দোপাধ্যায়, শৈলেন রায়, মোহিনী চৌধুরী, নরেশ্বর ভট্টাচার্য, সুধীন দাশগুপ্ত, বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী, শ্যামল গুপ্ত, অনল চট্টোপাধ্যায়, হীরেন বসু প্রমুখ প্রত্যেকেই গানের বাণীতে স্বদেশপ্রেম, নারীপ্রেম, প্রকৃতির প্রেমের বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়, তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি: তৃতীয় খণ্ডে, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন গবেষকের লেখা উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন এভাবে: "কবির সুতীব্র ব্যক্তিক অনুভূতি থেকেই গীতিকবিতার জন্ম হয়। তাই গীতিকবিতা একান্তভাবে কবি জীবনীর সঙ্গে জড়িত, অবশ্য তার সঙ্গে মর্ত্যজীবনের সম্পর্ক থাকে অল্প।... কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি, কল্পনা, সৌন্দর্য ও সংগীতের পাখায় ভর করে নিটোল রসমূর্তি ধারণ করে, সেই সংগীতময় বাক্‌মূর্তির নাম গীতিকবিতা (লিরিক পোয়েট্রি)। তিনি আরও লিখেছেন যে গীতিকবিতার মোটিফ বা উপাদান হলো প্রকৃতি, নারীপ্রেম ও স্বদেশপ্রেম। বিশেষ করে নারীপ্রেম। সেই নারীকে তাঁরা গৃহিণী রূপে নয়, প্রেয়সী, শ্রেয়সী, মানসীরূপে বন্দনা করেছেন গীতিকবিতায় ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে। তাই যদি হয়, আধুনিক বাংলা গানে নারীপ্রেম, ফুল, চাঁদ, সমাধি, মালা, চোখের জল প্রভৃতি অনুষঙ্গে কী এমন ক্ষতি হয়েছে। বর্তমানে প্রকৃতিপ্রেম, নারীপ্রেম, দেশপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, মাতৃভক্তি, সন্তানস্নেহ, প্রতিবেশী সহযাত্রী প্রভৃতির প্রতি সহানুভূতির অভাবে আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি? শুধু কঠোর বাস্তবের কথায় কি মানুষের সুকোমল অনুভূতিগুলি বাঁচতে পারে? প্রেমহীন হয়ে বেঁচে কি লাভ? এখনো আকাশে চন্দ্র, সূর্য উঠছে। আমাদের আলোকিত করছে। অকৃপণ প্রকৃতি আমাদের অন্নজান দান করছে। ফল ফুলে এই পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করছে, সুন্দর করছে।"[২২]

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ এবং বিংশ শতকের অমর গীতরচয়িতা, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, যন্ত্রী ও যন্ত্রানুষঙ্গ পরিচালনাকারী বা সঙ্গীত পরিচালকের হাতে বাংলা আধুনিক গান পরিপুষ্ট হয়েছিল গুণে ও গৌরবে। গানে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিল তাঁদের সম্মিলিত প্রয়াস। বাংলা গানের সেই স্বর্ণযুগেরই সফল গীতিকার পবিত্র মিত্র। অগণিত কালজয়ী ও শ্রুতিসুখকর গান আমাদের মাঝে রেখে ১৯৭৪ মতান্তরে ১৯৭৫ সালের দিকে পাড়ি জমিয়েছেন অনন্তলোকে। তাঁর মৃত্যুর বছরটি সঠিকভাবে জানা যায়নি।

গীতিকার পবিত্র মিত্রের লেখা কিছু আধুনিক বাংলা গান

যেদিন রবো না আমি দিন হলে অবসান

এ জীবনে যদি আর কোনোদিন দেখা হয় দুজনার

সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যায়

তোমার ভুবন হতে

আমার এ গানে স্বপ্ন যদি আনে

সেদিন বুঝিতে আমি পারিনি

ভুলে গেছি কবে এই পথে যেতে

তুমি ফিরায়ে দিয়েছো বলে

মরমিয়া তুমি চলে গেলে

এত আলো আর এত হাসি গান

ভালোবাস তুমি শুনেছি অনেকবার

হয়তো সেদিন আগের মতো

এই মন সেই গান গেয়ে যায়

কী ভেবে আজ

এই পথে যায় চলে

তুমি আর আমি শুধু জীবনের খেলাঘর

রাতের আকাশ তারায় রয়েছে ঘিরে

তরীখানি ভাসিয়ে দিলাম ঐ কূলে

এই আঁধারে আমি চলে গেলে

কেন ডাকো তুমি মোরে

আমি তো তোমারই কাছে রয়েছি

আকাশ প্রদীপ জ্বলে

কত নিশি গেছে নিদহারা ওগো

যে মালা শুকায় যে খেলা ফুরায়

স্মৃতি তুমি বেদনার

গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান (১৯৩১-১৯৯৯)

জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই

পাছে ভালোবেসে ফেল তাই

দূরে দূরে রই।

যাঁদের লেখা গান শুনে কোটি শ্রোতার বাংলা আধুনিক গান ও ছায়াছবির গানের প্রতি মমতা তৈরি হয়েছে, প্রাণে গানের নিমিত্তে দরদ তৈরী হয়েছে, গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। জন্ম ১৯৩১ সালের ২ মে কলকাতার হাওড়ায়। পিতার নাম কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি নির্বাক যুগের চিত্রনায়ক ছিলেন। তিনি কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র ছিলেন। এই কলেজ থেকেই স্নাতক সম্পন্ন করেন তিনি। ১৯৬০ ও ৭০ এর দশকে পুলক বাবুর জীবনের গান রচনার সফল সময়। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ছাত্র ছিলেন এবং প্রখ্যাত গীতিকার ও সুরকার হীরেন বসুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তিনি। ব্যথা-বেদনা, আবেগ-অনুভূতি কিংবা আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সূক্ষ্মতম বাহন হলো গান। কথা এবং সুর মিলে যে গান হয় সে গানের গীতরচয়িতা ও সুরকারকে ভুলে যায় সবাই, গায়ককে মনে রাখলেও। অথচ কী অসীম মমতায় কথার উপর কথা সাজিয়ে গানকে অমর করে তোলেন গীতিকাররা।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা গানের একজন জনপ্রিয় ও অবিস্মরণীয় স্রষ্টা। উল্লেখযোগ্য বহু বাংলা চলচ্চিত্র তাঁর গানে সমৃদ্ধ হয়েছে। ভারতবর্ষের খ্যাতনামা প্রায় সকল শিল্পীর কণ্ঠে তাঁর লেখা গান পরিবেশিত হয়েছে। স্মৃতিরেখা বিশ্বাস ও সন্ধ্যারানী অভিনীত ১৯৪৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র 'অভিমান' এ প্রথম গান লেখা শুরু। সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন বম্বে টকিজের বিখ্যাত আর.সি পাল (রামচন্দ্র পাল)। গান লেখার জগতে আসার পূর্বে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা উপন্যাস লিখতেন। জীবনের প্রথম লেখা সম্পর্কে- তাঁর 'কথায় কথায় রাত হয়ে যায়' গ্রন্থের স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন- "আমি যখন স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়তাম তখন থেকেই কবিতা লেখার চর্চা শুরু করেছিলাম। সেগুলো আদৌ কবিতা হচ্ছে কিনা সেই বোধ তখনও আমার আসেনি। তবু লিখতাম। বিশেষকরে ছোটদের কবিতা। ক্লাস ফাইভে কিংবা সিক্সে পড়ার সময়ে আমার লেখা একটি কবিতা আমি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আনন্দবাজারের আনন্দমেলায়। সেটি প্রকাশিত হয়। সেই দিনটি আমার কাছে চিরস্মরণীয়। পাঁচটি

আনন্দবাজার কিনে ফেলেছিলাম। তখন জেরক্স ছিল না, তাই বন্ধু-বান্ধবদের ওই কাগজগুলি দেখিয়ে ছিলাম। শুধু তাই নয় কিছুদিন পরে মানি অর্ডারে পেলাম পাঁচ-পাঁচটি টাকা। তখন আর আমায় পায় কে? আনন্দের আতিশয্যে সদ্যকেনা নতুন জুতোটা পরে সারাবাড়ি মসমস করে বারকতক ঘুরে বেরিয়ে ছিলাম। আজ পর্যন্ত জীবনে গান লেখার সুবাদে অনেক টাকাই হয়তো রোজগার করেছি। কিন্তু ওই পাঁচটি টাকা আজও আমার কাছে মহার্ঘ হয়ে আছে।"[২৩]

ছোটবেলায় কবিতা লিখলেও ক্লাস নাইন থেকে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় গান লেখা শুরু করেন। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাইবাবু বিশিষ্ট চলচ্চিত্র প্রযোজক সরোজ মুখার্জিকে তিনি নিজের লেখা গান দেখাতেন প্রায়ই এবং উৎসাহ পেতেন সরোজ বাবুর কাছ থেকে। এভাবে একদিন চলচ্চিত্রের গান রচনার জন্য কিছু সিচুয়েশন দিয়েছিলেন প্রযোজক সরোজ বাবু। গান লিখে ডাকযোগে বম্বে টকিজের বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক আর.সি পালের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন পুলক বাবু। ছবির কাজে কলকাতায় এসে নতুন গীতিকারকে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন মি.পাল। এত ছোট মানুষ গান লিখতে পারে না বলে অন্য মানুষের গান নিজের নামে চালাচ্ছে এমন একটি ধারণা সঙ্গীত পরিচালকের। পরে নিজের সামনে গান লেখার পরীক্ষা নিলেন আর.সি পাল এবং সম্মানের সাথে গান লেখার সে কাজটি করে দেখালেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর শুধুই নতুন নতুন গানের ইতিহাস আরম্ভ। ১৯৫৭ সালে এইচ.এম.ভি থেকে প্রকাশিত হয় তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যৌথ প্রয়াসে একটি গান– 'তোমার দু'চোখে আমার স্বপ্ন আঁকা' এ গানের কথা লিখেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুর করেছেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কণ্ঠ দিয়েছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ আলোড়ন তুলেছিল এ গান। চলচ্চিত্রের গান রচনায় তাঁর অবদান অতুলনীয়।

১৯৬৬ সালে মুক্তি পায় 'শঙ্খবেলা' ছায়াছবি। এ ছবিতে লতা মঙ্গেশকার ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত গান 'কে প্রথম কাছে এসেছি' এখনও শ্রোতাদের মন ভালো করে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি বুঝে গান লিখে দেবার ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা ও প্রতিভা ছিল পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সামান্য কথার কথাকেও গানে রূপ দিয়ে ফেলতে পারতেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সাথে পূজোর গান দেখানোর জন্য গানের খাতা সঙ্গে নিয়ে, একবার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করতে এলেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাড়িতে। ওই সময় পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় বাইরের ঘরে বসে ছিলেন এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছিলেন স্নানের ঘরে। ভেজা গায়ে হঠাৎ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এসে বললেন- 'পুলক কতদিন পরে এলে একটু বসো'। এ কথা বলার পর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ভেতরে চলে গেলেন কিন্তু পুলক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথায় সে লাইন দুটি বারবার ঘুরপাক খাচ্ছিল কেবল। কাগজ-কলম টেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেললেন বাঙালির চিরচেনা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে ও কণ্ঠে গাওয়া সেই বিখ্যাত গান:

'কতদিন পরে এলে একটু বসো
তোমায় অনেক কথা বলার ছিল যদি শোনো'।

রাহুল দেব বর্মনের সুরে প্রথম লতা মঙ্গেশকারের আধুনিক বাংলা গান- 'আমার মালতী লতা'। এ গানেরও কথা লিখেছিলেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। গানটির কথা ছিল এমন:

'আমার মালতী লতা
ওগো কী আবেশে দোলে
আমি সে কথা জানি না
আমায় কে গো দেবে বলে'।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় আগে থেকেই জানতেন গানটি গাইবেন লতা মঙ্গেশকর। তাই লতা শব্দটি মাথায় রেখেই গান তৈরি করেছিলেন এমন করে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মান্না দের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক ছিল জীবনের শেষবেলা পর্যন্ত। একে অপরের মুড বুঝতে পারতেন, ভাবনা বুঝতে পারতেন। আর এ কারনেই মনে হত যে নিজের সেরা গানগুলি সবসময় পুলক বাবু মান্না দে'র জন্যই মনে ভেবে লিখতেন আর রেখে দিতেন অনেক যত্ন করে।

গীতিকার হিসেবে এবং মানুষ হিসেবে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিশাল বড় মনের ব্যক্তিত্ব। নতুন শিল্পীদের পাশে এসে দাঁড়ানোর অভ্যাস পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু আগে থেকে।

একবার এ্যালবামের জন্য হৈমন্তী শুক্লার কোনো গানই তৈরি হয়নি। এমন এক পরিস্থিতিতে, পুলকবাবু মান্নাদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন হৈমন্তী শুক্লাকে। বেশ মন খারাপ করে হৈমন্তী শুক্লা তাঁর এই হতাশার কথাটি জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে মান্নাদের সুর করা এবং পুলকবাবুর লেখা গান দুটি হৈমন্তী শুক্লাকে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন পুলকবাবু। যে গানটি রেকর্ডে গাওয়ার কথাই ছিল মান্নাদের। পুলকবাবুর কথা শুনে মান্না দে আর আপত্তি করলেন না। রাজি হয়ে গেলেন। গান দুটির মধ্যে একটি গান হলো হৈমন্তী শুক্লার সুপারহিট গানের মধ্যে অন্যতম। সেই গান–

আমার বলার কিছু ছিল না
চেয়ে চেয়ে দেখলাম তুমি চলে গেলে।

বহু বাঙালি শিল্পীকে বাংলা ভাষায় প্রথম গান গাওয়ানোর কৃতিত্বের দাবিদার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা গানের খ্যাতিমান অনেক শিল্পী বাংলায় প্রথম আধুনিক গান গেয়েছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কথামালায়। যেমন- লতা মঙ্গেশকার, সুমন কল্যাণপুর, ঊষা মঙ্গেশকার, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, উদিত নারায়ণ, আলকা ইয়াগনিক প্রমুখ। মনের অনুভূতিকে ভাষায় রূপ দিত বলেই, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান আজও বিপুল জনপ্রিয় ও গৌরবে সমুন্নত। বাংলা গান যতদিন থাকবে, গানে গানে অমর হয়ে থাকবেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূপেন হাজারিকা একবার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি অসমিয়া গান শুনিয়ে ছিলেন- 'ভাঙ ভাঙ ভাঙ ঘটা ভাঙ'। এর উপরই শ্যামল মিত্রের জন্য পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় গান লিখে ফেললেন:

চৈতালী চাঁদ যাক যাক ডুবে যাক
গহন আঁধারে রাত থাক থাক ভরে থাক।

এমন আরও একটি গান ভুপেন হাজারিকার কণ্ঠে প্রায়ই শুনতেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়– 'পরহু পুয়াতে তুলো না'। গানটি শুনে পুলকবাবুর মনে হয়েছিল, এমন একটি সুরের উপর গান সে লিখতে পারবে, যে গান লতাজির কণ্ঠে গাইলে দুর্দান্ত হবে। ভূপেন হাজারিকার সঙ্গে একদিন তিনি 'চাংওয়া' নামক একটি হোটেলের কেবিনে ছিলেন। সেখানে খাবারের বিলের কাগজের উপরেই গান লিখে ফেললেন:

রঙ্গিলা বাঁশিতে কে ডাকে
ঘুম ঘুম নিঝুম রাতের মায়ায়।

লতা মঙ্গেশকরের পূজোর প্রথম বাংলা গানের রেকর্ড এই গানটি। এমন আরো ঘটনা অনেক আছে যা শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান লেখার ইতিহাসকে স্মৃতিময়, গীতিময় করে রেখেছে আজও। কলকাতার পুরনো সিনেমা হলের পাশে শম্ভুবাবুর বাড়িতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে একদিন খুব নিরিবিলিতে পেয়ে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় অনুযোগের সুরে জানালেন যে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর একটিও ননফিল্মী গান করেননি, যেখানে লতাজি পর্যন্ত গেয়েছেন। কথা শুনে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গান দেখতে চাইলেন, জামার পকেট থেকে মি.বন্দ্যোপাধ্যায় দু'চারটে গান বের করলেন। এমন একটি গান পড়লেন-

ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না
ও বাতাস আঁখি মেলো না
আমার প্রিয়া লজ্জা পেতে পারে
আহা কাছে এসেও ফিরে যেতে পারে।

গানটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। গানের সাথে আরেকটা গান যোগ করে কিছুদিন পরে রেকর্ড বের হয়েছিল। অন্য গানটি ছিল:

কত রাগিণীর ভুল ভাঙাতে

বাঁশি ভরে গেছে আঘাতে।

বাংলা গানের ভুবনে বহু শিল্পী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে। কবিতা কৃষ্ণমূর্তির জীবনের প্রথম এইচ.এম.ভি থেকে রেকর্ড এবং সেখানে চারটি বাংলা গান পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। যেমন:

পলাশের দেশে একা একা এসে।

বিখ্যাত শিল্পী সুমন কল্যাণপুরের প্রথম বাংলা গান পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা কথায়:

'দুরাশার বালুচরে একা একা এবং মনে কর আমি নেই বসন্ত এসে গেছে'। লতা মঙ্গেশকারের ভগিনী ঊষা মঙ্গেশকারের প্রথম বাংলা গান পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা এবং দক্ষিণা মোহন ঠাকুরের সুর করা:

'আমায় বাহারি সেই ঝুমকো এনে দেরে এবং বুঝি না এ ভালোবাসায়।'

ভূপেন হাজারিকার সঙ্গে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক স্মৃতি জড়িত। এমনও হয়েছে যে মাত্র ৫ মিনিটের মধ্যে ভূপেন হাজারিকা, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত গান লিখে দিয়ে ছিলেন–

তোমায় কেন লাগছে এত চেনা

এত আপন ভাবছি কেন তোমায়

বলতে পারো প্রথম দেখা কোথায়।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা লতা মঙ্গেশকারের গাওয়া প্রথম বাংলা গান– রঙ্গিলা বাঁশিতে কে ডাকে গান নিয়ে রেকর্ডিংয়ে একটু সমস্যা হয়েছে। এ গানের মধ্যে চাঁদ শব্দটি উচ্চারণ করা নিয়ে লতা মঙ্গেশকারের রেকর্ডিংয়ের সময় অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল বারবার। চান্দ বলছিলেন তিনি। মূলকথা হলো চন্দ্রবিন্দু যুক্ত শব্দ অবাঙালি শিল্পীদের উচ্চারণ ঠিকমতো হয় না। বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্রের প্রতি লতা মঙ্গেশকারের শ্রদ্ধা ছিল ব্যতিক্রমী। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন হিন্দিতে কিছু একটা বলতে গিয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকারকে, লতাজি কথা থামিয়ে দিয়ে পুলকবাবুকে বাংলায় বলার অনুরোধ করলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে– তিনি বাড়িতে মাস্টার মশাই রেখে বাংলা শিখছেন। রবিঠাকুরের গান তাঁর খুবই প্রিয়। মারাঠি ভাষায় অনুবাদকৃত শরৎচন্দ্রের সকল বই লতাজি পড়ে ফেলেছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়ককে নায়িকার হাতপাখা নেড়ে ভাত

খাওয়ানোর গল্প লতাজিকে ভীষণ আনন্দানুভূতি দিয়েছিল যা, পাগল করে দেয়ার মতো ছিল বলে জানিয়েছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে মাদ্রাজে এক শ্রোতার পরিচয় হয়েছিল তাঁর নাম ভি.এ.কে রঙ্গারাও। তাঁর মাতৃভাষা তেলেগু। হোটেল থেকে একদিন জোর করে তাঁর বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে পুলকবাবুকে বসার ঘরে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর প্রথম লেখা গান কোন সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং গানটি কী? পুলকবাবু যথারীতি উত্তর দেন– ১৯৩৯ সালে 'অভিমান' ছবির গান। রঙ্গারাও ঘরের ভেতরে গিয়ে সেই গানের ডিস্ক হাতে নিয়ে এলেন এবং রেকর্ড কভারে অটোগ্রাফ নিলেন। সাথে সাথে এও জানালেন যে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সকল গানের এল পি তাঁর কাছে রয়েছে। সুদূর মাদ্রাজে একজন তেলেগু ভাষীর সংগ্রহশালায় নিজের লেখা গান দেখে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন সত্যিই অভিভূত হয়েছিলেন।

বলতে গেলে কিশোর বয়সে রেডিও থেকে গীতিকার হওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সে সময় রেডিওতে কোনো শিল্পী যখনই পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কোনো গান গাইতেন প্রতি গানের জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে 'চারআনা' করে পেতেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় সবথেকে বেশি টাইম নিয়ে যে সুপারহিট ছবির জন্য গান লিখেছিলেন ছবির নাম– 'শঙ্খবেলা' এবং গানটি ছিল:

'আমি আগন্তুক আমি বার্তা দিলাম।'

সুধীন দাশগুপ্তের সুরে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা আরেক সুপারহিট বাংলা গান হলো:

কে প্রথম চেয়ে দেখেছি
কে প্রথম কাছে এসেছি
কিছুতেই পাই না ভেবে
কে প্রথম ভালোবেসেছি তুমি না আমি।

প্রসিদ্ধ গায়ক এবং নায়ক অমর শিল্পী কিশোর কুমারের মৃত্যুসংবাদ শুনে দীর্ঘ পরিচিত মি.বন্দ্যোপাধ্যায় খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। কিশোর কুমারের মৃত্যুর পরে শবযাত্রায় তাঁর বিদায়বেলায় পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের লেখা, কিশোর কুমারেরই গাওয়া–তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে আমার মরণ যাত্রা যেদিন যাবে এ গানটি বহুবার বাজিয়ে শুনেছিলেন এবং কেঁদেছিলেন। নিজেকে বারবার মনে মনে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন এই ভেবে যে, এমন গান তিনি কেন লিখে দিলেন কিশোর কুমারকে, যা নিয়ে তাঁর আজ কিশোরদার বিদায়বেলায় এমন চোখের জলে ভাসতে হবে তাঁর। গানের মধ্যে মরণ যাত্রা কথাটি যতবার ঘুরে ঘুরে আসছিল, ততবারই বুক ভেঙে

কান্নায় ভেসেছেন শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। বারবার মনে হচ্ছিল–এই গান আমি কেন লিখে দিলাম কিশোরদাকে। রাত গভীর হলো কিন্তু গান শোনা বন্ধ হলো না বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একসময় রাত ভোর হয়ে গেল। একই ঘরে তাঁর স্ত্রী পাশে জেগেছিলো সারারাত। স্ত্রীর অনুরোধে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় কিশোর কুমারকে লিখে দেওয়া 'তুমি কত সুন্দর' সিনেমার গান– জানি যেখানেই থাকো এখনো তুমি যে মোর গান ভালবাসো– এই গানটিও বাজালেন সেদিন। সকাল হলো। অবশেষে ভোরের আলো শোক সহ্য করার দিলো হারানোর শোকে ব্যথিত পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

বিখ্যাত শিল্পী হৈমন্তী শুক্লার প্রথম বাংলা গান পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় রেকর্ড হয়েছিল এবং রেকর্ড কোম্পানিকে রাজি করানোর ক্ষেত্রেও পুলকবাবুর অবদান ছিলো অপরিসীম। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন সুরকার শৈলেন মুখোপাধ্যায়। তাঁর বাড়ির ড্রইংরুমে একদিন বসা অবস্থায় একটি কমবয়সী মেয়ে এসে উপস্থিত হলো। পুলকবাবু এবং শৈলেনবাবু গানের কাজে বসবেন বলে মেয়েটিকে দেখেই শৈলেন মুখোপাধ্যায় চলে যেতে বললেন ঐদিন। মেয়েটিও স্বভাবসুলভভাবে সেই আদেশ মেনে নিয়ে হাসিমুখে প্রণাম করে চলে যেতে লাগল। সেই সময় পুলকবাবু মেয়েটির নাম জিজ্ঞেস করতেই নাম বলল– হৈমন্তী শুক্লা। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে মেয়েটিকে ফিরিয়ে না দিয়ে, শৈলেন মুখোপাধ্যায় তাকে গান শেখাতে বসে গেলেন। সেই ছোট্ট মেয়েটির গলার সূক্ষ্ম সুরের মোচড়ে, কণ্ঠের মাধুর্যে মুগ্ধ হলেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। হৈমন্তী শুক্লার রক্তে ছিল রাগাশ্রয়ী গান। কারণ সে ছিল বিখ্যাত রাগসঙ্গীতশিল্পী হরিহর শুক্লার মেয়ে। শৈলেনবাবুকে পুলকবাবু অনুরোধ করলেন এইচ.এম.ভি থেকে হৈমন্তী শুক্লার রেকর্ড বের করানোর জন্য। কিন্তু সেবার পূজোয় আর কোনো গান বের করবে না এইচ.এম.ভি এমন সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের। মনের মধ্যে জেদ তৈরি হয়ে গেল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। হিন্দুস্তান রেকর্ডের অফিসে নিজে চলে গেলেন শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। হিন্দুস্তান রেকর্ডের অধিকর্তা যামিনী মতিলালের সঙ্গে হৈমন্তী শুক্লার কণ্ঠে একটি নতুন গান রেকর্ড করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর বিশ্বাস রেখে গানের অনুমতি দিলেন যামিনী মতিলাল। শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের সুরে এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় হৈমন্তী শুক্লার প্রথম রেকর্ডকৃত গান যেটা মান্না দে'র ভাষায় ছিল কান্নাকাটির গান:

এতো কান্না নয় আমার
এ যে চোখের জলের মুক্তাহার
আমার পড়তে ভালো লাগে
বঁধু তোমারই পথ চেয়ে।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই গানটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করল আর বাংলা গানে এসে গেল আরেকজন প্রকৃত শিল্পী যাঁর নাম হৈমন্তী শুক্লা। এর পরে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে আর পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কথায় হৈমন্তী শুক্লার জীবনের প্রথম প্লেব্যাক:

শিব ঠাকুরের গলায় দোলে
বৈঁচি ফুলের মালিকা।

এরপর একবার মান্না দে তাঁর নিজের গাওয়ার জন্য একটি গান সুর করে রেখেছিলেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা। কিন্তু পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ই হৈমন্তী শুক্লাকে বললেন মান্নাদার বাসায় যেতে। মান্না দে তাঁর জন্য তৈরি করা সেই গানটির ট্রেনিং করে গলায় তুলে দিলেন হৈমন্তী শুক্লাকে এবং তিনি গানটি গেয়ে বিশাল বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। অবাক করা বিষয় হলো সেই একটি গানের পারিশ্রমিক দিয়ে হৈমন্তী শুক্লা কলকাতার গল্ফগ্রীনের ফ্লাট ও গাড়ি কিনে ফেলেছিলেন। এই বিখ্যাত গানটি হলো:

আমার বলার কিছু ছিল না
চেয়ে চেয়ে দেখলাম তুমি চলে গেলে।

এরপর হৈমন্তী শুক্লাকে দিয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বানালেন আরেকটি বিখ্যাত পূজোর গান, সেটিরও কথার কারিগর পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়:

ওগো বৃষ্টি আমার চোখের পাতা ছুঁয়ো না,
আমার এত সাধের কাঁন্নার দাগ ধুয়ো না
সে যেন এসে দেখে পথ চেয়ে তার
কেমন করে কেঁদেছি।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে লেখা, মান্নাদের করা অসামান্য সুরে, মান্নাদেরই গাওয়া গান একবার পূজোতে বেরিয়ে ছিল:

জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই
পাছে ভালোবেসে ফেল তাই দূরে দূরে রই। এবং আরেকটি গান ছিল
আমার যদি না থাকে সুর তুমি তা দেবে।

কিশোর কুমারের কণ্ঠে গাওয়া পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা আর অজয় দাশের সুরে 'প্রতিশোধ' চলচ্চিত্রের গান:

আজ মিলন তিথির পূর্ণিমা চাঁদ মোছায় অন্ধকার

এবং 'জীবন-মরণ' চলচ্চিত্রের গান:

ওপারে থাকবো আমি তুমি রইবে এপারে।

'তারাশঙ্কর' চলচ্চিত্রে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় এবং মান্না দের সুরে ও কণ্ঠে গাওয়া:

বেহাগ যদি না হয় রাজি

বসন্ত যদি না আসে

এই আসরে ইমন তুমি

থাকো বন্ধু আমার কাছে।

একদিন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে অনুযোগের সুরে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুরের শান্তবাবুর বাড়িতে বলেই ফেললেন এবার যেন তাঁর দুটো গান পূজোর রেকর্ডে তিনি গান গেয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। পকেট থেকে চার/পাঁচটা গান বের করে দেখালেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় হেমন্ত বাবুকে। সেসব গানের মধ্যে:

ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না

ও বাতাস আঁখি মেলো না

আমার প্রিয়া লজ্জা পেতে পারে। এ গানটি এবং অন্য গানটি:

কত রাগিণীর ভুল ভাঙাতে

বাঁশি ভরে গেছে আঘাতে।

লতাজির গাওয়া একটি গান, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়:

ঐ গাছের পাতায় রোদের ঝিকিমিকি

আমায় চমকে দাও চমকে দাও।

নিজের পছন্দের গান রচনা প্রসঙ্গে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখা 'কথায় কথায় রাত হয়ে যায়' গ্রন্থে লিখেছেন এভাবে: "সেবার ইভনিং ফ্লাইটে মুম্বই যাচ্ছি। সেদিন ঝলমলে পূর্ণ চাঁদের রাত। জানালা দিয়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছি। এমন সময় এক অপরূপ তন্বী তরুণী বিমান সেবিকা আমার খাবার নিয়ে এলেন। মেয়েটিকে দেখলাম আর সদ্যওঠা চাঁদটাকে দেখলাম। খাবারের ন্যাপকিনেই লিখেছিলাম–

ও চাঁদ সামলে রাখো জোছনাকে/ কারো নজর লাগতে পারে।

আর একবার মান্নাদার সঙ্গে বৌদির হঠাৎ একটু মান-অভিমানের পালা শুরু হয়। তারপর কাজী নজরুলের গানের আদলে বউ মান করেছে চলে গেছে / বাপের বাড়ি / আড়ি / আড়ি / আড়ি / হয়ে গেল দুজনের।

আজীবন 'সিঙ্গেল ওম্যান ম্যান' মান্নাদা স্ত্রী ছাড়া অন্যকোন মেয়ের দিকে আড় চোখেও তাকাননি কোনও দিন। যেই ওদিক থেকে ঝড়ের একটু পূর্বাভাস পেয়েছেন–অমনি সে বয়সে ছোট হলেও তাকে দিদি' বলে সম্বোধন করতে শুরু করে দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই উনি বৌদির বিরহে জগৎকে অন্ধকার দেখলেন। লিখে ফেললাম সেই ঘটনায়– তুমি অনেক যত্ন করে / আমায় দুঃখ দিতে চেয়েছো / দিতে পার নি।

শুনেছি কবিরা নাকি ক্রান্তদর্শী হন। আমি ওঁদের জীবনে এমন ঘটনা ঘটবে, এই বিরহের অন্ধকার ফুরিয়ে যাবে, সোনালি সুখের দিন আসবে হয়তো আগেই ক্রান্তদর্শনে বুঝেছিলাম। তাই লিখেছিলাম– সেই তো আবার কাছে এলে / এতদিন দূরে থেকে বলোনা কি সুখ তুমি পেলে।

আর একবার আমরা দুজন আসছি বিহারের সিন্ধ্রি থেকে। ধানবাদে আমার এক আত্মীয় (শ্যালিকা-পতি) তখন কয়লা খনির ম্যানেজার। ওঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হলো। মান্নাদা বললেন– আপনার আত্মীয় যখন নিশ্চয়ই আমার ওখানে যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু এবারই আপনার কাছ থেকে পূজোর গান নিয়ে আমি বম্বে যাব। ভাবুন। গান ভাবুন। যাই হোক, ধানবাদে ওই বাড়ির দরজায় এসে আমরা দাঁড়ালাম। মান্নাদা গাড়িতে রইলেন। ফটকের কাছের 'কলিং বেলটা' আমি বাজালাম। একটি সদ্যস্নাত তরুণী বেরিয়ে এসে বলল– আপনি বাড়ি ভুল করেছেন। মুখার্জি সাহেবের বাংলো ওইটা। মেয়েটি কমলকলি আঙুলের তর্জনীটি তুলে বাড়িটি দেখাল! ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে এসেই বলেছিলাম, মান্নাদা আপনার পূজোর গান লিখে ফেলেছি, শুনুন। 'ও কেন এত সুন্দরী হলো / অমনি করে ফিরে তাকালো / দেখেতো আমি মুগ্ধ হবোই / আমি তো মানুষ!' একটা পার্টিতে হঠাৎ দেখলাম মেঝেতে পড়ে আছে একটা জড়োয়ার ঝুমকো। কুড়িয়ে নিয়ে বললাম- মেয়েরা সবাই কানে হাত দিন। কার ঝুমকো খুলে পড়ে গেছে। এক সুন্দরী কানে হাত দিয়ে এগিয়ে এসে চাইলেন। দিয়ে দিলাম। মনে মনে তখনি লিখলাম– 'জড়োয়ার ঝুমকো থেকে একটা মতি খসে পড়েছে।'

মান্নাদার গানে আছে এমন ধারা অজস্র ঘটনা। সবাই বললেন অনেককে নিয়ে তো গান লিখলেন। এবার লিখুন নিজের সহধর্মিনীকে নিয়ে। তাও লিখেছিলাম। 'এ নদী এমন নদী/ জল চাই একটু যদি / দু হাত ভরে উষ্ণ বালুই দেয় আমাকে' মান্নাদা সে গানটাও সুপারহিট করে দিলেন। ...'সারাজীবনের গান' অ্যালবামের মৃত্যু বিষয়ক গানটি– আমায় চিনতে কেন পারছো না মা / সবই গেলে ভুলে? শুনে আমার মা আমাকে বলেছিলেন, আমি বেঁচে থাকতে এ গান কেন তুই লিখলি? আমায় মিথ্যে বলতে হয়েছে, বিষয়টা মান্নাদা দিয়েছেন আমি শুধু লিখে গেছি। মান্নাদেও ওঁর মায়ের একই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, পুলকবাবু লিখে দিয়েছেন- আমি গেয়েছি মাত্র।"[২৪] পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের লেখা গান–

যখন এমন হয়

জীবনটা মনে হয় ব্যর্থ আবর্জনা

ভাবি গঙ্গায় ঝাঁপ দিই রেলের লাইনে মাথা রাখি

কে যেন হঠাৎ বলে আয় কোলে আয়

আমি তো আছি ভুললি তা কি

মাগো সে কি তুমি।

এ গানের পথ অনুসরণেই এ জগত সংসারে জীবনবেলার ইতি টানলেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৯৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর হুগলীর ধারে গঙ্গা নদীতে লঞ্চ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন।

পুলক বন্দ্রোপাধ্যায়ের লেখা বিখ্যাত কিছু আধুনিক গানঃ

জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই

কতদিন পরে এলে একটু বসো

আমার মালতী লতা আমার বলার কিছু ছিল না

চৈতালী চাঁদ যাক যাক ডুবে যাক

রঙ্গিলা বাঁশিতে কে ডাকে

ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না

কত রাগিণীর ভুল ভাঙাতে

দুরাশার বালুচরে একা একা

মনে করো আমি নেই বসন্ত এসে গেছে

আমায় বাহারি সেই ঝুমকো এনে দেরে

তোমায় কেন লাগছে এত চেনা

আমি আগন্তুক আমি বার্তা দিলাম

কে প্রথম চেয়ে দেখেছি

তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে

জানি যেখানেই থাকো

এতো কান্না নয়

আমার শিবঠাকুরের গলায় দোলে

ওগো বৃষ্টি আমার চোখের পাতা ছুঁয়ো না

আজ মিলনতিথির পূর্ণিমা চাঁদ

ওপারে থাকবো আমি তুমি রইবে এপারে

বেহাগ যদি না হয় রাজি

ঐ গাছের পাতায় রোদের ঝিকিমিকি
ও চাঁদ সামলে রাখো জোছনাকে

তুমি অনেক যত্ন করে

সেইতো আবার কাছে এলে

ও কেন এত সুন্দরী হলো

জড়োয়ার ঝুমকো থেকে একটা মতি

এ নদী এমন নদী জল চাই একটু যদি

তুমি অনেক যত্ন করে

তুমি নিজের মুখেই বললে যেদিন

হৃদয়ের গান শিখে তো গায় গো সবাই

জ্বালাও আকাশ প্রদীপ

না না যেও না ও শেষ পাতা গো

চলিতে চলিতে পথে তোমায় দেখে

ও দয়াল বিচার করো

তোমার ভুবনে ফুলের মেলা

আমি ফুল না হয়ে কাঁটা হয়েই

কথা দাও আবার আসবে

কেন নয়নে আবির ছড়ালে

বড় ময়লা জমেছে মনে

যাবার আগে কিছু বলে গেলে না

শুধু একবার বলে যাও তুমি চলে যাও

আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে সারারাত জেগে জেগে

আজ আবার সেই পথে দেখা হয়ে গেল

আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব

আবার দুজনে দেখা যমুনার কিনারে

আমার কবার মরণ হবে বলো

আমার ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে

আমার মাধবীলতা ওগো কী আবেশে দোলে

আমি তফাৎ বুঝি না

আমি তোমারে ভালোবেসেছি চিরসাথী হয়ে এসেছি

আমি বলি তোমায় দূরে থাকো

আমি মিস ক্যালকাটা চাই না দিতে টিপস

আমি সারারাত শুধু যে কেঁদেছি

আয় খুকু আয়

এই তো সেদিন তুমি আমারে বোঝালে

এই রাত শেষ রাত হয়তো এ জীবনে

এক বৈশাখে দেখা হলো দুজনে

একি অপূর্ব প্রেম দিলে বিধাতা আমায়

এত বড় আকাশটাকে ভরলে জোছনায়

ও কোকিলা তোরে শুধাই রে

ওগো আবার নতুন করে ভুলে যাওয়া নাম ধরে

ক'ফোটা চোখের জল ফেলেছ যে তুমি

গান ফুরানো জলসাঘরে

তোমায় কিছুই বলিনি তো

ভোর হলো বিভাবরী

নিঝুম ও সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা

নদীর যেমন ঝর্ণা আছে

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়

যে সমাধিবেদিটার ঠিক উপরে

ললিতা গো ওকে আজ চলে যেতে বল না

সুন্দরী গো দোহাই দোহাই

সুরের আসর থেকে মন নিয়ে এসেছি গো

আমায় চিনতে কেন পারছ না মা সবই ভুলে গেলে

প্রখর দারুণ অতি দীর্ঘ দগ্ধদিন

কে তুমি তন্দ্রা হরিণী

কথায় কথায় যে রাত হয়ে যায়

আমি দু'চোখ ভরে ভুবন দেখি

আমায় একটু জায়গা দাও

যখন এমন হয় জীবনটা মনে হয়

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর কলকাতার মতো পূর্ববাংলাতেও আধুনিক গান রচনা শুরু হয় নবউদ্যমে। এ সময় আধুনিক গানের রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম– খান আতাউর রহমান, গাজী মাজহারুল আনোয়ার, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সিকান্দার আবু জাফর, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান, নজরুল ইসলাম বাবু, হুমায়ূন আহমেদ, কাওসার আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ। সুরকার হিসেবে যাঁরা অগ্রগণ্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম– সত্য সাহা, দেবু ভট্টাচার্য, আব্দুল আহাদ, সমর দাস, সুবল দাস, শেখ সাদী খান, খন্দকার নুরুল আলম, আবেদ হোসেন খান, আলম খাঁন, রাজা হোসেন খাঁন, আনোয়ার পারভেজ, আলী হোসেন, সুবল দাস, আজমল হোসেন, আজাদ রহমান, আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, ফজ-এ-খোদা, সুজেয় শ্যাম, অনুপ ভট্টাচার্য, আলাউদ্দিন আলী, অজমল হুদা মিঠু প্রমুখ। আধুনিক গান গেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন এমন শিল্পীদের মধ্যে– মাহমুদুন্নবী, ফেরদৌসী রহমান, বশির আহম্মেদ, ফরিদা ইয়াসমিন, আঞ্জুমান আরা বেগম, ফৌজিয়া ইয়াসমিন, নীলুফার ইয়াসমিন, শাহনাজ রহমতুল্লাহ, আব্দুল জব্বার, সাইফুল ইসলাম, রুণা লায়লা, মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, সাবিনা ইয়াসমিন, এন্ড্রু কিশোর, খুরশিদ আলম, সৈয়দ আব্দুল হাদী, শাম্মী আখতার, প্রবাল চৌধুরী, সুবীর নন্দী, নিয়াজ মোহাম্মদ চৌধুরী, মিতালী মুখার্জী, তপন চৌধুরী, শাকিলা জাফরের নাম উল্লেখযোগ্য। উপরোল্লেখিত এমন আলোকিত যুগের উজ্জ্বলতম সঙ্গীত রচনার ধারায় অনুকরণীয় গীতরচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম। আধুনিক বাংলা গান সৃষ্টির জন্য যাঁদের নাম ভুবনবিখ্যাত হয়েছে তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের জীবন ও গান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

অপরিপক্ক নিরীক্ষার নামে নিষ্প্রাণ বাচন, ভাবের দৈন্য দশা, সুরের অনুষ্ণতা, তালবাদ্যের বিষম চিৎকৃত বিন্যাস–আধুনিক গানের জনপ্রিয়তা স্খলনের জন্য সমপরিমাণ দায়ী। বাণীর বিশিষ্টতা কিংবা বক্তব্যের অকিঞ্চিৎকরতা, মধুবর্ষিত সুরকম্পন আধুনিক শিল্প ও সংস্কৃতির কাছে বাঙালির দৃঢ় প্রত্যাশা। বাণীর অবনতি, সুরের সুধাহীনতা, তালবাদ্যের অতিশয় ব্যবহারের জন্য বাণীর অবনতি বাঙালিকে ভাবায়। বাংলা গানে এমন অপেশাদারী ভাব প্রবেশের সাথে সাথে বহু সৃজনশীল সঙ্গীতকার তাঁদের আপন কর্ম থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন আত্মাভিমানে। বাঙালি শ্রোতার জনবোধ্যতা ও জনপ্রিয়তা তৈরি করা ছিল আধুনিক গানের মূল প্রবণতা। বাংলার মানুষের হৃদয় গীতিময় প্রেমের স্পন্দনে আকুল করে তুলেছিল কাজী নজরুল ইসলামসহ সমকালীন প্রখ্যাত গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীরা। কালান্তরে, আধুনিক গানের গুণগত পরিবর্তন অর্থাৎ গান রচনা ও যথার্থ সুর প্রয়োগের দুর্বলতা, শ্রোতার চিত্তের যথাযথ সন্তুষ্টি আনয়নে অক্ষম। তবে এসবের মাঝেও সুদিনের আশায় আবারও বুক বাঁধে বাঙালি শ্রোতা, কথায় ও সুরে শুধু ভালো গানের জন্য।

তথ্যনির্দেশ

১. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *নজরুল রচনাবলী-অষ্টম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২৮শে আগস্ট ২০০৮; পৃষ্ঠা ৫০

২. জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়, *তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি-দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯; পৃষ্ঠা ১৬০

৩. আসাদুল হক, *নজরুল সংগীতের রূপকার*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, জুলাই ১৯৯০; পৃষ্ঠা ২৩

৪. আসাদুল হক, *নজরুল সংগীতের রূপকার*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ২২

৫. করুণাময় গোস্বামী, *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬; পৃষ্ঠা ৬৪

৬. মোবারক হোসেন খান, *সংগীত সাধক অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩; পৃষ্ঠা ৩৯

৭. জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়, *তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি-দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯; পৃষ্ঠা ১৬২

৮. জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়, *তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি-দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ১৬১

৯. নজরুল ইন্সটিটিউট সংগৃহীত *আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের তালিকা*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৫; পৃষ্ঠা ৭

১০. সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭; পৃষ্ঠা ১০৮

১১. জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়, *তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি-প্রথম খণ্ড*, প্রতিভাস, কলকাতা, বইমেলা জানুয়ারি ২০০৪; পৃষ্ঠা ১২১, ১২২

১২. আবুল আহসান চৌধুরী, *বাঙালির কলের গান*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, নভেম্বর ২০১২; পৃষ্ঠা ২৯৪

১৩. আবুল আহসান চৌধুরী, *বাঙালির কলের গান*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ২৯৮

১৪. জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়, *তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি-দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯; পৃষ্ঠা ১০৭

১৫. জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়, *তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি-দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ১০৬

১৬. জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়, *তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি-দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ১০৪

১৭. আসাদুল হক, *নজরুল সংগীতের রূপকার*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, জুলাই ১৯৯০; পৃষ্ঠা ১৫৬

১৮. আসাদুল হক, *নজরুল সংগীতের রূপকার*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ১৫৫, ১৫৬

১৯. জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়, *তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি-দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯; পৃষ্ঠা ১০৯

২০. জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়, *তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি-দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ২৪৩

২১. জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়, *তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি-তৃতীয় খণ্ড*, প্রতিভাস, কলকাতা, বইমেলা জানুয়ারি ২০১৫; পৃষ্ঠা ৮৪

২২. জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়, *তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি- তৃতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ৮৫

২৩. পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, *কথায় কথায় রাত হয়ে যায়*, আনন্দ, কলকাতা, জুলাই ২০১২; পৃষ্ঠা ৭, ৮

২৪. পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, *কথায় কথায় রাত হয়ে যায়*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫।

পঞ্চম অধ্যায়

সমকালীন সুধীজনের স্মৃতিচারণে নজরুলের জীবন ও গানের মুল্যায়ন

দিলীপ কুমার রায়

নজরুলের জীবনে যাঁরা পরম আত্মীয় ছিলেন, সুবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপ কুমার রায় তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বাংলা গানের পঞ্চপ্রধান কবিদের মধ্যে অন্যতম দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুযোগ্য পুত্র ভারতীয় উপমহাদেশের উচ্চমানের গায়ক, সঙ্গীত রচয়িতা ও সুরকার দিলীপ কুমার রায়। নজরুলের সাথে দিলীপ রায়ের অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক বিরাজমান ছিল আজীবন। সাহিত্য ও সঙ্গীতের নানা শাখায় তাঁর গভীর পারদর্শিতা ছিল। নজরুলের গানের বিশিষ্ট ও প্রধানতম প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন দিলীপ কুমার রায়। বিশেষকরে কলকাতার রসজ্ঞ সমাজের কাছে নজরুলের গজল ও দেশাত্মবোধক গান সুমধুর গায়কীর মাধ্যমে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন তিনি। কলকাতার রবীন্দ্র সঙ্গীতকেন্দ্রিক শ্রোতাদের পরিমণ্ডলে তাঁর উদ্যোগেই প্রথম নজরুলের গানের প্রবেশ ঘটে। তাঁরই প্রিয় নজরুল প্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতিচারণ– "কাজী ছিল শুধু আমার প্রিয় বন্ধু নয়, প্রায় ছোট ভাইয়ের মতো অন্তরঙ্গ আত্মীয়। তার সঙ্গে যতই মিশেছি ততই তাকে আরো বেশি ভালোবেসেছি। এমন দিলদরিয়া, স্নেহশীল, বন্ধুবৎসল, সদাশয়, নিত্যানন্দ, প্রাণোচ্ছল মানুষ আমি বেশি দেখিনি- বিশেষ করে আমাদের দেশে যেখানে মানুষ অনেক সময়েই ঝিমিয়ে পড়ে যৌবন না পেরুতেই।"[১] কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে দিলীপ কুমার রায় অন্যত্র জানিয়েছেন– "কাজীকে চিরদিনই আমি স্নেহ করে এসেছি অনুজের মতন। সেও আমাকে বরাবর অগ্রজের মতনই মান দিতে ভালোবাসত। অতি সরল প্রশ্নহীন একমুখী ছিল সে ভালোবাসা। তার স্বভাবের গতিই যে ছিল একমুখী সরল। তার নানা গান আমি গাইতাম বলে সে পরমানন্দে তার 'বুলবুল' উৎসর্গ পত্রে আমাকে বরণ করে নিয়েছিল এই বলে–

আমার শুধু এ বাণী হে বন্ধু, আমার শুধু এ গান

তুমি তারে দিলে রূপভঙ্গিমা, তুমি তারে দিলে প্রাণ।...

সবার আগে মনে পড়ে তার দিলদরিয়া প্রাণের কথা। এমন প্রাণ নিয়ে খুব কম মানুষই জন্মায়। মজলিসি সভাসদ, হাসিগল্পের নায়ক, ভাবালু গায়ক, বলিষ্ঠ আবৃত্তিকার, বিশিষ্ট সুরকার, গুণীর গুণগ্রাহী, উদার সরল মানুষ, যে রেখে ঢেকে কথা কইতে জানত না, যখনই আমাদের সভায় আসত ছুটে, হেঁটে নয়- অট্টহাস্যে ঝাঁকড়া চুল দিয়ে এসে

জড়িয়ে ধরত দিলীপদা বলে- এমন মানুষ কটাই বা জীবনে দেখেছি ? ...তার সঙ্গে আমার একটি মস্ত মিল ছিল এইখানে যে, সে তার গানে সুরবিহারের স্বাধীনতা আমাকে সানন্দেই দিত যেমন দিতেন আমার পিতৃদেব ও অতুলপ্রসাদ। এ নিয়ে কবিগুরুর সঙ্গে আমার মতভেদে কাজী ও অতুলপ্রসাদ বরাবরই ছিলেন আমার দিকে। তাইতো বুলবুল- এর উৎসর্গে কাজী আমাকে লিখেছিল–

যে গান গেয়েছি একাকী নিশীথে কুসুমের কানে কানে

ওগো গুণী তুমি ছড়াইলে তারে সব বুকে সবখানে।...

সে গুণী ছিল তাই বুঝত যে মুক্তপক্ষ সুরকে স্বরলিপির কাঠামোয় বেঁধে রাখলে তার গগনবিহার ব্যাহত হয়ই হয়। আজ শুনি একদল অগায়ক ক্রিটিকের মুখে যে- এ স্বাধীনতা অক্ষমনীয়। কিন্তু অতুলপ্রসাদ ও কাজীর অনুমতি পাওয়ার পরে এসব রুক্ষ ক্রিটিকদের মাথা- নাড়া উপেক্ষা করা চলে। কাজী আমার মুখে তার গানের নানা সুরবিহারে বিশেষ উৎফুল্ল হয়েছিল যে তার 'বুলবুল' কাব্যগ্রন্থটির প্রথম ভাগ আমাকে উৎসর্গ করে।"[২]

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

নজরুলের ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু বিখ্যাত কথাশিল্পী ও চলচ্চিত্রকার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। রানীগঞ্জের শিয়ারসোল স্কুলে নজরুলের সাথে একসঙ্গে পড়াশুনা করার সময় গভীর বন্ধুত্ব ছিল দুজনের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষায় না দিয়ে, স্কুল পালিয়ে আসানসোল চলে যান নজরুল ও শৈলজানন্দ। ডাক্তারি পরীক্ষায় বাদ পড়ার কারণে নজরুলকে একাই যেতে হয়। 'কালি ও কলম' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘকাল। তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে'তে কবির সম্পর্কে লিখেছেন- "নজরুলের টাকা পয়সা থাকত তার বিছানার তলায়। টাকা পয়সা বলতে শিয়াড়সোল রাজবাড়ি থেকে পাওয়া মাসিক সাতটি টাকা। স্কুলে বেতন দিতে হত না, বোর্ডিং-এর খরচ দিতে হত না, সাতটি টাকা পেত সে নিজের খরচের জন্যে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! বিছানার তলাতেই থাকত, সেইখান থেকেই খরচ হতে হতে একদিন শেষ হয়ে যেত। সাত টাকার বেশিরভাগ নিত এই বিস্কুটওলা। তারপর চলত ধার। সে ধার শোধ করতাম হয় আমি নয় আমাদের আরেক সহপাঠী বন্ধু শৈলেন ঘোষ।... নজরুল যুদ্ধবিদ্যা শিখে এসে ভারতবর্ষে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করে দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াবে। তার এই গোপন মতলবের কথা আমাকে সে বলেছিল একদিন। আমার কিন্তু কোনও

মতলব ছিল না। আমি যেতে চেয়েছি সঙ্গসুখে। নজরুল চলে যাবে রানীগঞ্জ ছেড়ে আর আমি এইখানে একা পড়ে থাকব, রোজ দশটার সময় বই খাতা নিয়ে স্কুলে যাব, আর বিকেলে ফিরে আসব- একঘেয়ে নির্বান্ধব এই নিরানন্দ জীবন আমি চাইনি।... নজরুলের প্রথম চিঠির জবাব দিলাম। জবাবটি লিখতে আমার চারদিন লেগেছিল। চারদিন না বলে চাররাত্রি বলাই উচিত। কারণ দিনের বেলা নজরুলকে চিঠি লিখতে আমার ভাল লাগত না। নিশুতি রাত্রে সারা গ্রাম যখন ঘুমিয়ে পড়ত, অগুালের বাড়ির দোতলায় শিয়রের কাছে বড়ো জানালাটা খুলে দিয়ে লণ্ঠনের আলোয় শুয়ে শুয়ে চিঠি লিখতাম।"[৩]

সন্তোষ সেনগুপ্ত

বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সন্তোষ সেনগুপ্ত কাজী নজরুল ইসলামের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁর কর্মময় জীবনে। এইচ.এম.ভি ও কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানির প্রযোজক হিসেবে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন এই গুণী শিল্পী। তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, আধুনিক গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। তাঁর স্মৃতিচারণে নজরুলের গান প্রসঙ্গে বলেছেন: "কাজী নজরুল ইসলাম এমন একজন রচয়িতা যাঁর লেখা সত্যিই যুগ নিরপেক্ষ, যার লেখা গান সব যুগসীমার গণ্ডি সহজে অতিক্রম করে, একটা সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতা লাভ করেছে (একটি নতুন পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে)।... দমদমে HMV রেকর্ডিং স্টুডিওতে গান রেকর্ড করবার জন্য গিয়েছি। আমার আগে আর একজন শিল্পীর রেকর্ড হবে, তারপর আমার। ষ্টুডিওর প্রশস্ত ঘরে ঢুকে পিছনের দিকে একটি চেয়ারে বসলাম। প্রায়ান্ধকার ঘরে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি কাজী নজরুল ইসলামের পরিচালনায় জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী গান গাইছেন, গানটি হল 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা'। রেকর্ড করবার আগে প্রতিটি গান ৪/৫ বার ক'রে রিহার্শাল দেওয়া হয়। তখন, তাই হচ্ছিল। আমি পিছনে বসে আমার নিজের রেকর্ডের গান নিয়ে চিন্তামগ্ন রয়েছি। কতক্ষণ যে অন্যমনস্ক ছিলাম জানি না, হঠাৎ মনে হল সব কিছু যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। নিঃশব্দে কয়েক পা এগিয়ে এসে ওঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, দেখলাম, জ্ঞান গোস্বামী নজরুল ইসলামের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন, তাঁর ঠোঁট দুটি থর থর ক'রে কাঁপছে, কোনো কথা বার হচ্ছে না, দু চোখে জল, দৃষ্টি উদভ্রান্ত, কম্পমান দুটি হাত শূন্যে তুলে ধরেছেন, যেন অদৃশ্য কাউকে আবাহন করছেন। আর তাঁর সামনে বসে রয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁরও ঠোঁট দুটি কাঁপছে, রিমলেস চশমার তলা দিয়ে চোখের জলে তাঁর তসরের পাটভাঙা পাঞ্জাবী ভিজে যাচ্ছে। দুহাত

শূন্যে তুলে ধরেছেন। হঠাৎ মনে হল– শ্মশানে নয়–এদের মাঝখানেই যেন শ্যামা মুহূর্তের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। সর্বাঙ্গে একটা অপূর্ব শিহরণ একটা অশরীরী উপস্থিতি অনুভব করলাম।"[৪]

আব্বাসউদ্দীন আহমদ

অমর কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদ ছিলেন নজরুলের ঘনিষ্ঠজন। তাঁর অনুরোধে বহু ইসলামী গান ও লোকসুরের গান রচনা করেছেন নজরুল। ভাওয়াইয়া গানে আব্বাসউদ্দীন আহমদ দারুণ জনপ্রিয় ছিল। তাঁর কণ্ঠে আল্লা রসুলের গানসহ বিভিন্ন ইসলামী গান শুনে বাঙালি মুসলমানদের মনের ঘরে এক নবউন্মাদনার জোয়ার এসেছিল। নজরুলের সাথে তাঁর স্মৃতি সম্পর্কে জানিয়েছেন: "ভাওয়াইয়া গান শুনলেই কবি বড় চঞ্চল হয়ে উঠতেন। বহুদিন বলেছিলেন, 'জানি না এ গানের সুরে কী মায়া; আমার মন চলে যায় কোন পাহাড়িয়া দেশের সবুজ মাঠের আঁকাবাঁকা আলোর প্রান্তিকে, উপপ্রান্তিকে'। এরপর তাঁর প্রসিদ্ধ একখানা গানে তিনি আমাকে ভাওয়াইয়া সুরই সংযোগ করতে বলেছিলেন। সে গান হচ্ছে, 'কুচবরণ কন্যারে তোর মেঘবরণ কেশ'। গ্রামোফোন কোম্পানিতে একদিন সবাই বসে বেশ গুলতানি গল্প করছিলাম। এমন সময় কাজীদার প্রবেশ। তিনি বললেন, 'দেখো, হঠাৎ যদি আজ লটারিতে তোমরা এক লাখ টাকা পাও, তাহলে তোমাদের বউ বলো প্রিয়া বলো, তাকে কী কী জিনিস দিয়ে সাজাবে তোমরা'? একেকজন একেকরকম বলল। কেউ বা ট্যাক্সি করে এমবি সরকারের দোকানে গিয়ে হিরে-জহরতের জড়োয়া সেট কিনবে বলল, কেউ বা ওয়াছেল মোল্লার দোকানের শাড়ির যত রকম ডিজাইন আছে, সব কিনবে ইত্যাদি। কাজীদা হারমোনিয়ামটা টেনে বলে উঠলেন, 'শোনো আমি কী দিয়ে প্রিয়াকে সাজাতে চাই', বলেই গান ধরলেন-

মোর প্রিয়া হবে এসো রানী দেব খোঁপায় তারার ফুল

কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির চৈতি চাঁদের দুল ॥...

গান শেষ হলে বললেন, 'কি, মহারথীর দল, ক টাকা লাগল প্রিয়াকে সাজাতে ?"[৫]

জগন্ময় মিত্র

কালজয়ী আধুনিক বাংলা গানের শিল্পী। আধুনিক বাংলা গানে ইতিহাস রচনা করেছে জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে ১৯৪৮ সালে রেকর্ডকৃত প্রণব রায়ের লেখা আর সুবল দাশগুপ্তের সুর করা গান 'তুমি আজ কত দূরে (চিঠি)'। এইচ.এম.ভি'র হিসাব মতে জগন্ময় মিত্রের এ গানটির ২৫ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে যা, আধুনিক বাংলা গানের

ইতিহাসে সর্বাধিক বিক্রিত ও শ্রুত একক সঙ্গীত অদ্যাবধি। নজরুলের সাথে তাঁর মধুর সম্পর্কের ফল 'শাওন রাতে যদি'র মতো চিরকালীন আধুনিক বাংলা গান। জগন্ময় মিত্রের নিজের লেখা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে'তে নজরুল সম্পর্কে লিখেছেন: "কলকাতায় ফিরলাম ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে। তারপর হিজ মাস্টারস ভয়েস রেকর্ড কোম্পানিতে রেকর্ড করার একটা সুযোগ পেলাম। ... হেমবাবু নিয়ে গেলেন বিদ্রোহী কবি ও সুরকার কাজী নজরুল ইসলামের কাছে। কাজীদার কাছে আমায় নিয়ে যাচ্ছেন জানতে পেরে বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। ভয় ভয় হেমবাবুর পাশে গিয়ে সুবোধ বালকটির মত বসলাম। হেমবাবু আমার কণ্ঠের তারিফ করে কাজীদার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে নিজের কাজে চলে গেলেন। কাজীদার সামনে বসে নিজেকে অসহায় মনে হচ্ছিল। কিন্তু কয়েকটা কথার পরই মনে হল যেন একটা বটগাছের তলায় আশ্রয় পেয়েছি। কি প্রাণ খোলা হাসি! কি স্নেহের ভাষা! কাজীদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু ঠিক করেছিস কী গাইবি?' একটু ইতস্তত করে বললাম, 'আমি দু-একটা গান লিখে সুর করেছি। কাজীদা বললেন, আচ্ছা শোনা।' তখনকার দিনে যুবক-যুবতীদের মধ্যে কবিতা লেখার খুব চলন ছিল। সবাই তখন ক্ষুদে রবীন্দ্রনাথ। আমিও তার ব্যতিক্রম ছিলাম না। বন্ধু-বান্ধবদের তখন প্রায়ই নতুন নতুন গান লিখে সুর করে গেয়ে শোনাতাম। বন্ধুরা মনে হয় খানিকটা সময় কাটানোর অজুহাতে বসে বসে শুনত। মাঝে মাঝে টিপ্পনী যে কাটত না তা নয়। একদিন এক বন্ধু বলেই ফেললে, 'তুই যে রকম কবিতা লেখা, গান করা শুরু করেছিস তাতে মনে হচ্ছে তুই প্রেমে পড়েছিস।' তাদের ফিলোজফি অনুযায়ী কবিতা লেখা শুরু হয় প্রেমের অঙ্কুর গজাবার সঙ্গে সঙ্গে আর সেই সঙ্গে গান শুরু হলে বুঝতে হবে নির্ঘাৎ প্রেম। কাজীদাকে আমার লেখা ও সুর করা একটা গান শোনালাম।

যদি বাসনা মনে দিবে দহন জ্বালা

তবে মনের কোণে কেন বাসিলে ভালো।

কাজীদা যে কত মহৎ তা তার পরের কথায় বুঝতে পারলাম। আমার এই কাঁচা হাতের কবিতাকে পাঁকে বসিয়ে না দিয়ে বরং উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতেই বললেন, 'দেখ, কমার্শিয়াল লাইন তো, তাই একটু সতর্ক হয়ে গান বাছতে হবে। তোর লেখা মন্দ হয়নি, সুরটা কিন্তু অতি উত্তম। কাজেই একটা কাজ কর, আমি বরং তোর ওই সুরের ওপরই একটা গান লিখে দি।'... কাজীদা আমায় যতই বাহবা দিন না কেন আমি তো জানি আমার লেখার দৈন্য। তাই বললাম, 'কাজীদা, আমি এই গানটা লিখেছিলাম শুধু সুরটাকে ধরে রাখব বলে। সুরটা যদি পছন্দ করেন তাহলে ওই সুরের ওপর আপনিই গানটা লিখে দিন।'... কাজীদা বললেন, 'কয়েকবার গানটা গেয়ে যা তো।' আমি কয়েকবার গাইলাম। দুটো দুটো লাইন গেয়ে যাচ্ছি আর তিনি লিখে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে থামছি-লেখা শেষ

করছেন-আবার বলছেন 'এবার পরের লাইন দুটো গা।' গান লেখা শেষ করলেন যখন, তখন দেখলাম যেন একটা মুখস্ত কবিতা লিখে গেছেন। কোথাও কাটাকুটি নেই। কাজীদার যে গানটি কাজীদার সোনার কলম দিয়ে লেখা সেটি হল:

শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে

বাহিরে ঝড় বহে নয়নে বারি ঝরে।

ভুলিও স্মৃতি মম নিশীথ স্বপন সম

আঁচলের গাঁথা মালা ফেলিও পথ পরে।...

আমার গুরু ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় একবার একটা গান আমাদের গেয়ে শুনিয়েছিলেন সেটি হল 'আজু ঝরলা'। রাগের নাম বলেছিলেন, যতদূর মনে আছে 'ঝঞ্ঝা-মল্লার'। অর্থাৎ মল্লার ঘরের কোনো একটি রাগ। ঝঞ্ঝা-মল্লার নামটা ঠিক শুনেছিলাম কি না, এখন সন্দেহ পোষণ করি। কারণ, এ নাম আর কোনো জায়গায় শুনতে পাইনি। যাইহোক সেই রাগের ছায়া অবলম্বনে 'শাওন রাতে যদি' গানটির সুর দিয়েছিলাম। গানটিকে সুরে বসিয়ে নিয়ে যখন কাজীদাকে গেয়ে শোনালাম সে যে কি হাসি হাসলেন তা লিখে আপনাদের বোঝাতে পারব না। কাজীদার হা হা করে দিল খালো হাসি দেখে মনে হল যেন আমরা পৃথিবী জয় করেছি। কাজীদার লেখা গানটির জন্যই যে আমার সুরের মর্যাদা বাড়ল তা একবারও উল্লেখ না করে কেবলই বলতে লাগলেন, 'তোর সুরটা বড়ো সুন্দর তোর সুরটা বড়ো সুন্দর।' কাজীদা যে কত উদার, কত মহৎ তা কি লিখে বোঝানো সম্ভব? (আমার জীবনের এই প্রথম গানটি রেকর্ডিং করার তারিখ হল ১৮-৫-৩৯ এবং রেকর্ডের নম্বর হল এইচ.এম.ভি.এন- ১৭৪৪৮)।"[৬]

মুজফফর আহমদ

স্বনামখ্যাত রাজনীতিবিদ মুজফফর আহমদ কাজী নজরুল ইসলামের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগামী নেতা। আমাদের এই বঙ্গে অর্থাৎ কলকাতা ও বাংলাদেশে এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। ১৯২০ সালে নজরুল ইসলাম সৈনিকজীবন শেষ করে কলকাতায় এসে বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দের মেসে উঠলেও কিছুদিন পরে সেখান থেকে মুজফফর আহমদের কাছে ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসে এসে ওঠেন এবং একই ঘরে বসবাস করেন। ১৯২০ সালের ১২ জুলাই শেরে

বাংলা এ.কে ফজলুল হকের অর্থায়নে মুজফফর আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলাম যৌথ সম্পাদনায় সান্ধ্য পত্রিকা 'দৈনিক নবযুগ' বের করেন এবং এ পত্রিকা দারুণভাবে জনপ্রিয় হয়। তাঁর রচিত 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা'য় জানিয়েছেন: "নজরুলের জনপ্রিয়তার অন্য একটি কারণ ছিল তার গান। আমার মতে নজরুল খুব সুকণ্ঠ গায়ক ছিল না। তবে প্রাণের সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়ে সে গান গাইত। তাই, তার গান সব শ্রেণীর লোককে আকর্ষণ করত। সকলেই তার গান শুনতে চাইত। সময় হাতে থাকলে নজরুল কারুর অনুরোধ ফেলত না। প্রথমে হিন্দু-মুসলিম ছাত্র ও কেরানীদের মেসগুলি হতেই গান গাওয়ার জন্যে নজরুলের আমন্ত্রণ আসতে লাগল। তারপরে ধীরে ধীরে এই আমন্ত্রণ প্রসারিত হতে লাগল অনেক সব হিন্দু পরিবারেও। আমি অনেক সময়ে নজরুলের সঙ্গে অনেক মেসে গিয়েছি। গানের মজলিসের খরচ ছিল মাত্র কয়েক পেয়ালা চা। নজরুলের সঙ্গে কোনো হিন্দু পারিবারিক গানের মজলিসে আমি কখনও যাইনি। সেইসব পরিবারে নিশ্চয় নজরুলের অনেক যত্ন হতো। এইভাবে তার শুধু জনপ্রিয়তা যে বাড়ছিল তা নয়, সে একটা সামাজিক বাঁধও ভেঙে দিচ্ছিল। অন্যগান যে নজরুল দু-একটা গাইত না তা নয়, কোনো হিন্দুস্তানী বস্তী সংলগ্ন জায়গায় গেলে সে হিন্দুস্তানী গানও গাইত, এমন কি দু-একটি হিন্দুস্তানী গান সে নিজেও রচনা করেছিল, এসব সত্ত্বেও সে মূলত গাইত রবীন্দ্রনাথের গান। এত বেশী রবীন্দ্রসঙ্গীত সে কি করে মুখস্থ করেছিল তা ভেবে আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম। সমস্ত কুরআন যাঁরা মুখস্থ করেন তাঁদের হাফিজ বলা হয়। আমরা বলতাম নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রসঙ্গীতের হাফিজ।... আমি দেখেছি, তার গান ও কবিতার আবৃত্তি শোনার জন্যে চটকলের বাঙালী মজুরেরা পর্যন্ত তাকে ডেকেছে। পরে সে কৃষকদের ভিতরেও ঘুরেছে, বক্তৃতা দিয়েছে। অর্থাৎ শুধু শিক্ষিত সমাজের গণ্ডির ভিতরে সে নিজেকে ধরে রাখেনি। সে পৌঁছেছে জনগণের মধ্যেও। এই জন্যেই বাঙলা দেশের কবিদের ভিতরে নজরুল ইসলাম সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি হতে পেরেছিল। আজও কারখানার মজুরেরা পর্যন্ত তার জন্মদিবস পালন করেন।"[৭]

রফিকুল ইসলাম

উপমহাদেশের স্বনামধন্য নজরুল বিশেষজ্ঞ। জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম দেশের মননশীল লেখক ও ভাষাতত্ত্ববিদ। ড.রফিকুল ইসলাম এ দেশের প্রথম নজরুল গবেষক। রফিকুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম নজরুল-অধ্যাপক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরুল-গবেষণা কেন্দ্রের প্রথম পরিচালক। ১৯৫৭ সাল থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় ও নজরুল গবেষণায় নিয়োজিত। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীনের শেষবেলায় তাঁর মৃত্যুশয্যা পাশে ঢাকার পি.জি হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন রফিকুল

ইসলাম। তিনিই সর্বপ্রথম কবির মৃত্যু সংবাদ দেশবাসীর কাছে পৌঁছানোর জন্য টেলিফোনে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন কেন্দ্রে জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গনে কবিকে সমাধিস্থ করার পিছনে রফিকুল ইসলামের অবদান রয়েছে। তিনি ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বন্দিশিবিরে আটক ছিলেন। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা ও নজরুল গবেষণায় মৌলিক অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা 'একুশে পদক', 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার', নজরুল ইন্সটিটিউটের 'নজরুল-স্মৃতি পুরস্কার', কবিতীর্থ পশ্চিমবঙ্গের চুরুলিয়ার 'নজরুল একাডেমি পুরস্কার' লাভ করেন। 'কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃজন', 'নজরুল জীবনী', 'নজরুল নির্দেশিকা', 'নজরুল প্রসঙ্গে' প্রভৃতি নজরুল বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন, কাব্য ও সঙ্গীত প্রবন্ধে নজরুলের কবিতা ও গান প্রসঙ্গে তিনি মত ব্যক্ত করেছেন:

"বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বিদ্রোহী কবি' এবং আধুনিক বাংলা সঙ্গীতের 'বুলবুল' নামে খ্যাত কাজী নজরুল ইসলাম বিশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে উপমহাদেশের অবিভক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে সবচেয়ে বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুসরণ ও অনুকরণ কৃত্রিমতা থেকে আধুনিক বাংলা কবিতাকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে ফলপ্রসূ, সেই দিক থেকে তিনি বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার পথিকৃৎ। ...সঙ্গীতজ্ঞ নজরুল বাংলা সঙ্গীতের আনুমানিক সহস্র বৎসরের ইতিহাসে সবচেয়ে সৃজনশীল মৌলিক সঙ্গীত প্রতিভার অধিকারী বাণী ও সুরস্রষ্টা। সংখ্যাধিক্যের কারণেই নয়, বরং বাংলা সঙ্গীতের প্রায় সবকয়টি ধারার পরিচর্যা এবং বাংলা গানকে উত্তর ভারতীয় রাগসঙ্গীতের দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করে তিনি লোকসঙ্গীত-ভিত্তিক বাংলা গানকে উপমহাদেশের বৃহত্তর সঙ্গীত-ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন। নজরুল সঙ্গীত বাংলা সঙ্গীতের 'অণুবিশ্ব', তদুপরি উত্তর ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীতের খাঁটি বঙ্গীয় সংস্করণ। বাণী ও সুরের বৈচিত্র্যে নজরুল বাংলা গানকে মধ্যযুগীয় সঙ্গীতের অনুসৃতি থেকে আধুনিক সঙ্গীতে রূপান্তর ঘটান। আধুনিক বাংলা কবিতার মতো আধুনিক বাংলা গানের পথিকৃৎ কাজী নজরুল ইসলাম।"[৮]

আঙ্গুরবালা দেবী

প্রতিভাবান ভারতীয় বাঙালি কণ্ঠশিল্পী। আঙ্গুরবালার সুমধুর কণ্ঠে নজরুলের অনেক গান জনপ্রিতার তুঙ্গে উঠেছিল। নজরুলের কাছে বহু গান শিখেছেন, এবং গ্রামোফোনে রেকর্ডও করেছেন তিনি। পারিবারিকভাবে

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন কবির সাথে। নজরুলের গান গেয়ে যাঁরা বিপুল সুনাম অর্জন করেছিলেন আঙ্গুরবালা দেবী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। নজরুলের প্রতি তাঁর ভক্তি ছিল অবিচল। তাঁর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়– "গ্রামাফোন কোম্পানিতেই পরিচিত হলাম কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে। কাজী নজরুল তাঁর মধুর ব্যবহারে আমাদের সবাইকে নিজের করে নিয়েছিলেন। আমরা সবাই যার জন্যে তাঁকে কাজীদা বলে ডাকতাম। কাজীদার গানের ভাষা, অপরূপ ছন্দ ও সুরের বৈচিত্র্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। প্রাণবন্ত ভাষার সঙ্গে মার্গসংগীতের ধারায় মেশা নজরুলগীতি হল আমার সাধনার জিনিস। নজরুলগীতির গায়িকা হিসেবে সার্থক হবার আকাঙ্খা আমার গড়ে উঠলো। আজ নজরুলগীতির গায়িকা হিসেবে প্রশংসা করলে আমি গর্বিত বোধ করি।

কাজীদা আমাকে গানের ট্রেনিং দিতেন। কাজীদার কাছে তাঁরই লেখা গান, তাঁরই সুরে নিত্যনতুন করে শিখতাম। তাঁর গানের ভাষা ও সুর অত্যন্ত মধুর ও প্রাণবন্ত লাগতো। তাঁর কাছে গান শিখে যেমন আনন্দ, গেয়েও তৃপ্তি পেতাম। কাজীদা চাইতেন তাঁর গানের প্রতিটি কথা যেন আমরা তাঁরই মত উচ্চারণ করি গানের মর্মার্থ পুরোপুরি বুঝে গান করি।"[৯]

ইন্দুবালা দেবী

নজরুল সঙ্গীতের প্রবাদপ্রতিম ভারতীয় শিল্পী। তাঁর সঙ্গীতজীবনে সবচেয়ে সফল হয়েছিলেন কাজী নজরুলের গান গেয়ে। নজরুলের বহু বিখ্যাত গানের শিল্পী ইন্দুবালা দেবী। তিনি তাঁর প্রিয় কাজীদার জীবন ও গান প্রসঙ্গে জানিয়েছেন: "জীবনে আমাকে বহুবার বহু জায়গায় এ অটোগ্রাফ দিতে হয়েছে। সকলকে আমি একটিই গানের লাইন লিখে দিই 'অঞ্জলি লহো মোর সংগীতে।' এটি আমার একটি খুব প্রিয় গানের প্রথম ছত্র। এ গান আমাদের প্রিয় কাজীদা, কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা। আর কাজীদার তৈরী অপূর্ব সুরে এ গান আমি গেয়েছি রেকর্ডে। এই গানটির কথা উঠলে আজো আমার মনে পড়ে যায় পুরনো দিনের কতো স্মৃতি। কাজীদার কতো কথা। মনে মনে ভাবি আমাদের সেই আনন্দময়, সদাহাস্যময় কাজীদার কতো ছোটো ছোটো ঘটনা। তাঁর ঘরোয়া সহজ সরল গল্প, হাসিঠাট্টা, আর সেই মনমাতানো গান। যার তুলনা আমার এই দীর্ঘজীবনে আর কোথাও, কোনো মানুষের মধ্যে দেখিনি। ...এমনি ছিলেন কাজীদা সকলের প্রিয়। কাজীদার কাছে আবদার করে কেউ কোনোদিন বিমুখ হয়নি। এই আমার কথাই বলি। একদিন তাঁকে বললাম, 'কাজীদা আমাকে একটা খুব ভালো গান লিখে দিবেন? খুব দরদ দিয়ে গাইবো।' কাজীদা তাঁর হাসি মাখানো বড়ো বড়ো দুটি চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন,

বললেন, 'খুব ভালো গান ?' বললাম, হ্যাঁ। 'আচ্ছা বোস চুপ করে।' বলে কাজীদা একটুকরো কাগজ টেনে নিয়ে এক মুহূর্ত ভাবলেন কি ভাবলেন না, অমনি লিখে চললেন খস খস করে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে লিখে দিলেন– 'তোমার বুকের ফুলদানিতে ফুল হব বঁধু আমি' গানটি। তক্ষণি সুরও তৈরী করে দিলেন। গানটি এতো চমৎকার হয়েছিল যে আঙুর সেটি কেড়ে নিল। তারপর সে গান আঙুরবালা রেকর্ড করেছিল। খুব ভালো গেয়েছিল সে।"[১০]

জসীম উদ্‌দীন

স্বনামধন্য বাঙালি কবি, গীতিকার ও ঔপন্যাসিক। তিনি বাংলার মানুষের কাছে পল্লীকবি নামে খ্যাত। আবহমান পল্লীবাংলার রূপশোভা ও সংস্কৃতি তাঁর হাতে আধুনিকভাবে ফুটে উঠেছে। 'পল্লীকবি' নামেই জসীম উদ্‌দীনের অধিক পরিচিতি। পূর্ববালার সাংস্কৃতিক জাগরণের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব জসীম উদ্‌দীনের সাথে জাতীয় কবির বেশ অন্তরঙ্গতা ছিল। সেই সূত্র ধরেই নজরুল প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন: "এই লোকটি আশ্চর্য লোকরঞ্জনের ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখনই যেখানে গিয়াছেন যশ-সম্মান আপনা হইতেই আসিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে। গ্রামোফোন কোম্পানিতে আজ যে এতো কথাকার আর সুরকার গুঞ্জরণ করিতেছেন, এ শুধু নজরুলের জন্যই। নজরুল প্রমাণ করিলেন যে গানের রেকর্ড বেশী বিক্রী হয়– সে শুধু গায়কের সুকণ্ঠের জন্যেই নয়, সুন্দর রচনার সহিত সুন্দর সুরের সমাবেশ রেকর্ড বিক্রয় বাড়াইয়া দেয়। আমি দেখিয়াছি গ্রামোফোন কোম্পানিতে নানান ধরনের গানের হট্টগোলের মধ্যে কবি বসিয়া আছেন– সামনে হারমোনিয়াম– পাশে অনেকগুলি পান আর গরম চা। ছ'সাতজন নামকরা গায়ক বসিয়া আছেন কবির রচনার প্রতীক্ষায় একজনের চাই শ্যামাসংগীত, অপরজনের কীর্তন, একজনের ইসলামী সংগীত, অন্যজনের ভাটিয়ালী গান– আরেকজনের চাই আধুনিক প্রেমের গান। এঁরা যেন অঞ্জলি পাতিয়া বসিয়া আছেন। কবি তাঁহার মানসলোক হইতে সুধা আহরণ করিয়া আনিয়া তাঁহাদের করপুট ভরিয়া দিবেন। কবি ধীরে ধীরে হারমোনিয়াম বাজাইতেছেন, আর গুন গুন করিয়া গানের কথাগুলি গাহিয়া চলিয়াছেন। মাঝে মাঝে থামিয়া কথাগুলি লিখিয়া লইতেছেন। এইভাবে একই অধিবেশনে সাত আটটি গান শুধু রচিত হইতেছে না তাহার সুর সংযোজিত হইয়া উপযুক্ত শিষ্যের কণ্ঠে গিয়া আশ্রয় লইতেছে।"[১১]

প্রণব রায়

বাংলা গানের অসামান্য গীতিকার। অধুনিক বাংলা গানের এ কিংবদন্তী রচয়িতার প্রায় সব গানই ব্যাপক জনসমারোহ তৈরী করেছে এবং শ্রোতাদের হৃদয়ের গানে পরিণত হয়েছে সে গান। গানের বাণীর এমন সরলতা আর উপমার ব্যবহার বাংলা গানে বিরল। কাজী নজরুলের একান্ত স্নেহধন্য ছিলেন এবং নজরুলের অকুণ্ঠ অনুপ্রেরণায় হয়েছেন কালজয়ী গীতিকার। প্রণব রায়ের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়– "কাজীদা ছিলেন একেবারে সত্যিকার স্বভাবকবি। কাগজ কলম নিয়ে বসলেই হলো। যেন একেবারে কলম খুলে দেওয়ার মতন হড় হড় করে কলমের ডগা দিয়ে কাব্য, রচনা ইত্যাদি বেরিয়ে আসত। একবার দেখেছিলাম গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সাল রুমে ২৭ মিনিটের মধ্যে পাঁচ-ছ'খানা শ্যামাসংগীত তিনি লিখে ফেললেন এবং প্রত্যেকটাই অনবদ্য। তার মধ্যে ২/১টা গানের প্রথম লাইন আমার মনে আছে– 'আমার মানসবনে ফুটেছে রে শ্যামালতার মঞ্জরী, বা 'শ্যামা নামের লাগল আগুন'। কত তাড়াতাড়ি কাজীদা লিখতে পারেন সেটা দেখবার জন্য আমি ঘড়িটা দেখেছিলাম। কমল দাশগুপ্তের সুরের ওপর কাজীদার খুবই একটা ভাল ধারণা শুধু বলব না, কমলের সুরকে কাজীদা আদর করতেন। সেই জন্য অনেক ভাল ভাল গান লিখে কমলকে দিতেন। তার মধ্যে মনে আছে যুথিকা রায়ের রেকর্ড করা গান 'তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম'। আরো অনেক রকম গান কাজী সাহেব লিখেছিলেন। হাসির গানেও যে তাঁর জোড়া কেউ ছিলেন না সেটাও প্রমাণ হয়ে গেছে। তখনকার কালের যিনি মস্ত কমেডিয়ান রঞ্জিৎ রায়, তাঁর রেকর্ডে। কাজীদার লেখা হাসির গান রঞ্জিৎবাবু অনেক রেকর্ড করেছেন এবং সেগুলো তখন খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। ... কাজী সাহেবের সঙ্গে যখন গ্রামোফোন কোম্পানিতে দেখা হলো এবং আমিও যখন গ্রামোফোন কোম্পানিতে একজন গীতিকার হয়ে সেখানে কাজ শুরু করেছিলাম, সেই সময় কাজীদার কাছে থেকে যে স্নেহ ও উৎসাহ পেয়েছি তা ভোলবার নয়।"[১২]

কানন দেবী

একজন ভারতীয় জননন্দিত বাঙালি অভিনেত্রী ও কণ্ঠশিল্পী। নজরুলের কাছে সঙ্গীতের তালিম নিয়েছেন এবং রবীন্দ্রনাথের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে বহু গান গেয়েছেন। অত্যন্ত সুদর্শনা কানন দেবী ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র অভিনেত্রীদের মধ্যে প্রথম গায়িকা। বহু প্রতিভার অধিকারী কানন দেবী নজরুলের গানের পাশাপাশি আধুনিক গান ও রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে এ ধারার গানকে শহুরে ভদ্রঘরের গণ্ডি থেকে গ্রাম বাংলার

সাধারণ ঘরের শ্রোতাদরে কাছে জনপ্রিয় করায় অতুলনীয় অবদান রেখেছেন। দ্রুতলয়ে গান গেয়ে দর্শক শ্রোতাদের সুনাম কুড়িয়েছেন কানন দেবী। অসাধারণ সুন্দরী হওয়ার কারণে খুব কম বয়সেই ম্যাডন থিয়েটার্সে অভিনয়ের সুযোগ পান। অপরূপা সুন্দরী এই অভিনেত্রী ও গায়িকার অধিক জনপ্রিয়তার জন্য কলকাতার রাস্তার পাশে চট বিছিয়ে তাঁর আলোকচিত্র বিক্রি হতো এবং তাঁর পোশাক, অলংকার, চলাফেরা ফ্যাশনে পরিণত হলো যা, বাঙালি রমণীরা অনুসরণ করতে আরম্ভ করল। ৭০ টির অধিক ছায়াছবিতে অভিনয় করেছেন। ভারত সরকার তাঁকে ১৯৬৪ সালে 'পদ্মশ্রী', ১৯৭৬ সালে 'দাদা সাহেব ফালকে' পুরস্কারে ভূষিত করেন। 'জয়দেব' নামে একটি নির্বাক চলচ্চিত্রে তাঁর প্রথম অভিনয় শুরু। তাঁর স্মৃতিচারণে নজরুলের গান প্রসঙ্গে বলেন:

"আমি তো রাগরাগিণী কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু লক্ষ্য না করে উপায় ছিল না কি। সীমাহীন ব্যাকুলতায় তিনি কথার ভাবের সঙ্গে মেলাবার জন্য হারমোনিয়াম তোলপাড় করে সুর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ঠিক যেন রাগের মর্ম থেকে কথার উপযুক্ত দোসর অন্বেষণ। আমাকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে বলতেন, 'ডাগর চোখে দেখছ কি ? আমি হলাম ঘটক, জানো? এক দেশে থাকে সুর, অন্য দেশে কথা। এই দুই দেশের এই বর কনেকে এক করতে হবে। কিন্তু দুটির জাত আলাদা হলে চলবে না। তা হলেই বে–বনতি। বুঝলে কিছু ?' বলে হাসিমুখে আমার দিকে তাকাতেন। আমি মাথা নেড়ে স্পষ্টই বলতাম 'না বুঝিনি'। বলতেন 'পরে বুঝবে।' পরে বুঝেছি কিনা জানি না তবে এইটুকুই আজ পর্যন্ত বুঝবার কিনারায় এসেছি যে কথার মত অতি বাস্তব বস্তুর বুকেও অসীমে ব্যাপ্ত হবার তৃষ্ণা জাগানো এবং সুরের মত অধরাকেও কথার মাধুর্যে বন্দী করার মিলন উৎসবে যিনি আত্মহারা–তাঁর কবিকৃতিকে উপভোগ করা যতখানি সহজ ব্যক্তিত্বকে বোঝাটা ঠিক ততখানি নয়।

ছবির গান ও সুর বাঁধার সময়ও দেখেছি কত প্রচণ্ড আনন্দের মধ্যে কি প্রবলভাবেই না কবি বেঁচে উঠতেন, যখন একটা গানের কথা ও সুর ঠিক তাঁর মনের মত হয়ে উঠত। মানুষ কোনো প্রিয়খাদ্য যেমন রসিয়ে রসিয়ে আস্বাদ করে কাজী সাহেব যেন তেমনি করেই নিজের গানকে আস্বাদ করতেন। শেখাতে শেখাতে বলতেন– 'মনে মনে ছবি এঁকেনাও নীল আকাশ দিগন্তে ছড়িয়ে আছে। তার কোনো সীমা নেই, দুদিকে ছড়ানো তো ছড়ানোই। পাহাড় যেন নিশ্চিন্ত মনে তারই গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আকাশের উদারতার বুকে এই নিশ্চিত মনে ঘুমানোটা প্রকাশ করতে হলে সুরের মধ্যেও একটা আয়েস আনতে হবে। তাই একটু ভাটিয়ালীর ভাব দিয়েছি। আবার ঐ পাহাড় কেটে যে ঝর্ণা বেরিয়ে আসছে তার চঞ্চল আনন্দকে কেমন করে ফোটাব ? সেখানে সাদামাটা সুর চলবে না। একটু গীটকিরি তানের ছোঁয়া চাই। তাই 'রো -ওও-ও-অই- বলে ছুটলো ঝর্ণা আত্মহারা আনন্দে।' এমনই করে তিনি এই মেলানোর আনন্দ আমাদের হৃদয়েও যেন ছড়িয়ে দিতেন।"[১৩]

কমল দাশগুপ্ত

প্রতিথযশা বাঙালি সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক ও শিল্পী। কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীতজীবনের একান্ত ঘনিষ্ঠজন ছিলেন কমল দাশগুপ্ত। নজরুলের জনপ্রিয় বহু গানে সুরকার কমল দাশগুপ্ত। ১৯৩৪ সালে নজরুলের গানে প্রথম সুর করেন তিনি এবং নজরুলের প্রায় চারশোর বেশি গানে সুর করার কৃতিত্ব তাঁর। বলা হয়ে থাকে– কমল দাশগুপ্তের সুরকে নজরুল আদর করতেন। গানের বাণীতে মন হরণ করা সুর প্রয়োগ করার অসীম ক্ষমতা ছিল কমল দাশগুপ্তের। প্রসিদ্ধ সুরকার কমল দাশগুপ্ত মাত্র ২৩ বছর বয়সে এইচ.এম.ভিতে সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। আশির অধিক চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। তিনি নজরুল ইসলাম ও বন্ধু প্রণব রায়ের গানে সবচেয়ে বেশি সুর দিয়েছেন। স্মৃতিচারণে তাঁর প্রিয় কাজীদার জীবন ও গান প্রসঙ্গে জানিয়েছেন: "সুরকাররা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে সুর করে থাকেন। এ সম্পর্কে কাজীদাকে প্রশ্ন করেছিলাম। কাজীদা বলেছিলেন, গজল গানের সুর করা সহজ, কারণ তার একটা ছক আছে। উর্দু সাহিত্যের সম্পদ গজল। তার উৎপত্তিস্থান লখনৌ এবং লাহোরে। যে সকল সুরকার ভাল ভাল গজল শুনেছেন তাঁদের পক্ষে সেই সকল সুরের সাহায্য নিয়ে বাংলা গজলে সুর করা সহজ হয়। গজল গানে মাত্র দুটি লাইনের সুর করলেই সম্পূর্ণ গানের সুর হয়ে যায়। কারণ ও দুটি লাইনের সুরেই সম্পূর্ণ গানটি গাওয়া হয়। এই কারণেই গজল একঘেয়ে হতে বাধ্য, কিন্তু যোগ্য শিল্পীরা তাঁদের কৃতিত্বে একঘেয়েমী কাটিয়ে গজলকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। বাংলা দাদরা ঠুংরী সম্পর্কে আমাদের দুজনার মত একই ছিল। এই দুটিও আমরা উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্তানী সংগীতের মাধ্যমে পেয়েছি, এবং জনপ্রিয় হিন্দী গানগুলির সুরের ওপর বাংলা কথা বসানো হয়। সুরকারের নিজস্ব অবদানে বাংলা দাদরা ও ঠুংরীকে চিত্তাকর্ষক করে তোলা হয় এবং শিল্পী অলংকার দিয়ে সাজিয়ে দেন।

কাজীদা বললেন, বিশেষ ধরনের গান যখন করতে বসি তখন হারমোনিয়াম বাজিয়ে প্রথম দুটি লাইনের সুর করি এবং আজেবাজে কথা বসিয়ে সুরটাকে ধরে রাখি! হারমোনিয়াম ছেড়ে দিয়ে এবার ওই দুই লাইনের কথা বদল করি। মনের মতন কথা পেলেই সম্পূর্ণ গানটি লিখে ফেলি, অবশ্য ওই দুই লাইনের ছন্দ বজায় রেখে। আমি বললাম, প্রথম দু'লাইনের মত হারমোনিয়ামে অন্য লাইনের সুর করলেন না কেন ? নারে, সম্পূর্ণ গানটা সুরের ওপর লিখতে গেলে গানের কথা দুর্বল হয়ে পড়ে, আর লিখতেও কষ্ট। আধুনিক গানের কথা উঠতে কাজীদা একটু ঠেস দিয়ে বললেন, তোদের এই আধুনিক গানের সুর আমার দ্বারা হবে না, তাইতো আধুনিক গান নিজে থেকে লিখি না। ধীরেন (সহকারী ধীরেন দাশ) মাঝে মাঝে জোর করে লিখিয়ে নেয়। গান লেখার এবং সুর করার জন্য মুডের প্রয়াজেন আছে কি ? এই প্রশ্নে কাজীদার জবাব, রেখে দে তোর মুড। কখন মুড আসবে সে আশায় বসে

থাকলে রেকর্ড জগতে আর কাজ করতে হবে না। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন এই আলোচনা শুধু রেকর্ড সংগীতের ওপর। কাজীদা বললেন, এখানে কাজ বাধ্যতামূলক। শিল্পী এখনি গান শিখতে আসবে, তার রেকর্ড করার দিন স্থির হয়ে আছে, বাজিয়েরা সেই অনুযায়ী অপেক্ষা করছে। সুতরাং তোমাকে তখন সুর করতেই হবে ভাল হোক আর মন্দ হোক। আমার প্রশ্ন: তবে কি সুর করার ওপর মুডের কোন প্রভাব নেই ? কাজীদা বললেন, নিশ্চয় আছে। অনেক সময় দেখেছি প্রথম লাইন সুর করার পর আর যেন বেশী ভাবতে হচ্ছে না বা খুঁজতে হচ্ছে না। সুর যেন নিজেই এসে কথার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। অল্পসময়ের মধ্যে গানটির সুর হয়ে গেল। লক্ষ্য করেছি সেই সুর শ্রুতিমধুর হয়ে থাকে।"[১৪]

তথ্যনির্দেশ

১. কল্যাণী কাজী, *শত কথায় নজরুল*, সাহিত্যম, কলকাতা, বইমেলা ২০০৭; পৃষ্ঠা ২৭৬

২. করুণাময় গোস্বামী, *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ* , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬; পৃষ্ঠা ৩৬, ৩৮, ৩৯

৩. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, *কেউ ভোলে না কেউ ভোলে*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮; পৃষ্ঠা ১০, ১২৫, ১৫২

৪. সন্তোষ সেনগুপ্ত, *আমার সংগীত ও আনুষঙ্গিক জীবন*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা:লি: কলকাতা, বইমেলা ১৯৮৬; পৃষ্ঠা ৪৩, ৪৪, ৬৯,৭০

৫. আব্বাসউদ্দীন আহমদ, *দিনলিপি ও আমার শিল্পী জীবনের কথা*, প্রথমা প্রকাশন ঢাকা, জুলাই ২০০৯; পৃষ্ঠা ২০৮, ২০৯, ১৪৮

৬. জগন্ময় মিত্র, *শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে*, প্রতিভাস, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ২০১০; পৃষ্ঠা ৩১, ৩২, ৩৩

৭. মুজফফর আহমদ, *কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৬; পৃষ্ঠা ২৮,২৯

৮. নজরুল জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা; পৃষ্ঠা ৩

৯. করুণাময় গোস্বামী, *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬; পৃষ্ঠা ৫৬

১০. করুণাময় গোস্বামী, *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ৫৭, ৫৯

১১. করুণাময় গোস্বামী, *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ৬৩,৬৪

১২. করুণাময় গোস্বামী, *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ৬৪, ৬৫, ৬৬

১৩. করুণাময় গোস্বামী, *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ৬৮

১৪. করুণাময় গোস্বামী, *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ৭২,৭৩।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

কাজী নজরুল ইসলামের কবি প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে তাঁর গানে। নজরুলের রচিত গানের মধ্যে আধুনিক গানের সংখ্যা সর্বাধিক। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যসঙ্গীতের ধারায় এক স্বর্ণোজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছেন। দুটি কর্মসাধনের জন্য বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসে নজরুলের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে মহান নির্মাতা রূপে। প্রথমটি প্রচলিত ধারায় নবপ্রাণসঞ্চার করা এবং দ্বিতীয়টি নব নব সঙ্গীতধারা সংযোজনের মাধ্যমে বাংলা কাব্যগীতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলা। দীর্ঘকাল ধরে বাঙালিকে যে লঘু সুরের গান মুগ্ধ করে রেখেছে তার নাম 'আধুনিক গান'। নজরুলকে এ গানের সংস্কারক বললেও ভুল হবে না। কাজী নজরুল ইসলামের সুরপ্রবাহে উচ্ছ্বসিত এই আধুনিক বাংলা গানের ধারা। এই শ্রেণিভুক্ত বেশিরভাগ গানই সাধারণত প্রেমের গান। যে কথা, যে সুরে শ্রোতার মনকে সহজভাবে ছুঁয়ে যেতে পারে, মোহাবিষ্ট করে দিতে পারে যে ভাবনা, সেই কথায়, সেই সুরে, সেই ভাবনা তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর আধুনিক গানে। আধুনিক বা প্রেমের গানে নজরুলের স্বকীয়তা সুস্পষ্ট হয়েছে, প্রকাশভঙ্গির বিচার এবং বাক্যবিন্যাসে। গ্রামোফোন কোম্পানিতে যুক্ত হবার পর থেকে নজরুল আধুনিক গান রচনা শুরু করেন। তখনকার নজরুলের প্রায় সমস্ত গান রেকর্ড করা হতো এবং রেকর্ডের জন্যই তিনি গান রচনা করতেন মূলত। সে সময়ের শিল্পীদের মধ্যে নামকরা থেকে নামহীন সবাই নজরুলের গান গাইতেন। এসময়ই নজরুলের আধুনিক গানের বিপুল জনপ্রিয়তা আসে এবং লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে কাজী নজরুল ইসলামের গান। সুদূর পল্লী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া দু-একটি আধুনিক আধুনিক গানের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। যেমন: তুমি আরেকটি দিন থাকো, যবে তুলসী তলায় প্রিয় সন্ধ্যা বেলায় তুমি করিবে প্রণাম।

প্রেম নজরুলের আধুনিক গানের প্রধান বিষয়বস্তু। নজরুলের পূর্ববর্তী গীতিকবি বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গানে নর-নারীর ভালোবাসা, সৌন্দর্যচেতনার এমন সূক্ষ্মলোকে উন্নত হয়েছিল যে সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষে তা অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়েছিল। যৌবনদীপ্ত মানুষের হৃদয়বারতা সেখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কিন্তু নজরুলের প্রেমের গান যথার্থই যৌবন বেদনার, প্রাণ প্রশান্তির অনুভূতিসর্বস্ব গান। সে গান বিশ্বচরাচরের ভিন্ন কোনো ভাবের কাছে সমর্পিত নয়, অনুরাগে, উচ্ছ্বাসে, বিহ্বলতায়, সংকটে গৃহবাসী মানুষের অনুভব ও স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি বোনে হৃদয়ের পটে। যেভাবে গঠন করলে গানের ঢঙ আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে, সাধারণ শ্রোতারা যেভাবে শুনলে প্রীত হবেন, আধুনিক গানের সাংগীতিক বিকাশ সেভাবেই হতে থাকলো।

নজরুলের সমকালীন বাংলা গান বলতে নজরুলের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমসাময়িক সংগীত রচয়িতাদের রচিত গানকেই বোঝায়। সে ক্ষেত্রে বিশেষ করে নজরুলের পূর্ববর্তী কবিদের গানের প্রভাব পড়েছিল নজরুলের সংগীত জীবনে। সমকালে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে জনপ্রিয় ছিল তাঁদের সে গান। নজরুলের থেকে বয়সের ব্যবধান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) ৩৮ বছরের, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) ৩৬ বছরের, রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫-১৯১০) ৩৪ বছরের এবং অতুলপ্রসাদ সেনের (১৮৭১-১৯৩৪) ২৮ বছরের তবুও এই দিকপাল সংগীতকারদের শ্রুতিসুখকর সঙ্গীত রচনা নজরুলের সঙ্গীতসৃজনে দারুণভাবে উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা দিয়েছে। কবি হিসেবে, সুরকার হিসেবে, গান রচনার প্রথম জীবনে নজরুল পূর্ববর্তী বিখ্যাত রচয়িতাদের গানের বাণী ও সুরকেই মানদণ্ড হিসেবে মনে ভেবে গান রচনা ও সুরারোপ শুরু করেন। নজরুলের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংগীত রচয়িতা ও সুরকারদের গানে বাঙালি শ্রোতারা এত মোহিত হয়েছিলেন যে, তাঁদের সৃজনসফলতা রচয়িতাদের বয়সের পার্থক্য বা কালের ব্যবধানকে ঢেকে দিয়েছে। কর্মময় জীবন, গান রচনার সংখ্যা, সঙ্গীতের গুণগত বৈশিষ্ট্যে নজরুলের সমকালীন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেকের সঙ্গে তাঁর আধুনিক গানের তুলনা করা হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন ও অতুলপ্রসাদ সেনের গানের সাথে নজরুলের গানের ভাবগত ও গুণগত সাদৃশ্য রয়েছে। তবে বাণীর বিশিষ্টতায় ও সুর বৈভবে নজরুলের আধুনিক গান সব থেকে বেশি অধুনিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন ও অতুলপ্রসাদ সেন ছাড়াও পূর্ববর্তী ও সমকালীন সময়ে যাঁদের গানে প্রাণিত হয়ে, কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর রচিত সফল সংগীতের মাধ্যমে গানের ভুবনে মহিমান্বিত হয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংগীতকারদের নাম ও তাঁদের গান: সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬) ও কেন গেল চলে কথাটি নাহি বলে, হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬০) শিউলী আমার প্রানের সখি, তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯) ভুলোনা রেখো মনে বাঁচবে যতকাল, দিলীপ কুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০) প্রিয় তোমার কাছে যে হার মানি সেই আমার জয়। নজরুল তাঁর সমকালীন সময়ে যাঁদের গান রচনায় মুগ্ধ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের নাম ও তাঁদের গান– সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২) ওগো সুন্দর মনের গহনে তোমার মুরতি খানি, হীরেন বসু (১৯০৩-১৯৮৭) প্রিয়ার প্রেমের লিপি লেখনী তরে হে বলাকা, প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) এই জীবনের যত মধুর ভুলগুলি, শৈলেন রায় (১৯০৫-১৯৬৩) রাতের ময়ূর ছড়ালো যে পাখা আকাশের নীল গায়, অজয় ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৪৩) এই গান তোমার শেষ করে দাও, বাণীকুমার (১৯০৭-১৯৭৪) অশ্রুকণার মেলা নয়নে সাথীহারা কাটে বেলা, সুবোধ পুরকায়স্থ (১৯০৭-১৯৮৪) কেন যে চলে গেলে চাহিয়া মুখপানে, অনিল ভট্টাচার্য (১৯০৮-১৯৪৪) আমার দুঃখ দিনের অনল শিখায়, নিশিকান্ত (১৯০৯-১৯৭৩) এই পৃথিবীর পথের পরে, বিমলচন্দ্র ঘোষ (১৯১০-১৯৬৮) পৃথিবীর গান আকাশ কি মনে রাখে, প্রণব রায়

(১৯১১-১৯৭৫) নাইবা ঘুমালে প্রিয় রজনী এখনো বাকি, পবিত্র মিত্র (১৯১৮-১৯৭৫) কত নিশি গেছে নিদ হারা ওগো, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (১৯২৪-১৯৮৬) আমি যামিনী তুমি শশী হে, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩১-১৯৯৯) রাত জাগা দুটি চোখ যেন দুটি কবিতা। সমকালীন দক্ষ সুরকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের নাম ও তাঁদের গান– ছিলেন– রাইচাঁদ বড়াল (১৯০৩-১৯৮১) যখন রব না আমি দিন হলে অবসান, হিমাংশু দত্ত (১৯০৮-১৯৪৪) ছিল চাঁদ মেঘের পারে, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ (১৯০৯-১৯৭৬) আমি সুরে সুরে ওগো তোমায় ছুঁয়ে যাই, অনুপম ঘটক (১৯১১-১৯৫৬) কে তুমি আমারে ডাকো অলখে লুকায়ে থাকো, কমল দাশগুপ্ত (১৯১২- ১৯৭৪) দুটি পাখি দুটি তীরে, সুধীরলাল চক্রবর্তী (১৯১৬-১৯৫২) এ জীবনে মোর যত কিছু ব্যথা, শৈলেশ দত্তগুপ্ত (১৯০৫-১৯৬০) এনেছি আমার শত জনমের প্রেম, নচিকেতা ঘোষ (১৯২৫-১৯৭৬) মায়াবতী মেঘে এলো তন্দ্রা প্রভৃতি। পরবর্তীতে কথা আর সুরের বিচিত্র ধারায় বাংলা গানের ধারা সমৃদ্ধ করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। বাণীর গৌরব ও সুর যোজনায় আধুনিক গান অন্যান্য গীতধারা থেকে বেশি জনপ্রিয়। বাংলা গানে আধুনিক প্রবণতার একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল বাংলা কাব্যগীতির পরিধি সম্প্রসারণ বা বৃদ্ধিকরণ। অন্যান্য গীতিকারের হাতে বাংলা গান গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়লেও নজরুলের হাতে এসে গানের সে গণ্ডির মুক্তি মিলেছে, বৃদ্ধিকরণ ঘটেছে। বাংলা আধুনিক গানের সীমানা প্রসারিত হয়েছে বিপুলসংখ্যক শ্রোতার হৃদয়ে। এক দুর্নিবার আকর্ষণে বাঙালির হৃদয়কে টানে নজরুলের রচিত 'আধুনিক গান'। নজরুলের আধুনিক গানে প্রেমের উচ্ছল প্রকাশ ঘটেছে। বাংলা আধুনিক গান রচনা ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের আর একটি অবিস্মরণীয় অবদান শ্রমবিভাজন। গীতিকার, সুরকার ও গায়ক তিন পৃথক সঙ্গীতগুণীর আবির্ভাব ঘটেছে এই সঙ্গীতধারায়। সঙ্গীত সৃজনে পূর্বে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়নি আর কখনো। সর্বাধিক আকর্ষণীয় ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার নিমিত্তেই এই ত্রিমাত্রিক গুণীর সমন্বয় ঘটানো হয়েছিল বাংলা গানে। ফলে কালজয়ী গায়কের আবির্ভাব হয়েছে, অসাধারণ সব সুর উদ্ভাবিত হয়েছে, বহু উচ্চমানের আধুনিক গান রচিত হয়েছে বাংলা ভাষায়।

জনপ্রিয়তা ও সুখশ্রাব্যতার নিরিখে নজরুলের আধুনিক গান সমকালে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। নজরুলের গানে সর্বপ্রথম অত্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে শ্রোতাভিমুখী গীত রচনার প্রবণতা। এক আশ্চর্য রূপায়ন ঘটে কথা ও সুর রচনার পেশাদারী ধারার। প্রয়োজনবোধে নিজের লেখা কথায় অন্য সুরকারের সুর সংযোজনেও নজরুল কুণ্ঠাবোধ করতেন না বিন্দুমাত্র। বিকাশমান যুগ ও আগত যুগের মধ্যে নজরুল ছিলেন তাই সেতুবন্ধন স্বরূপ। নজরুল ছিলেন আধুনিক যুগের প্রথম ও প্রধানতম সঙ্গীতস্রষ্টা। অন্যদিকে পূর্ববর্তী ধারার সর্বশেষ ও প্রধানতম প্রতিনিধি। বাংলা কাব্যসঙ্গীতের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে রয়েছে ত্রিশের দশক। বাংলা কাব্যসঙ্গীত এক সুবর্ণপ্রসূকাল অতিবাহিত করেছে এই যুগে। আধুনিক গানের সেই ঐতিহাসিক যুগের নক্ষত্রসম ও উজ্জ্বলতম

রচয়িতা ছিলেন নজরুল। সাবলীল শ্রুতিসুখে ও বিপুল বৈচিত্র্যে আধুনিক গানের প্রকাশ নজরুলের হাতে সম্পন্ন হয়েছিল পরিপূর্ণভাবে, যা বাংলা গানের অন্যকোন গীতি কবির মাধ্যমে সাধিত হয়নি। সেই গৌরবান্বিত আধুনিক গানের সুখস্মৃতি ধারা, চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধতায় আমাদের মনপ্রাণ আজও আলোকিত করে প্রশান্তিতে ভরিয়ে রাখে। নজরুলের গানকে কেন্দ্র করে সেই মাতোয়ারা ভাবের শেষ নেই এখনো। আধুনিক বাংলা গানের ভাবসম্পদের যে অনটন বর্তমানে পরিলক্ষিত হচ্ছে, যেভাবে শ্রীহীন হয়ে পড়ছে গানের বাণী, মধুরতাহীন হয়ে পড়ছে গানের সুরযোজনা, ক্রমেই কোলাহলপূর্ণ হয়ে উঠছে সঙ্গীত আয়োজন বা সহযোগী যন্ত্রবাদন, তাতে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের তথা আধুনিক গানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ফলে জোছনা আলোকিত চাঁদনী রাতের মতো আধুনিক বাংলা গানের বাণীর ঐশ্বর্য্য ও সুরসুষমার রূপদর্শনের জন্য আজও নজরুলের গানের পানে চেয়ে থাকতে হয় সঙ্গীত পিপাসু বাঙালি শ্রোতাদের।

কালক্রমে আধুনিক গানের ভাষা শ্রীহীন হয়ে উঠেছে, সুর রচনা সংক্রমিত হয়েছে বেসুরতায়, গানের ভাবসম্পদে দীনতা পরিলক্ষিত হয়েছে বহুগুণে, যন্ত্রানুষঙ্গে এসেছে কোলাহল প্রবণতা। ফলশ্রুতিতে সমগ্র বাংলা গান তথা আধুনিক গানের মূল ঐতিহ্যগত বিষয়টি হারিয়ে যেতে বসেছে, বিনষ্ট হতে বসেছে। হৃদয়ের তিয়াসা মেটানোর নিমিত্তে যে সঙ্গীতকারদের গানে বাঙালির বুকের মাঝে মধুর বাঁশরি বেজেছে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের মধ্যে প্রধানতম রচয়িতা। একবিংশ শতাব্দীতেও নজরুলের আধুনিক গানের প্রতি বাঙালি সঙ্গীত পিপাসুদের পরিতৃপ্তি ও আগ্রহের কমতি নেই এতটুকু। এই শ্রেণির গীতরচনাকে ঘিরে নজরুলের সৃজনপ্রতিভা ও হৃদয়ানুগ অনুভূতির সর্বোচ্চ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। জনচিত্তমনস্কতা নজরুল প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য। জনরুচিকে উপলক্ষ্য করে জননন্দিত সঙ্গীত রচনাই ছিল আধুনিক গীতধারার প্রধান প্রবণতা। সাধারণ মানুষের হৃদয়ের বাসনাকে অতি সাবলীলভাবে রূপায়িত করতে জানতেন বলেই নজরুলের গান এত বিপুলভাবে শ্রোতাচিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছে। সঙ্গীত সৃজনপদ্ধতির আধুনিকতা নজরুলের প্রতিভার মূল বৈশিষ্ট্য ফলে বাংলা প্রেমের গানের একটি অসামান্য ধারা পল্লবিত হয়ে উঠেছিল নজরুলের আধুনিক শ্রেণির গানকে কেন্দ্র করে।

সঙ্গীতে অবদান বিষয়ে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন প্রবল আত্মবিশ্বাসী সঙ্গীতস্রষ্টা। সংখ্যার বিচার দিয়ে নয়, সঙ্গীতের নিবিড় সাধনায় ও স্বর্গীয় সুর ও বাণী রচনায় নজরুলের বাংলা গানে যে অবদান, তা আজ সঙ্গীত জগতের সম্পদে পরিণত হয়েছে। বাংলা সঙ্গীতের শাখা-প্রশাখায় নজরুলের সাবলীল বিচরণ, সঙ্গীত ভাবনায় নজরুলের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করে। সমকালীন সকল সঙ্গীতবোদ্ধারা নজরুলের গানকে গ্রহণ করেছিলেন আনত শ্রদ্ধায়। বাঙালির মননের ও সংস্কৃতির সর্বোপরি জীবনমানসের রূপকার বলা যায় নজরুলকে। বাংলা

সাহিত্য- সঙ্গীতের প্রাণপুরুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয় কাজী নজরুল ইসলামকে। আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় নজরুলের কল্পিত সেই সঙ্গীতময় পরিচ্ছন্ন, প্রাণবন্ত বাঙালি সংস্কৃতিবান্ধব সমাজ পরিপূর্ণভাবে আজও প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেনি। সঙ্গীত কখনো ধ্বংসের পথ দেখায় না বরং শান্তি-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ করে জীবন ও মন। সঙ্গীত সমাজের সকল হানাহানি, বিদ্বেষ, উগ্রবাদিতা দূর করে দিয়ে অনাবিল শান্তি আনয়ন করে। সুরের অমৃত স্বাদ, স্বর্গীয় অনুভূতি থেকে বহুদূরে পড়ে রয়েছে বহু বাঙালি শ্রোতা এখনও। গান রচনায়- সুর যোজনায়, সুরেও বাণীতে, জীবন-যাপনে, ইতিহাসে ও ঐতিহ্যে, সর্বোপরি শিল্প-সংস্কৃতিতে আরো বেশি আধুনিক হতে হবে বাঙালি সংস্কৃতিমনস্কদের। তবেই বিশ্বময় অন্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষজন হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতিকে, বাঙালিকে ও বাঙালির চিরশান্তিময় সঙ্গীতকে, শান্তির অমূল্য উপাদান হিসেবে বিবেচনায় আনবে। ফলে জাতি হিসেবে বাঙালি, বাঙালির বাংলা গান তথা আধুনিক গান এগিয়ে যাবে বিকাশের পথে, সমৃদ্ধির পথে। বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলামসহ অন্যান্য সঙ্গীতকারের আধুনিক গীতধারার গান হবে জননন্দিত। বাঙালি ও বাঙালির গান হবে বিশ্বনন্দিত, বিশ্ববন্দিত।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. অরুণকুমার বসু, *নজরুল জীবনী*, আনন্দ, কলকাতা; জুন ২০১৭

২. অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা গানের পথচলা*, আজকাল, কলকাতা; জানুয়ারি ২০১০

৩. আব্দুল আহাদ, *আসা-যাওয়ার পথের ধারে*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা; আগস্ট ১০১৪

৪. আতোয়ার রহমান, *নজরুল বর্ণালী*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

৫. আলী হোসেন চৌধুরী, *নজরুল ও বাংলাদেশ*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা; অক্টোবর ২০০০

৬. আব্বাসউদ্দীন আহমদ, *দিনলিপি ও আমার শিল্পী জীবনের কথা*, প্রথমা প্রকাশন ঢাকা জুলাই ২০০৯

৭. আসাদুল হক সংগৃহীত ও সম্পাদিত, *কার গানের তরী যায় ভেসে*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা; মে ১৯৯৯

৮. আসাদুল হক সম্পাদিত, *সুধীজনের দৃষ্টিতে নজরুল সঙ্গীত*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা; মে ১৯৯৯

৯. আব্দুস সাত্তার, *নজরুল সঙ্গীত অভিধান*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা; ২৫ মে ১৯৯৩

১০. আবদুল আজিজ আল আমান সম্পাদিত, *নজরুল গীতি অখণ্ড*, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা; নভেম্বর ২০০২

১১. আবুল আহসান চৌধুরী, *বাঙালির কলের গান*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা; নভেম্বর ২০১২

১২. আসাদুল হক, *নজরুল সংগীতের রূপকার*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা; জুলাই ১৯৯০

১৩. আবদুশ শাকুর, *শ্রোতার কৈফিয়ৎ*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা; সেপ্টেম্বর ২০১২

১৪. ইদ্‌রিস আলী, *নজরুল সংগীতের সুর*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, জুন ১৯৯৭

১৫. ইদ্‌রিস আলী, *শতবর্ষের মূল্যায়ন নজরুল সঙ্গীত*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা; এপ্রিল ২০০১

১৬. কল্যাণী কাজী সম্পাদিত, *শত কথায় নজরুল*, সাহিত্যম, কলকাতা; বইমেলা ২০০৭

১৭. করুণাময় গোস্বামী, *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

১৮. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা;মার্চ ১৯৯০

১৯. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বর্তমান ও আরো*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা; জুলাই ২০১৪

২০. করুণাময় গোস্বামী সম্পাদিত ও সংগৃহীত, *নজরুল সংগীতের তালিকা*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা; জুলাই ১৯৯৫

২১. করুণাময় গোস্বামী, *সঙ্গীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

২২. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি ২০১১

২৩. Karunamaya goswami, *kazi Nazrul Islam a biography*, Nazrul institute, Dhaka, may 2006

২৪. Karunamaya goswami, *Aspects of Nazrul songs*, Nazrul institute, Dhaka, may 1990

২৫. গোপিকা রঞ্জন চক্রবর্তী, *ভবা পাগলার জীবন ও গান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৯৫

২৬. গোলাম মুরশিদ, *বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত নজরুল জীবনী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি ২০১৮

২৭. জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়, *তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি-প্রথম খণ্ড*, প্রতিভাস, কলকাতা; জানুয়ারি ২০০৪

২৮. জগন্ময় মিত্র, *শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে*, প্রতিভাস, কলকাতা; ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

২৯. জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়, *তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি-দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রতিভাস, কলকাতা; জানুয়ারি ২০০৯

৩০. জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়, *তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি-তৃতীয় খণ্ড*, প্রতিভাস, কলকাতা; বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫

৩১. ডা বিমল রায়, *সংগীতি শব্দকোষ দ্বিতীয় খণ্ড*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, কলিকাতা, অক্টোবর ১৯১৬

৩২. ড. জাহিদুল কবীর, *ভাটিয়ালী গানের উদ্ভব ও বিকাশ*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা; একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭

৩৩. ড. বাঁধন সেনগুপ্ত, *নজরুল কাব্যগীতি বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন*, প্রতিভাস, কলকাতা; জানুয়ারি ১০১৬

৩৪. ড. বাঁধন সেনগুপ্ত, *কবি নজরুল অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পুনশ্চ, কলকাতা; জানুয়ারি ২০১০

৩৫. ডঃ উৎপলা গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, দীপায়ন, কলকাতা; জুলাই ২০০২

৩৬. ড. প্রদীপ কুমার নন্দী, *কাজী নজরুলের গান: সুরকার প্রসঙ্গ*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা; ডিসেম্বর ২০১৩

৩৭. *নজরুল জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা

৩৮. নজরুল ইন্সটিটিউট সংগৃহীত *আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের তালিকা*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৫

৩৯. পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, *কথায় কথায় রাত হয়ে যায়*, আনন্দ, কলকাতা, জুলাই ২০১২

৪০. প্রবীর সেনগুপ্ত, *বাংলার গান বাংলা গান*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ৮ আগস্ট ২০০৬

৪১. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, *নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা; ২৫ মে ২০০৯

৪২. বিষ্ণু বসু ও আব্দুর রউফ সম্পাদিত, *শতবর্ষে নজরুল ফিরে দেখা*, পুনশ্চ, কলকাতা; জুলাই ১৯৯৯

৪৩. মান্না দে, জীবনের জলসাঘরে, আনন্দ, কলকাতা, নভেম্বর, ২০০৭

৪৪. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা হাজার বছরের বাংলা গান*, প্যাপিরাস, ঢাকা; আগস্ট ২০০৫

৪৫. ম ন মুস্তাফা, *আমাদের সঙ্গীত ইতিহাসের আলোকে*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা; জুন ১৯৮১

৪৬. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, *নজরুল সমীক্ষণ*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা; মে ২০০০

৪৭. মোহাম্মদ আবুল খায়ের, *নজরুল সংগীতে নান্দনিকতা*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা; জানুয়ারি ২০১৪

৪৮. মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান, *বাংলা গান বিবিধ প্রসঙ্গ*, *হাওলাদার প্রকাশনী*, ঢাকা; বইমেলা ২০১১

৪৯. মান্না দে, *জীবনের জলসাঘরে*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা; অক্টোবর ২০০৫

৫০. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *প্রাতিষ্ঠানিক নজরুল চর্চার ইতিবৃত্ত*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা; জুন ১৯৯৪

৫১. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, *নজরুল ইসলাম: নানা প্রসঙ্গ*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা; জুন ১৯৯১

৫২. মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত, *নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা; এপ্রিল ২০১১

৫৩. মুজফফর আহমদ, *কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা; সেপ্টেম্বর ২০০৬

৫৪. মাহবুবুল হক, *নজরুল তারিখ অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; জুন ২০১০

৫৫. যূথিকা বসু, *বাংলা গানের আঙিনায়*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, নভেম্বর ২০০০

৫৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঙ্গীতচিন্তা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, কলকাতা; জ্যৈষ্ঠ ১৪১১

৫৭. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *নজরুল সমগ্র(প্রেম ও প্রকৃতির গান) সপ্তম খণ্ড*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা; জুন ২০১৮

৫৮. রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃজন*, নজরুল ইন্সটিটিউট ঢাকা; ফেব্রুয়ারি ২০১২

৫৯. রফিকুল ইসলাম, *নজরুল প্রসঙ্গে*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা; মে ২০০০

৬০. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *নজরুল নির্দেশিক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; মে ২০১৩

৬১. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *নজরুল রচনাবলী*, *নবম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পহেলা ফেব্রুয়ারি ২০০৯

৬২. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *নজরুল রচনাবলী*, *অষ্টম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পহেলা আগস্ট ২০০৮

৬৩. রমাকান্ত চক্রবর্তী, *নিধুবাবু ও তাঁর টপ্পা*, পুনশ্চ, কলকাতা, বইমেলা ২০০১

৬৪. রশিদুন্ নবী সম্পাদিত, *নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহ*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা; অক্টোবর ২০১৪

৬৫. লীনা তাপসী খান, *নজরুল সংগীতের রাগের ব্যবহার*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি ২০১১

৬৬. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, *কেউ ভোলে না কেউ ভোলে*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; কলকাতা ২০০৮

৬৭. সন্‌জীদা খাতুন, *নজরুল মানস*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, অক্টোবর ২০১৮

৬৮. সন্তোষ সেনগুপ্ত, *আমার সঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক জীবন*, এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা; বইমেলা ১৯৮৬

৬৯. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালে বাংলা গান ও রবীন্দ্র সঙ্গীত*, প্যাপিরাস, কলকাতা; ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

৭০. সুধীর চক্রবর্তী, *শতশত গীত মুখরিত*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা; মে ২০১৮

৭১. সুধীর চক্রবর্তী, *বাংলা গানের সন্ধানে*, প্রতিভাস, কলকাতা; জানুয়ারি ২০১৩

৭২. সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *আধুনিক বাংলা গান*, প্রতিভাস, কলকাতা; মে ১৯৮৭

৭৩. সুধীর কুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, *বাংলা গান অদীন ভুবন, দিলীপ কুমার রায়: সাধক নজরুল*, কারিগর, কলকাতা, আগস্ট ২০১১

৭৪. সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

৭৫.হায়াৎ মামুদ ও জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত সম্পাদিত, *তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা; সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।

পরিশিষ্ট

নজরুল রচিত আধুনিক গানের তালিকা

অচেনা সুরে অজানা পথিক

অঝোর ধারায় বর্ষা ঝরে

অনেক কথা বলার মাঝে

অনেক ছিল বলার

অন্ধকারে এসে তুমি

আজি অলি ব্যাকুল ঐ

আকাশে আজ ছড়িয়ে দিলাম

আকাশে ভোরের তারা

আকাশের মৌমাছি তারকার দল

আকুল হলি কেন বকুল বনের

আঁখি ঘুম ঘুম নিশীথ নিঝুম

আঁখি তোলো আঁখি তোলো না

আঁখি বারি আঁখিতে থাক

আগের মতো আমের ডালে

আঁচলে হংসমিথুন আঁকা

আজ নলীন নয়ান মলিন কেন

আজ না চাওয়া পথ দিয়ে

আজ নিশীথে তোমার

আজ শেফালীর গায়ে হলুদ

আজ শ্রাবণের লঘু মেঘের সাথে

আজ সকালে সূর্য ওঠা সফল

আজ সে সব কথা গেছো ভুলে

আজকে গানের বান এসেছে

আজি এ বাদল দিনে কত কথা

আজি কুমকুম ফাগে

আজি কুসুম দীপালি জ্বলিছে বনে

আজি গানে গানে ঢাকবো আমার

আজি জ্যোৎস্না বিজড়িত

আজি নতুন চাঁদের তিথিতে

আজি পূর্ণশশী কেন মেঘে ঢাকা

আজি বাদল বঁধু এলে শ্রাবণ সাঁঝে

আজি মিলনবাসর প্রিয়া

আজিকে তনু-মনে লেগেছে রং

আঁধার রাতে দেবতা মোর এসে গেছে চলে

আঁধার রাতের তিমির দুলে

আঁধারের এলোকেশ ছড়িয়ে এলে

আন গোলাপ পানি

আনারকলি আনারকলি

আনো আনো অমৃত বারি

আবার ভালোবাসার সাধ জাগে

আমরা বনের পাখি বনের দেশে

আমায় নহে গো ভালোবাস শুধু

আমার আছে অসীম আকাশ

আমার আছে এই ক'খানি গান

আমার কথা লুকিয়ে থাকে

আমার ঘরের মলিন দীপালোকে

আমার দেওয়া ব্যথা ভোলা

আমার নয়নে নয়ন রাখি

আমার পায়ের বেড়ি

আমার পিয়াল বনের

আমার বিদায়রথের চাকার ধ্বনি

আমার বীণার মূর্চ্ছনাতে বাজাও

আমার ভুবন কান পেতে রয়

আমার মালায় লাগুক তোমার

আমার সুরের ঝর্ণাধারায়

আমারে ভাসালে অসীম আকাশে

আমি অগ্নিশিখা মোরে বাসিয়া

আমি আছি বলে দুঃখ পাও তুমি

আমি এদেশ হতে বিদায় যেদিন

আমি গগন গহনে সন্ধ্যাতারা

আমি চাঁদ নহি অভিশাপ

আমি চিরতরে দূরে চলে যাব

আমি জানি তব মন

আমি তব দ্বারে প্রেম ভিখারী

আমি নহি বিদেশিনী

আমি পথভোলা ভিনদেশী

আমি পূরব দেশের পুরনারী

আমি প্রভাতী তারা পূর্বাচলে

আমি ভুলিতে পারি নাই তাই

আমি যার নূপুরের ছন্দ

আমি যেদিন রইব না গো

আমি রাজার কুমার পথভোলা

আমি সহিতে পারি না রে

আমি সন্ধ্যামালতী বনছায়া অঞ্চলে

আমি সুন্দর নহি জানি হে বন্ধু জানি

আমি সূর্যমুখী ফুলের মতো

আমি হব মাটির বুকে ফুল

আয় ইরানী-মেয়ে জংলা পথ বেয়ে

আয় বনফুল ডাকিছে মলয়

আর অনুনয় করিবে না কেহ

আর কত গান গাইব বল

আরক্ত কিংশুক কাঁপে

আরতি নাও মরমের অধরে

আরো কতদিন বাকী

আসিবে তুমি জানি প্রিয়

আসে রজনী সন্ধ্যামণির প্রদীপ

উতল হলো শান্ত আকাশ

এ কোথায় আসিলে হায়

এ কোন মায়ায় ফেলিলে আমায়

এ জনমে মোদের মিলন

এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো

একলা গানে পায়রা উড়াই

একাদশীর চাঁদ রে ওই

এখনো মেটেনি আশা

এখনো ওঠেনি চাঁদ

এ তো একা চন্দ্রমণি

এবার যখন উঠবে সন্ধ্যাতারা

এল ফুলের মহলে ভ্রমরা

এলে কি বঁধু ফুল ভবনে

এলে কে গো চিরসাথী অবেলাতে

এলো ঐ পূর্ণশশী ফুল জাগানো

এলো খোঁপায় পরিয়ে দে

এলো মিলনরাতি

এসো এসো তব যাত্রাপথে

এসো এসো পাহাড়ি ঝর্না

এসো প্রিয় মন রাঙায়ে

এসো প্রিয়তম এসো প্রাণে

এসো ফিরে প্রিয়তম

এসো বসন্তের রাজা হে আমার

এসো শারদ প্রাতের পথিক

এসো বঁধু ফিরে এসো

ঐ কাজল কালো চোখ

ঐ পথ চেয়ে থাকি

ঐ রাঙা পায়ে রাঙা আলতা

ও মেঘের দেশের মেয়ে

ও শাপলা ফুল নেব না

ও শিকারী মারিস না তুই

ও কে উদাসী আমায় ডাকে

ও কে চলেছে বনপথে একা

ও কে টলে টলে চলে

ও কে নাচের ঠমকে

ও কে বিকালবেলা বসে

ও কে হেলে দুলে চলে

ওগো আজ কেন মন উদাস এমন

ওগো চৈতী-রাতের চাঁদ যেও না

ওগো দেবতা তোমার পায়ে

ওগো তারি তরে মন কাঁদে

ওগো পিয়া তব অকরুণ

ওগো প্রিয় তব গান

ওগো প্রিয়তম তুমি চলে গেছো

ওগো প্রিয়তম মোরে এত প্রেম দিও না

ওগো বন্ধু দাও সাড়া দাও

ওগো সুন্দর তুমি আসিবে বলিয়া

ওরে অভিমানিনী এমন করে

ওরে আমার বুকের বেদনা

ওরে চাঁদ বল মোর

ওরে বনের ময়ূর

ওরে শুভ্রবসনা রজনীগন্ধা

ওরে সরে যেতে বল

ওলো ফুলপসারিনী

কত আর এ মন্দির দ্বার

কত কথা ছিল তোমায় বলিতে

কত কথা ছিল বলিবার

কত কথা রয়েছে বাকী

কত দূরে তুমি ওগো

কত নিশি কাটালি অভিমানে

কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও

কত যুগ যেন দেখিনি তোমারে

কত যুগ পাই নাই

কত সে জনম কত সে লোক

কথা কও কও কথা থাকিও না চুপ করে

কথার কুসুমে গাঁথা

কদম কেশর পড়ল ঝরি

কপোত-কপোতী উড়িয়া বেড়াই

কবি সবার কথা কইলে এবার

করেছ পথের ভিখারিনী

কলঙ্ক আর জোছনায় মেশা

কাছে আমার নাইবা এলে

কাছে গেলে সে যে দূরে সরে যায়

কাছে তুমি থাকো যখন

কাঁদিতে এসেছি আপনারে লয়ে

কার মঞ্জীর রিনিঝিনি বাজে

কাহারই তরে হায় নিশিদিন কাঁদে

কিশোরী মিলন বাঁশরি

কুনুর নদীর ধারে শোন ডাকছে

কুল রাখো না রাখো তুমি সে জানো

কৃষ্ণচূড়ার রাঙা মঞ্জুরি কর্ণে

কে এলে বাদলা রাতে

কে এলে মোর চির-চেনা

কে এলে হংসরথে

কে এলে মোর ব্যথার গানে

কে এলো ওরে কে এলো

কে এলো ডাকে চোখ গেল

কে গো তুমি গন্ধকুসুম

কে ডাকিলে আমারে আঁখি তুলে

কে দুয়ারে এলে মোর

কে নিবি ফুল কে নিবি ফুল

কে বলে গো তুমি আমার নাই

কেউ বলতে পার কোথায় আমার

কেঁদে যায় দখিন হাওয়া

কেন আজ নতুন করে

কেন ঘুম ভাঙ্গালে প্রিয়

কেন চাঁদনী রাতে

কেন ফোটে কেন কুসুম ঝরে যায়

কেন মনোবনে মালতী বল্লরী

কেমনে হইব পার হে প্রিয় তোমার আমার মাঝে

কোথা চাঁদ আমার

কোন জোছনার মলয় হাওয়ায়

কোন ফুলেরি মালা দিই

কোন সে সুদূর অশোক কাননে

খেলা শেষ হলো শেষ হয় নাই বেলা

ক্ষীণতনু যৌবনভার বইতে নারে

খ্যাপা হাওয়াতে মোর আঁচল

গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়

গহীন রাতে ঘুম কে এলে ভাঙ্গাতে

গাইব আমি দূর থেকে শুনবে তুমি

গাগরী ভরনে চলো ব্রজনারী

গান ভুলে যাই মুখপানে চাই

গানের সাথী আছে আমার

গুনগুনিয়ে ভ্রমর এলো

গোধূলীর শুভ লগন

ঘুম আয় ঘুম, ঘুম ঘুম ঘুম

ঘুম টুটেছে ফুলকলিদের

ঘুমাও ঘুমাও দেখিতে এসেছি

ঘুমায়েছে ফুল পথের ধুলায়

ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে

ঘুমে জাগরণে বিজড়িত প্রাতে

চন্দ্রমল্লিকা চন্দ্রমল্লিকা চাঁদের দেশের

চরণে দলিয়া গিয়াছে চলিয়া

চাঁদিনী রাতে কানন সভাতে

চম্পা পারুল যুথি

চলে কুসমী শাড়ি পরি

চাও চাও চাও নববধূ

চাঁদের দেশের পথভোলা

চারু চপল পায়ে যায় যুবতী গৌরী

চিকন কালো ভুরুর তলে

চুরি কিঙ্কিণী রিনি রিঞ্জিনী

চৈতি চাঁদের আলো

চোখে চোখে চাহ যখন

ছলছল নয়নে মোর পানে

ছড়ায়ে বৃষ্টির বেলফুল

ছড়ায়ে রূপের ফাঁদ

ছাড়িয়া যেও না আর

ছেড়ে দাও মোরে

জনম জনম তব তরে কাঁদিব

জল দাও দাও জল

জাগো বনলক্ষ্মী জোছনা বিগলিত

জাগো মালবিকা জাগো মালবিকা

জাগো যুবতী আসে যুবরাজ

জানি আমার সাধনা নাই

জানি জানি তুমি আসিবে

জানি জানি প্রিয় এ জীবনে

জানি না পাব না তোমায়

ঝরলো যে ফুল ফোটার আগেই

ঝরা ফুল দলে কে অতিথি

ঝর ঝর ঝর কোন গভীর গোপন

ঝলমল জরীন বেণী দুলায়ে

ঝিলের জলে কে ভাসালে

ঝুমকো লতার চিকন পাতায়

ঝুমকো লতায় জোনাকী

টলমল টলমল টলে সরসী

ডেকো না আর দূরের প্রিয়া

ঢল ঢল তব নয়ন কমল

ঢল ঢল নয়নে স্বপনের ছায়া গো

ঢের কেঁদেছি ঢের সেধেছি

তব গানের ভাষায় সুরে

তব চঞ্চল আঁখি কেন ছলছল

তব চলার পথে

তব ফুলহার নহে মোর নহে

তব মাধবী লীলায় কর মোরে সঙ্গী

তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরি গো

তব রূপের সায়রে ও নয়ন

তবু মোরে মনে রেখো

তারকা নূপুরে নীলনভে

তাহারি ছবিটি গোপনে আঁকি

তুমি আমায় যবে জাগাও গুণী

তুমি আর একটি দিন থাকো

তুমি আমার সকাল বেলার সুর

তুমি আঘাত দিয়ে মন ফেরাবে

তুই কে ছিলি তাই বল

তুমি কি আসিবে না

তুমি কি দখিনা পবন

তুমি কি নিশীথ চাঁদ

তুমি কে গো তুমি মোদের

তুমি কেন এলে পথে

তুমি ধরা দেবে তারে বলেছিলে

তুমি নন্দন পথভোলা

তুমি প্রভাতের সকরুণ ভৈরবী

তুমি ফুল আমি সূতো

তুমি বর্ষায় ঝরা চম্পা

তুমি ভোরের শিশির

তুমি যে হার দিলে ভালোবেসে

তুমি যেয়ো না তুমি যেয়ো না

তুমি শুনিতে চেয়ো না

তুমি সুখে থাক প্রিয়া

তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি

তুমি সুন্দর হতে সুন্দরতর

তুমি হাতখানি যবে রাখো মোর

তুমি হেসে চলে গেলে

তৃষিত আকাশ কাঁপে রে

তেমনি চাহিয়া আছে নিশীথের

তোমার আকাশে উঠেছিনু চাঁদ

তোমার কবরে প্রিয় মোর তরে

তোমার দেওয়া ব্যথা সে যে

তোমার ফুলের মতো মন

তোমার বিনা তারের গীতি

তোমার বিবাহে আপনার হাতে

তোমার মনে ফুটবে যবে

তোমার হাসিতে জাগে

তোমার সাথে আমার মনের

তোমার আঁখির মত আকাশের

তোমারেই আমি চাহিয়াছি প্রিয়

তোমারেই প্রিয় চাহিয়াছি

তোমায় দেখি নিতুই চেয়ে

তোমায় যদি পেয়ে হারাই

থাক সুন্দর ভুল আমার

থৈ থৈ জলে ডুবে গেছে পথ

দারুণ পিপাসায় মায়া মরীচিকায়

দিতে এলে ফুল হে প্রিয়

দিনগুলি মোর পদ্মেরই দল

দিন চলে যায় হে কবি বিদায়

দিনের সকল কাজের মাঝে

দিল দোলা ওগো দিল দোলা

দীপ নিভিয়াছে ঝড়ে

দুপুর বেলাতে একলা পথে

দূর প্রবাসে প্রাণ কাঁদে

দৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি

দেবতা গো দ্বার খোল

দেখলে তোমায় বাসতে ভালো

দোপাটি লো করবী

ধর ধর ভর ভর এ রঙিন পিয়ালি

ধীর চরণে নীর ভরনে

ধীরে যায় ফিরে ফিরে চায়

নতুন পাতার নূপুর বাজে

নদীর স্রোতে মালার কুসুম

নন্দন বন হতে কে গো

নবীন বসন্তের রাণী তুমি

নয়নভরা জল গো তোমার

নয়ন যে মোর বারণ মানে না

নয়নে ঘনাও মেঘ মালবিকা

নয়নে তোমার ভীরু মাধুরীর মায়া

নয়নে নিদ নাহি নিশীথ প্রহর জাগি

নাই চিনিলে আমায় তুমি

নাই পরিলে নোটন খোঁপায়

নাইবা পেলাম আমার গলায়

নিও না গো মোর অপরাধ

নিতি নিতি মোরে ডাকে

নিরালা কাননপথে

নিরুদ্দেশের পথে আমি হারিয়ে

নিশি ভোরে অশান্ত ধারায়

নিশিদিন তব ডাক শুনিয়াছি

নিশি ভোরে অশান্ত ধারায়

নিশির পাহারা ভেঙে

নিশীথ রাতে ডাকলে আমায়

নিশীথ স্বপন তোর

নিশীথ হয়ে আসে তোর

নিষ্প্রভ এই শশী তব বদন

নীরব সন্ধ্যা নীরব দেবতা

নীল সরসীর জলে

নূরজাহান নূরজাহান

পঞ্চ প্রাণের প্রদীপ

পলাশ ফুলের গেলাস ভরি

পরজনমে যদি আসি ধরায়

পথহারা পাখি কেঁদে ফিরে একা

পথিক বন্ধু এসো এসো

পরদেশী প্রিয়তম এসো ফিরে

পরাণ হরিয়াছিলে পাশরিয়া

পিয়া পাপিয়া পিয়া বোলে

পিয়াল ফুলের পিয়ালায় বঁধু

পুষ্পধনুর ইঙ্গিতে হায় হারানো

পূবালী পবনে বাঁশি বাজে

পূরবের তরুণ অরুণ

প্রথম যৌবনে এই প্রথম বিরহ

প্রাণে জাগে হিন্দোল

প্রিয় ওগো আমারে ভুলে

প্রিয় তব গলে দোলে যে হার

প্রিয় কোথায় তুমি আছ

প্রিয় কোথায় তুমি কোন গহনে

প্রিয় তুমি কোথায় আজি

প্রিয়তম এত প্রেম দিও না গো

প্রিয়তম হে বিদায়

প্রিয়তম হে আমি যে তোমারি

প্রেম আর ফুলের জাতি

প্রেমের হাওয়া বইল যখন

ফিরনু যেদিন দ্বারে দ্বারে

ফিরিয়া যদি সে আসে

ফিরে এসো ফিরে এসো

ফিরিয়া এসো এসো হে ফিরে

ফিরে ফিরে কেন তারই স্মৃতি

ফিরে ফিরে দ্বারে আসে যায় কে

ফাগুন ফুরাবে যবে

ফুটলো যেদিন ফাল্গুনে হায়

ফুটলো সন্ধ্যামণির ফুল

ফুরাবে না এই মালাগাঁথা মোর

ফুলকিশোরী জাগো জাগো

ফুলের পথে চলি না

ফুলের বনে আজ বুঝি সই

বঁধু আমি ছিনু বুঝি বৃন্দাবনে

বঁধু জাগাইলে এ কোন পরম

বঁধু তব প্রেম অনুরাগে

বঁধু মিটিল না সাধ ভালোবাসিয়া

বনদেবী এসো গহন বনছায়ে

বনদেবী জাগো সহকার করে

বনফুলে তুমি মঞ্জরি গো

বনমল্লিকা ফুটিবে যখন

বনমালার ফুল জোগালি

বনহরিণীরে তব বাঁকা আঁখির

বনে মোর ফুটেছে হেনা চামেলী

বনের তাপস কুমারী আমি গো

বনের হরিণ বনের হরিণ

বন্ধু পথ চেয়ে চেয়ে আকাশের

বন্ধু বিদায় যাই চলে যাই

বরের বেশে আসবে জানি

বল প্রিয়তম বল

বল সখি বল ওরে সরে যেতে বল

Dhaka University Institutional Repository

বল্লরী–ভূজ–বন্ধন খোলো

বলেছিলে তুমি তীর্থে আসিবে

বলেছিলে তুমি ভালোবাস মোরে

বসিয়া নদী কূলে এলোচুলে

বাজায়ে কাঁচের চুড়ি

বাজিছে বাঁশরি কার অজানা সুরে

বাজো বাঁশরি বাজো বাঁশরি

বাদল বায়ে মোর নিভিয়া গেছে বাতি

বাসন্তী রং শাড়ী পরো

বিকাল বেলার ভুঁই চাঁপা গো

বিজলী খেলে আকাশে কেন

বিদায় বিদায় কহে সাঁঝের রবি

বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ

বিদায় বেলায় করুণ সুরে

বিদেশি তরী এল কোথা হতে

বিধুর তব অধর কোণে

বিরহের অশ্রু সায়রে বেদনার

বিরহের নিশি কিছুতে আর

বুকে তোমায় নাইবা পেলাম

Dhaka University Institutional Repository

বুনো পাখি বুনো পাখি চোখে

বুনো ফুলের করুণ সুবাস

বৃথাই ওগো কেঁদে আমার

বৃথা তুই কাহার পরে করিস অভিমান

বেণুকার বনে কাঁদে বাতাস বিধুর

বেদনার পারাবার করে হাহাকার

বেদনা বিহ্বল পাগল পূবালী

বেদনার বেদীতলে পেতেছি

বেল ফুল এনে দাও চাই না বকুল

বেলা পড়ে এলো জলকে সই চল

বেলা শেষে গিরিপথের ছায়ে

ব্যথা দিয়ে প্রাণ ব্যথা না পায়

ব্যথার আগুনে হৃদয় আমার

ব্যথার উপরে বঁধু ব্যথা দিও না

ভালোবাসার ছলে আমায়

ভালোবাসায় বাঁধবো বাসা

ভালো লাগে কারো আঁখি

ভীরু এ মনের কলি ফোটালে না

ভুল করে মোর ফুল বাগানে

ভুল করে যদি ভালোবেসে থাকি

ভুল করিলে বনমালী এসে বনে

ভুলে যেও ভুলে যেও সেদিন

ভেসে আসে সুদূর স্মৃতির সুরভী

ভেঙ্গো না ভেঙ্গো না বঁধু

ভোরের তরুণ অরুণে

ভোরের স্বপনে কে তুমি দিয়ে দেখা

ভোলো অতীত স্মৃতি

ভোলো প্রিয় ভোলো ভোলো

ভোলো ভোলো গো লায়লী

ভ্রমর নূপুর পরিহিতা

মদির অধীন দখিন-হাওয়া

মদির স্বপনে মম বন ভবনে

মধুকর মঞ্জীর বাজে বাজে

মধুর রসে উঠল ভরে

মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে

মনে রাখার দিন গিয়েছে

মম জনম মরণের সাথী

মমতাজ মমতাজ

Dhaka University Institutional Repository

মম মায়াময় স্বপনে কার বাঁশি বাজে

মলয় হাওয়া আসবে কবে

মহান তুমি প্রিয়

মহুয়া বনে বন পাপিয়া একেলা

মাধবীলতার আজি মিলন সখি

মালতী মঞ্জুরী ফুটিবে যবে

মালার ডোরে বেঁধ না গো

মিলন রাতের মালা হব

মুখে কেন নাহি বল আঁখিতে যে

মোর ধ্যানের সুন্দর এলে কি

মোর নিশীথের চাঁদ ঘন মেঘে

মোর দুখনিশি কবে হবে ভোর

মোর প্রিয়া হবে এসো রানী

মোরা আর জনমে হংস

মোরা ছিনু একেলা হইনু দুজন

মোরে এত প্রেম দিও নাগো

মোরে ভালোবাসায় ভুলিও না

মৌরী ফুলের মিঠে সুবাস

যখন আমার কুসুম ঝরার বেলা

Dhaka University Institutional Repository

যখন আমার গান ফুরাবে

যতদিন রবে প্রাণের প্রদীপে

যত ফুল তত ভুল কণ্টক জাগে

যাও মেঘদূত দিও প্রিয়ার হাতে

যাক না নিশি গানে গানে জাগরণে

যবে আঁখিতে আঁখিতে ওরা কহে

যবে তুলসী তলায় প্রিয়

যবে ভোরের কুন্দকলি

যারে হাত দিয়ে মালা

লায়লী তোমার এসেছে ফিরিয়া

শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে

শত জনমে আঁধারে আলোকে

সই ভালো করে বিনোদ বেণী

সকরুণ নয়নে চাহ আজি

সন্ধ্যা নেমেছে আমার বিজন ঘরে

সন্ধ্যা ঘনালো আমার বিজন ঘরে

সহসা কি গোল বাঁধালো

সাঁঝের পাখিরা ফিরিল কুলায়

সাধ জাগে মনে পরজীবনে

Dhaka University Institutional Repository

সেদিন বলেছিলে সেই সে ফুলবনে

সেদিন ছিল কি গোধূলী লগন

সোনার চাঁপা ভাসিয়ে দিয়ে

স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর

স্মরণ পারের ওগো প্রিয়

স্বপন যখন ভাঙবে তোমার

হৃদয় কেন চাহে হৃদয়

হয়তো আমার বৃথা আশা

হায় আঙিনায় সখি

হে বিজয়ী হে না দেখা রূপের কুমার

সমাপ্ত